সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

ত্রয়োদশ খণ্ড

সূচিপত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রমথ চৌধুরী

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ ঃ কার্তিক, ১৩৮৮

আরতি মল্লিক স্মৃতি তহবিলের অনুদানে মুদ্রিত।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১৭

প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী

আদিনিবাস

উত্তরবঙ্গের রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত পাবনা জেলার একটি সুপরিচিত গ্রাম হরিপুর। গ্রামটি জোনাইল হরিপুর বলিয়াও আখ্যাত হইয়া থাকে। এই ভদ্রপল্লীর ভৌগোলিক অবস্থান চাটমহল রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল পূর্বোত্তর কোণে ও চাটমহল পুরাণ বাজার হইতে প্রায় চারি মাইল পশ্চিমে বরল নদীর দক্ষিণ তীরে।[১] জনশ্রুতি, প্রমথ চৌধুরীর এক পূর্বপুরুষ হরি মিত্রের নামে গ্রামটির নামকরণ হইয়াছে। সমগ্র রাজশাহী বিভাগ বর্তমানে বাংলা দেশের অধীন।

বংশ-পরিচয়

হরিপুরের চৌধুরী পরিবার বিশিষ্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশ। কুলপঞ্জী অনুসারে; এই বংশের আদিপুরুষ আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম বীতরাগ বা তৎপুত্র সুষেণ।[২] দশম শতকে গৌড়রাজের অধীনে উত্তরবঙ্গে ইঁহাদের বসবাস শুরু হয়। চৌধুরীদিগের কুলগত পদবী মৈত্রেয় (মৈত্র), গোত্র কাশ্যপ। ইঁহারা প্রথমে ছিলেন নৈকষ্য কুলীন, পরে বিবাহ সংক্রান্ত গোলযোগ বা সামাজিক বিষয়ে প্রতিবাদী মতামতের জন্য ভঙ্গ কুলীন বা 'আঘাতে কাপ' নামে পরিচিত হন। এই বংশের প্রথম কুলগত উপাধি ছিল উপাধ্যায় (ওঝা), পরে হয় মজুমদার। প্রথমনাথের এক পূর্বপুরুষের নাম ছিল যাদবানন্দ। তিনিই ষোড়শ শতকে প্রথম চতুর্ধুরীণ বা চৌধুরী এই জমিদারী উপাধি লাভ করেন। অতঃপর ইঁহারা চৌধুরী নামেই পরিচিত হইতে থাকেন। চৌধুরীগণ যে 'পাঁচোবাড়ি' বলিয়া খ্যাত তাহার কারণ অন্যতম পূর্বপুরুষ রামদেবের পঞ্চ পুত্র হইতে 'পাঁচঘর চৌধুরী' শাখার উৎপত্তি। হরিপুরে চৌধুরীদের বসবাস শুরু হয় হরি মৈত্রের কাল হইতে।

---

১. রাধারমণ সাহা, পাবনা জেলার ইতিহাস (১৩৩৩), ৫ম খন্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৮।

২. J. Chaudhuri, A Brief History of Haripur (1914) হরিপুরের চৌধুরী বংশ সংখ্যক—১, বাণীমন্দির অনুসন্ধান বিভাগ (২৫৯ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা)

প্রমথ চৌধুরীর প্রপিতামহ হইতে চৌধুরী পরিবারের বংশতালিকা হইতেছে নিম্নরূপ :

কালীনাথ চৌধুরী

কালীকান্ত + কুমারী দেবী

কমলাকান্ত

করুণাময়ী + আনন্দ সান্যাল

রামকৃষ্ণ + কৃষ্ণসুন্দরী

ভগবতী

মৃন্ময়ী + কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী

রমাসুন্দরী

দুর্গাদাস + মগ্নময়ী

প্রসন্নময়ী + কৃষ্ণকুমার বাগচী

আশুতোষ + প্রতিভা দেবী

যোগেশচন্দ্র + সরসী দেবী

দেবেন্দ্রনাথ (অকালে মৃত)

কুমুদনাথ + রাধারাণী দেবী

প্রথমনাথ + ইন্দিরা দেবী

মন্মথনাথ + লীলা দেবী

সৌদামিনী (অকালে মৃত)

সুহৃৎনাথ + নলিনী দেবী

অমিয়নাথ + প্রমীলা দেবী

মৃণালিনী দেবী + উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কুলধর্ম ও সামাজিক মর্যাদা

চৌধুরীরা বংশগতভাবে বরাবর হিন্দু ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত ছিলেন। হরি মৈত্র কুলধর্ম ত্যাগ না করিয়াও বৈষ্ণব হইয়াছিলেন ও কীর্তন গাহিতেন। সেইজন্য পারিপার্শ্বিক লোকসমাজে তিনি হরি কীর্তনীয়া নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যাদবানন্দও বৈষ্ণবধর্মের ও কীর্তন গানের পোষকতা করিতেন। যাদবানন্দের পৌত্র রামদেব শাক্তধর্ম গ্রহণ করিলেও বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। তিনিই সাঁতোলরাজের গৃহদেবতা শ্যামরায় এবং রাধাশ্যাম ও মঙ্গলচণ্ডীর বিগ্রহ হরিপুরের চৌধুরী বাড়িতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। প্রমথ চৌধুরী আত্মকথাতে বলিয়াছেন, তাঁহারা যাদব কীর্তনীয়ার বংশধর ও শ্যামরায় তাঁহাদের কুলদেবতা।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী হইতে তাঁহাদের ধর্মগত মনোভাব অসাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। বারেন্দ্র সমাজ, কুলধর্ম ও গৃহদেবতা সম্পর্কে দুর্গাদাসের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও সকল ধর্ম সম্পর্কেই উদাসীন ছিলেন। তাই প্রমথ চৌধুরী স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন, তিনি ছেলে বেলায় কোনো ধর্মশিক্ষা পান নাই এবং বরাবর মানসিক খোলা হাওয়ায় বাস করিয়াছেন।[৩]

বল্লাল সেন প্রবর্তিত কুলীন সমাজে ও উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে হরিপুরের চৌধুরী পরিবার একটি সম্মানিত সম্ভ্রান্ত বংশ। ইঁহাদের এক পূর্বপুরুষ হৃষীকেশ ওঝা সমকালীন মুসলমান রাজার নিকট হইতে 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ভঙ্গ কুলীন হইলেও তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। যাদবানন্দ বারো ভুঁইয়ার একজন সাঁতোল (সাঁতৈল) রাজার অধীন

৩. প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা (১৩৫৩)।

জমিদার ছিলেন। তখন হইতে চৌধুরীরা অভিজাত জমিদার বংশ হিসাবেই খ্যাত। তাঁহারা বংশপরম্পরায় সাঁতোলের রাজার অধীনে নানা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। যাদবানন্দ এক সময় সোনাবাজু পরগণার খারিজা মহলের কর্তৃত্ব লাভ করেন। মুর্শিদ কুলি যখন সাঁতোল রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন তখন চৌধুরী বংশের রামদেবকে সেই পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু রামদেবের সহৃদয় পরামর্শে নাটোরের রাজা রামজীবন সেই পদ গ্রহণ করেন।

নাটোরের রাজবংশের সঙ্গে চৌধুরী পরিবারের সম্পর্ক অনেক পুরুষের। নাটোরের দেওয়ান হইয়াছিলেন রামদেবের প্রপৌত্র নয়নকৃষ্ণ। নয়নকৃষ্ণের ভাই কালীনাথও ঐ রাজসরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে চৌধুরী পরিবার নাটোর পরিবারের নিকট হইতে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি পান। প্রমথ চৌধুরীর প্রপিতামহ কালীনাথের বিচক্ষণতায় হরিপুরের প্রভূত উন্নতি হয়। কালীনাথের পুত্র কালীকান্তও নাটোর রাজ এস্টেটে দেওয়ানের কাজ করিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর পিতামহী কুমারী দেবী ছিলেন নাটোরের মহারাণী কৃষ্ণমণির অগ্রজা। চৌধুরী মহাশয়ের মা মগ্নময়ী দেবী ছিলেন বারো ভুঁইয়াদেরই একজন ছাতকের রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর। সুতরাং ধন-সম্পত্তি, কর্মকাণ্ড ও বিবাহসূত্রে চৌধুরী পরিবার বিশেষ গৌরব অর্জন করিয়াছিল।

ঠাকুর পরিবারের সহিত চৌধুরী পরিবারের যোগাযোগও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। দুর্গাদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। প্রমথ চৌধুরী বিবাহ করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে। সুহৃৎনাথের স্ত্রী নলিনী দেবী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। প্রমথ চৌধুরীর জীবিত কালে এই দুই পরিবারের মধ্যে আর দুইটি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুহৃৎনাথ চৌধুরীর কন্যা পূর্ণিমা চৌধুরীকে বিবাহ করেন। পূর্ণিমার অগ্রজা অপর্ণার বিবাহ হয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র নবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত। বিবাহসূত্রে চৌধুরী ও ঠাকুর পরিবারের সম্পর্ক স্থাপন যেমন সাহিত্য সংস্কৃতি ও সামাজিক মর্যাদার দিক হইতে তেমনি সংস্কারমুক্তির দিক হইতেও বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ চৌধুরীরা ছিলেন হিন্দু, আর ঠাকুররা ছিলেন ব্রাহ্ম। অবশ্য আশুতোষ চৌধুরী ও সুহৃৎ চৌধুরী বিবাহ করার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য যে সব পরিবারের সহিত চৌধুরীদের সম্পর্কের কথা উল্লেখযোগ্য তাহা হইল—যোগেশ চৌধুরী রাস্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সরসী দেবীকে, কুমুদনাথ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা রাধারাণী দেবীকে, মন্মথনাথ লেঃ কর্ণেল নৃত্যনারায়ণ (নিত্যানন্দ ?) চ্যাটার্জির কন্যা লীলা দেবীকে, (রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা সৌদামিনীর দৌহিত্রী) অমিয়নাথ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা প্রমীলা দেবীকে বিবাহ করেন প্রমথ চৌধুরীর অনুজা মৃণালিনীর স্বামী ছিলেন ডাঃ উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাগিনেয়ী কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ)। এই সব উল্লেখ হইতে চৌধুরী পরিবারের সামাজিক মর্যাদার 'একটি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পারিবারিক পরিচয়

প্রমথ চৌধুরীর পিতার নাম ছিল দুর্গাদাস চৌধুরী। তিনি ছিলেন হরিপুরের চৌধুরী পরিবারের বড় তরফের ছোটকর্তা। তাঁহার জন্মস্থান—মাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহারাণী কৃষ্ণমণির গৃহ নাটোরের রাজবাড়ী।[৪] এগারো মাস বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। এই অবস্থায় দুর্গাদাস তাঁহার দিদি মৃন্ময়ী

৪. প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্বকথা (১৩২৪), পৃ. ৩॥

দেবী ও ভগ্নীপতি কালীপ্রসন্ন লাহিড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত মানুষ হন এবং লেখাপড়া করেন। দুর্গাদাস কৃতী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াও মৃন্ময়ী দেবীর অনাগ্রহে দূরবর্তী ঢাকা কলেজে পড়িতে যাইতে পারেন নাই। অতঃপর বহু চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে রাজশাহী, পরে কলিকাতায় পড়িতে আসেন। হিন্দু কলেজে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পিতৃদেব ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

জমিদারের সন্তান হইলেও দুর্গাদাসের বাল্যকাল ও প্রথম যৌবনের দিন-গুলি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কাটে। নানা কৌশলে তাঁহার ভগ্নীপতি কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী সমস্ত ভূ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। ইহা লইয়া সংঘর্ষ ও মামলা শুরু হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী সেই মামলার শেষে প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে মৃন্ময়ী দেবীর দত্তক পুত্রের কাছে দুর্গাদাসের পরাজয় ঘটে। কিন্তু সর্বস্ব-হারা হইয়াও তিনি শান্ত চিত্তে সেই অবস্থা-বিপর্যয় মানিয়া লন। এই ঘটনার পর চৌধুরীদের যেটুকু ভূ-সম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে ধর্তব্যের মতো কিছু আয় হইত না।[৫]

দুর্গাদাস ছিলেন স্ব-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। কলেজ ত্যাগের পর তিনি প্রথমে পাটের ব্যবসা করিতে শুরু করেন, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ না হওয়ায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের-পদ গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি সর্বদা মানসিক বল, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সহিত যখন মতবিরোধ ও মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, তখনও তিনি মাথা নত করেন নাই। এই মতবিরোধের জন্যই তাঁহাকে অকালে পেন্সন লইতে হইয়াছিল।

কর্মোপলক্ষে দুর্গাদাস বহুস্থানে বাস করিয়াছেন---কলিকাতা, বনগ্রাম,

---

৫. বর্তমান লেখকের কাছে লিখিত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর চিঠি।

যশোহর, কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর, ত্রিহুত, মতিহারী, চম্পারণ, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর ইত্যাদি। এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আলাপ-পরিচয় ও হৃদ্যতা জন্মায়। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর দীনবন্ধু মিত্র, কবি নবীনচন্দ্র সেন, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, কালীচরণ লাহিড়ী ও রামতনু লাহিড়ী, লালমোহন ঘোষ ও মনোমোহন ঘোষ ইত্যাদি। এই সব বিদ্বান ও গুণী জনের সহিত পরিচয়ের ফলে তাঁহার নিজের সংস্কারহীনতা, উদারতা ও স্বচ্ছচিত্ততা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তেমনই তাঁহার পুত্রকন্যাদের যুগোপযোগী মানস-গঠনেও তাহা সহায়তা করিয়াছিল। তাহার সুফল দেখিতে পাই দুর্গাদাসের সন্তানদের শিক্ষা, বিবাহ ও জীবনচর্যার ইতিহাসে। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ীর জন্য ফিরিঙ্গী শিক্ষিকা রাখিয়া ও জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষকে বিলাতে পাঠাইয়া সেকালের রক্ষণশীলতা ও জাতি-সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। ৬৪।৬৫ বৎসর বয়সে আশুতোষের ধর্মতলার বাড়িতে পক্ষাঘাত রোগে দুর্গাদাসের মৃত্যু হয়।

তাঁহার সম্পর্কে বলিতে গিয়া পুত্র যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন-'He believed in working for a living and said, it would make his sons work hard...The rest of his life was a self-denying mission for the education of his children for which he ungrudgingly spent all he could spare.'[৬] দুর্গাদাসের আমলে পারিবারিক সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সম্পর্কে প্রসন্নময়ী দেবী বলিয়াছেন—"প্রতি শনি রবিবারে আমাদের গৃহে (যশোহরে) সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণের আসর জমিত, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের 'সদ্ভাব শতক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ব্রজাঙ্গনা,' 'বীরাঙ্গনা,' 'মৃণালিনী' নবীনের নবজাত 'অবকাশরঞ্জিনী'[৭] প্রভৃতির আলোচনা ও আবৃত্তি চলিত। এই

৬. J. Chaudhuri, A Brief History of Haripur (1914), p. 22

৭. আমার জীবন, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড (১ম সংস্করণ, ১৩৬৬) দুর্গাদাস চৌধুরী প্রসঙ্গের জন্য দ্রষ্টব্য।

মজলিসের প্রধান ছিলেন রসজ্ঞ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়। বটতলার 'কি মজার শনিবার'ও এখানে বাদ যাইত না।'[৮] কৃষ্ণনগর-বাসের প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—'পিতৃদেবের সময় হইতেই (তখন দুর্গাদাস পরিবার কৃষ্ণনগরে রাখিয়া অন্যত্র বদলি হইয়াছেন) আমাদিগের গৃহে শিল্প সাহিত্য ও সংগীত-চর্চা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ও বন্ধুপ্রিয় ছিলেন।'[৯] প্রমথ চৌধুরীও তাঁহার জীবন ও মনের উপর কৃষ্ণনগরের ভাষা-সাহিত্য-সংগীত-সংস্কৃতির প্রভাবের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন।

সেকালের প্রচলিত প্রথা ছিল বাল্যবিবাহ। কিন্তু দুর্গাদাস যুগ-রীতি অনুসরণ করিয়া বাল্যবিবাহে সম্মত হন নাই—সম্মানিত জমিদার-পরিবারের সন্তানের পক্ষে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লেখাপড়া শেষ হইবার পর তিনি বিবাহ করেন; অবশ্য তখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হন নাই। প্রমথ চৌধুরীর মাতার নাম ছিল মগ্নময়ী দেবী। তিনি ছিলেন চৌধুরীদের আত্মীয় শীতলাই-এর মৈত্র কুলোদ্ভব বাগের রায়েদের ঘরের কালী রায় ও তাঁর স্ত্রী ধনমণি দেবীর কন্যা। এই কালী রায় রাজা বসন্ত রায়ের প্রত্যক্ষ বংশধর ছিলেন বলিয়া মগ্নময়ীও জন্মগত আভিজাত্যের অধিকারী ছিলেন। বিবাহের সময় তাঁহার বয়স ছিল নয়। মগ্নময়ী অতিশয় গৌরবর্ণা, বুদ্ধিমতী, কর্তব্যপরায়ণা ও স্নেহশীলা ছিলেন বলিয়া অগ্রজা মৃন্ময়ী দেবীর উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত বিবাহ দুর্গাদাসের পক্ষে অত্যন্ত সুখের হইয়াছিল এবং তিনি সন্তানদের উপযুক্তভাবে[১০] মানুষ করিতে পারিয়াছিলেন। মগ্নময়ী দীর্ঘজীবী ছিলেন; বার্ধক্যে তাঁহার যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার পুত্ররা সকলেই প্রবীণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সম্পর্কে কন্যা প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন—

---

৮. প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্বকথা (১৩২৪), পৃ. ৮০-৮১।

৯. তদেব, পৃ. ১১৯।

১০. 'দুর্গাদাসবাবুর পুত্রেরা আজ দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র।'—নবীনচন্দ্র সেন, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৬), পৃ. ২৬০।

"মাতা ঠাকুরাণী শ্রীমতী মগ্নময়ী দেবী অত্যন্ত দেশভক্ত। তাঁহার দেশানুরাগ অতুলনীয়, ভারতবর্ষের বালুকণা তাঁহার চক্ষে স্বর্ণরেণু। প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পর পূজা সমাপ্ত করিয়া সকলের জন্য 'আশীর্বাদী পুষ্প নামাইয়া' তবে জলগ্রহণ করিয়া থাকেন।...তাঁহার পার্থিব দেবতা স্বামী, সেই স্বামী-আজ্ঞা চিরকাল শিরোধার্য করিয়া জীবনের সমুদায় এক আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছেন ও সেই চরিত্রের অনুকরণে স্বীয় সন্তানগণকেও শিক্ষা দিয়াছেন।"[১১]

প্রমথ চৌধুরীর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা[১২] বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতখানি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার আভাস পাওয়া যাইবে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে—

ভ্রাতা :

১. স্যার আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪) এম. এ., বি. এ., এল্ এল্ এম্ (ক্যান্টাব)। অ্যাডভোকেট ও বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট। ইংরাজী ও বাংলায় লেখক এবং সাহিত্যরসজ্ঞ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। অন্যতম পুত্র প্রয়াত আর্টিস্ট আর্যকুমার চৌধুরী।

২. যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৬৩-১৯৪৩) বি. এ. (অক্সফোর্ড), এম. এ., বার-অ্যাট-ল। ব্যারিস্টার, ক্যালকাটা উইক্লি নোট্সের সম্পাদক। জননেতা ও দেশহিতব্রতী। ইংরাজী ও বাংলায় লেখক। অন্যতম পুত্র ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরী।

৩. কুমুদনাথ চৌধুরী (১৮৬৪-১৯৩৫) এম. এ, বার-অ্যাট্-ল'। ব্যারিস্টার। প্রখ্যাত শিকারী। ইংরাজী ও বাংলায় লেখক। সাহিত্যানুরাগী ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজেও ছবি আঁকিতেন। পুত্র প্রমথ

১১. প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্বকথা (১৩২৪), পৃ. ২৬।

১২. এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে ডঃ সুমিতা চক্রবর্তীর গবেষণা-নিবন্ধ 'প্রসন্নময়ী দেবী ঃ জীবন ও সাহিত্যসাধনা।' গ্রন্থটি প্রকাশিতব্য।

চৌধুরীর অতি স্নেহভাজন ও ১৯৪১ সালে যুদ্ধে নিহত পাইলট অফিসার কালীপ্রসাদ চৌধুরী।

৪. ডাঃ মন্মথনাথ চৌধুরী—সিভিল সার্জন (গান্টুর, মাদ্রাজ)। আই এম এস.। সেনাবিভাগের মেজর, খ্যাতনামা চিকিৎসক। ইংলণ্ডে শিক্ষিত। কন্যা অভিনেত্রী দেবিকারাণী।

৫. ডাঃ সুহৃৎনাথ চৌধুরী এল. আর. সি. পি., এম. আর. সি. এস. (লণ্ডন)। বিশিষ্ট চিকিৎসক—সার্জন ও ফিজিসিয়ান। অন্যতম পুত্র বাটার স্টাফ ম্যানেজার সঞ্জীবকুমার চৌধুরী।

৬. অমিয়নাথ চৌধুরী বি. এ. (ক্যান্টাব), বার-অ্যাট্-ল'। ব্যারিস্টার। ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা-খ্যাত ব্যবহারজীবী। অন্যতম পুত্র জেনারেল জে এন. চৌধুরী।

ভগ্নী :

৭. প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৪?-১৯৩৯)—প্রথমে পণ্ডিত মহাশয় ও পরে মেম সাহেবের কাছে গৃহে শিক্ষিতা। দুর্গাদাস চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান। বাংলা ভাষায় প্রথম মহিলা কবি। কাব্য উপন্যাস, ছোটগল্প, জীবন-চরিত, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনীর লেখিকা হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। একমাত্র কন্যা প্রসিদ্ধ মহিলা-কবি প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৪)।

জন্ম-সাল ও জন্মস্থান

১৮৬৮ সালের ৭ই আগস্ট যশোহরে দুর্গাদাস চৌধুরীর ষষ্ঠ সন্তান ও পঞ্চম পুত্র প্রমথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্রজা প্রসন্নময়ী, অগ্রজ

আশুতোষ ও যোগেশচন্দ্রের জন্ম মাতুলালয়ে, দেবেন্দ্রনাথ ও কুমুদনাথের জন্ম বনগ্রামে, অনুজ মন্মথনাথ ও অনুজা মৃণালিনীর জন্ম যশোহরে।[১৩] সৌদামিনী, সুহৃৎনাথ ও অমিয়নাথের জন্ম কোথায় হইয়াছিল, ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহারা খুব সম্ভবতঃ মাতুলালয়েই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছে যশোহরে। বার্ধক্যে যশোহরের স্মৃতি হিসাবে একটি মাত্র ঘটনা তাঁহার মনে ছিল কোনো এক মাতাল পিরালীবাবুকে তিনি একদিন জলকেলি করিতে দেখিয়াছিলেন এবং সেই বাবুটির 'রং ছিল দিব্য গৌরবর্ণ'।[১৪] এই পর্বের আর কোনো ছাপ তাঁহার স্মৃতিব ভাণ্ডারে জমা হয় নাই।

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা

যশোহরে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর লেখাপড়ার সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শিক্ষার যথার্থ আনুষ্ঠানিক আয়োজন হয় কৃষ্ণনগরে। দুর্গাদাস পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষার দিকে বরাবর দৃষ্টি রাখিতেন; প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাহা ছাড়া তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে তিনি বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পড়েন। তারপর তিনি কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে পড়িতে আসেন। সেখানে হইতেই তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[১৫] তারপর তিনি একে একে সেন্ট জেভিয়ার কলেজ, কৃষ্ণনগর ও

---

১৩ প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্বকথা (১৩২৪)।

১৪. প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা (১৩৫৩)।

১৫. তিনি যখন সাড়ে তের বৎসব বয়সে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন তখন তিনি হেয়ার স্কুলের ছাত্র। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী, পৃ. ২৪-২৫ (প্রবন্ধ: রবীন্দ্র-পরিচয়)

প্রেসিডেন্সী কলেজ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয) হইতে এফ. এ., বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে পড়িবার সময় কিছুকাল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। প্রমথনাথ বি. এ. পরীক্ষায় দর্শনে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও এম. এ. পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ছাত্র হিসাবে তিনি যে কতখানি কৃতী ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল দর্শন ও ইংরাজী এই দুই বিষয়েই তাঁহার পরীক্ষার ফলে। পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য সরকারী বৃত্তি অযাচিতভাবে তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু গ্রহণ করেন নাই। এম. এ. পাশ করার পর তিনি কিছুদিন অ্যাটর্নি অফিসে আর্টিকেল্‌ড্ ক্লার্ক হন, কিন্তু অ্যাটর্নিশীপের ধূলা-ঘাঁটা কাজকর্ম তাঁহার পছন্দ হয় নাই। তাহার কিছুদিন পরে তিনি ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন (১৭ই অক্টোবর, ১৮৯৩) এবং যথা সময়ে বার অ্যাট-ল' হইয়া ফিরিয়া আসেন।

বিদ্যানুরাগ প্রমথ চৌধুরীর আবাল্যের। কৈশোর হইতে তাঁহার দিন কাটিয়াছে লাইব্রেরীর আবহাওয়ায়। তাঁহার বাবার ছিল ইংরেজী গ্রন্থের বিপুল সংগ্রহ—দেশবিদেশের ইতিহাস, স্কটের উপন্যাস, শেক্সপীয়র-মিল্টন-বায়রণ এবং আরও বহু লেখকের বই ছিল তাহার মধ্যে। সেই পৈতৃক লাইব্রেরীতেই তাঁহার বই পড়ার অভ্যাসের সূত্রপাত হয়। ইংরাজী উপন্যাস পড়ার প্রেরণা তিনি পান তাঁহার সেজদা কুমুদনাথের নিকট হইতে। ছেলেবেলাতেই তিনি অনেক বাংলা বই পড়িয়াছেন—যেমন বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, কৃষ্ণচন্দ্রের বাংলার ইতিহাস, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী-মৃণালিনী-বিষবৃক্ষ-কপালকুণ্ডলা, নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ, দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনী-লীলাবতী, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, হরিদাসের গল্পকথা, রবীন্দ্রনাথের বালক পত্রিকা প্রভৃতি। ফলে বিচিত্র বিষয়ে, বিশেষ করিয়া সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ অল্প বয়স হইতে বাড়িতে থাকে। তিনি

ছিলেন গ্রন্থকীট, তাই সারাজীবন ধরিয়া বই কিনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন। ফলে: তাঁহার নিজের বাড়িতেই একটি লাইব্রেরী গড়িয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই তিনি ইংরাজী বইগুলি দান করিয়াছেন বিশ্ব-ভারতীকে, পরে ফরাসী বইগুলি (এবং দুই চারিখানি বাংলা বই—যেমন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী) দিয়াছেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে Chaudhuri Collection নামে (From Accession No. 272943 to 274154)। সেগুলি দেখিলে বোঝা যায়, প্রমথ চৌধুরী কেমন খুঁটাইয়া বই পড়িতেন ও মার্জিনে মন্তব্য করিতেন।

ফরাসী সংগ্রহে একটি বই আছে—La Belgique Sanglante—Emile Verhaeren। বইটিতে প্রমথ চৌধুরীর স্বাক্ষরের তারিখ দেওয়া আছে 6.1.16. আরও কয়েকখানি বইয়ের নাম করিতেছি—Les Origines de la France Contemporaine, H. Taine; Demoiselle dafne—Gautier; Histoire Politique de l' Europe Contemporaine (1814-1896)—Ch. Seignebos; Histoire Civilisation en France—Guizot; L' Amour—De Stendhal; Maupassant—Louis Thomas; Memoires de Saint-Simon (Nouvelle Edition); Napolean les femmes—F. Masson; Revolution Francsaise—J. Michelet; Remerciment au Roi—Moliere; Poesies—Bourget; Mes Haines—Emile Zola; Theatre en deux Ovolumes—Racine ইত্যাদি। তিনি মূল ফরাসীতে লেখা দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি পড়িয়াই ক্ষান্ত হন নাই ফরাসী ভাষায় অনূদিত শেক্সপীয়ারের রচনাবলীও পড়িয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থপাঠের পরিধি ও গভীরতা হইতে বোঝা যায়; বিদ্যাচর্চাই ছিল তাঁহার জীবনের 'পেশা ও নেশা'।

ভাষাশিক্ষা

প্রমথ চৌধুরী বাংলা ও ইংরাজী ভাষা তো জানিতেনই; শুধু তাহাই নহে, এই দুই ভাষায় উত্তম লেখকও ছিলেন। পড়াশুনা শেষ করিয়া তিনি যখন অ্যাটর্নি অফিসের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন, তখন ইতালীয় ও সংস্কৃত[১৬] ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—নিজের চেষ্টায়। তিনি বিশ্বাস করিতেন, সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত। ইতালীয় ভাষা তিনি মোটামুটি শিখিয়াছিলেন, পড়িলে বুঝিতে পারিতেন—তবু ইহাতে তাঁহার দখল ছিল সীমিত। তবে ব্যাকরণের সাহায্যে সংস্কৃত ভালোই শিখিয়াছিলেন—সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার প্রবেশ ও অধিকার ছিল যথেষ্ট পরিমাণ। তাহা না হইলে প্রবন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে উদ্ধৃতি দিয়া ব্যাখ্যা করিতে সাহসী হইতেন না—'সনেট পঞ্চাশতে' ভাস, জয়দেব, ভর্তৃহরি, চোরকবি, বসন্তসেনা ও পত্রলেখাকে লইয়া লিখিত কবিতায় তিনি যেভাবে লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন তাহা হইতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার কর্তৃত্ব কতখানি বোঝা যায়। মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ভাসরচিত তেরখানি (ত্রিবান্দ্রম্) নাটক আবিষ্কার করেন ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে। তারপর ভাসের[১৭] অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কৃত পণ্ডিত না হইয়াও প্রমথ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে ভাসের খবর পাইয়াছেন ও তাঁহার উপর ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে সনেট লিখিয়াছেন। প্রমথ

১৬. 'আমি যখন এম. এ. পাশ করে বছর দুয়েক বাড়ীতে বেকার বসেছিলুম, তখন আমার সখ হল যে, সংস্কৃত কাব্যের কিছু চর্চা করব। সংস্কৃতের জ্ঞান আমার ছিল অতি সামান্য। সেই সামান্য জ্ঞান নিয়েই সংস্কৃত নাটক পড়তে আরম্ভ করি।' প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী পত্রিকা ('মৃচ্ছকটিক' প্রবন্ধ), পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫৩।

১৭. '…১৯১২ সালে ভাসের গ্রন্থসকল আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে দরিদ্র চারুদত্ত নামক একটি নাটকের মোটে চার অংক পাওয়া গেছে; বাকি ছয় অংক পাওয়া যায়নি। আমার বিশ্বাস দরিদ্র চারুদত্ত আগাগোড়া ভাসের লেখা। এবং আর কোন চোরকবি সে খণ্ডিত অংশ কিঞ্চিৎ অদল-বদল করে' এবং তার নাম মৃচ্ছকটিক দিয়ে নিজের রচনা বলে' চালিয়েছেন। ভাসের তারিখ ৩০০ খৃঃ।'—প্রমথ চৌধুরী, তদেব।

চৌধুরীর আকর্ষণ ছিল হিমালয় অঞ্চলের প্রতি—তিনি বারবার কার্সিয়াং ও দার্জিলিং পরিভ্রমণে গিয়াছেন। এই ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি একসময় নেপালী ভাষা শেখার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। ফরাসী ভাষা শেখার ঝোঁক প্রমথ চৌধুরীর কেন হইয়াছিল সে-সম্পর্কে কোনো লিখিত সাক্ষ্য নাই। এমন কি ফরাসী ভাষায় বিদুষী তাঁহার পত্নীও বার্ধক্যে সঠিক তথ্য স্মরণ করিতে পারেন নাই। একথা সত্য যে, নানা ভাষা শেখার একটা সহজাত আগ্রহ প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে যৌবনেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। সেই হিসাবে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণে তৎপর হইয়া উঠা তাঁহার স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া তাঁহার মানস-গঠন ছিল ফরাসী সংস্কৃতির অনুকূলে। কিন্তু ফরাসী ভাষায় অধিকার অর্জনে তিনি আশু উৎসাহ পাইয়াছিলেন অগ্রজ আশুতোষ চৌধুরীর[১৮] নিকট হইতে। আশুতোষ ফরাসী জানিতেন। ফলে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী ফরাসী শিখিতে শুরু করেন। তারপর তিনি বিভিন্ন সময়ে সান্নিধ্য লাভ করেন প্রিয়নাথ সেন, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, মনোমোহন ঘোষ, পি. আর. দাশ প্রভৃতির। ইঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী বৃত্তে প্রবেশের পিছনে ইঁহাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ও প্রিয়নাথ সেনের ফরাসী জ্ঞানের কথা সশ্রদ্ধভাবে চৌধুরী মহাশয় নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—'... ৺প্রিয়নাথ সেন ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ফরাসী ভাষার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় এবং ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ

১৮. "দাদা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে অনেক ফরাসী বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, 'তুমি ঘরে চুপচাপ করে ব'সে থাক, ফরাসী শেখনা কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করব।' সেই থেকে ফরাসী বই পড়া অভ্যাস হয়ে গেল।"—প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা (১৩৫৩), পৃ. ৭৮।

অনুরাগ ছিল বলে, প্রথম থেকেই আমাকে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুশ্রেণীতে ভুক্ত করে নেন।'[১৯]

ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে বিবাহের আগেই প্রমথ চৌধুরী ফরাসী ভাষায় মোটা-মুটি ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন।[১৯ক] তাহার প্রমাণ মূল ফরাসী হইতে তাঁহার অনূদিত ও 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত (আশ্বিন, ১২৯৮) প্রস্পার মেরিমের ছোটগল্প 'ফুলদানি'। তারপরেই তিনি মেরিমের 'কার্মেন' তর্জমা করেন। অনুবাদ মূল ভাষার উপযুক্ত জ্ঞানসাপেক্ষ। বিবাহের (১৮৯৯) পর স্ত্রী ইন্দিরা দেবীই হইয়া উঠেন প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী-চর্চায় প্রকৃত সহায়িকা, কারণ তিনি ছিলেন লরেটো হইতে ফরাসী ভাষায় অনার্সসহ পাশ করা গ্র্যাজুয়েট। ফরাসী বই পড়িতে পড়িতে খট্‌কা লাগিলে তিনি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। স্মরণীয়, ফরাসী গীতাঞ্জলির আঁদ্রে জীদ্ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা তর্জমার দায়িত্ব প্রমথ চৌধুরী পত্নী ইন্দিরাকেই দিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি কতখানি অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন আছে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'নানা-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ-সংগ্রহের অন্তর্গত 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধ।

১৯. প্রিয়নাথ সেন (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী, 'সবুজপত্র', অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩২৩।

১৯ক. বিবাহের পূর্বে ইন্দিরা দেবীকে ১৫. ৯. ৯৮ তারিখে লেখা প্রমথ চৌধুরীর পত্রে Verlainer-এর 'Il pleut dans mons coeur' ছত্রটির উল্লেখ আছে। ২. ১০. ৯৮ তারিখের চিঠিতে Ernest Renan-এর নাম করিয়াছেন। ১১. ১০. ৯৮ তারিখে ভদ্রসম্বোধন প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন '…ভদ্র সন্তানের পক্ষে নিজে উদ্ভাবন করা ছাড়া না হয়ত ইংরেজি ফরাসি ধার নেওয়া ছাড়া আরত অন্য কোন উপায় দেখিনে।' —প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর পত্রগুচ্ছ, 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৭।

সঙ্গীতবিদ্যা

হরি কীর্তনীয়া ও যাদব কীর্তনীয়ার বংশধর হইয়াও চৌধুরী পরিবারে সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা করিত না। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটে দুর্গাদাস চৌধুরীর বিবাহের পরে। প্রমথ চৌধুরীর মাতুলালয়ে গানের চর্চা ও আবহাওয়া ছিল। সেখান হইতে মগ্নময়ী দেবী সংগীতপ্রিয়তা ও সঙ্গীতপটুতা লইয়া চৌধুরী পরিবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে সেই সঙ্গীতানুরাগ অল্পবিস্তর সঞ্চারিত হইয়াছিল। দুর্গাদাস চৌধুরী যখন সপরিবারে কৃষ্ণনগরে থাকিতেন তখন সেখানে একটি সাঙ্গীতিক পরিবেশ বিরাজ করিত। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন একজন ওস্তাদ শিল্পী—তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রমথ চৌধুরীর চেয়ে বৎসর পাঁচেকের বড়, তবুও তিনি ছিলেন উদীয়মান কন্ঠশিল্পী। এই রায়পরিবার ও অন্যান্য সঙ্গীতকলানিপুণ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসিয়া সদ্য কান-খোলা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে সঙ্গীতানুরাগ জন্মায়। ফলে তিনি ছেলেবেলায় অনেক গান শুনিয়াছেন, অনেক গানের আসরে মাতিয়াছেন, অনেক গান গাহিয়াছেনও। তবে সে সবই মার্গ-সঙ্গীত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—'…বাল্যকালে আমার কান তৈরী হয়েছিল বাঙ্গালায় থাকে বলে ওস্তাদী ঢংয়ের গানে। আজ পর্যন্ত আমার কানের সে অভ্যাস যায় নি। আমার কান সহজেই মার্গসঙ্গীতের অনুকূল।'[২০]

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সহিত প্রমথ চৌধুরীর ঠিকমতো পরিচয় হয় ব্যারিস্টারি পড়িবার সময় য়ুরোপ প্রবাস কালে। প্রত্যাবর্তনের পর যখন শৌখিন বড়লোক ও বড়মানুষী চালচলন দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—তাহাদের সঙ্গী হইয়া গার্ডেন পার্টিতে যাতায়াত শুরু করিলেন—তখনও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আসরে তিনি শ্রোতা ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট

২০. প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা (১৩৫৩)।

হইতেও তিনি এই বিদেশী সঙ্গীতশাস্ত্র কিছু পাঠ লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের ইতিহাসে সহধর্মিণী ইন্দিরা দেবীরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সংগীতে পারদর্শিণী। বাল্যকালে বিলাতে ছিলেন বলিয়া এবং অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর কন্যা হিসাবে অভিজাত পরিবেশে মানুষ হওয়ায় তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে বিশেষ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। কলানিপুণা সহধর্মিণীর সান্নিধ্যে প্রমথ চৌধুরী বিদেশী সংগীতশাস্ত্রেও পারঙ্গম হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে এই পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত কখনও তাঁহার নিকট প্রাচ্য সঙ্গীতের চেয়ে প্রিয় হইয়া উঠে নাই।

প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গীতবিদ্যা ও সংগীতানুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে। রবিবাবু চৌধুরী পরিবারে সংগীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, একথা চৌধুরী মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া ঠাকুর পরিবারের হেমেন্দ্রনাথের কন্যা—আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী প্রতিভা দেবীর ছিল অসাধারণ সংগীত-নৈপুণ্য। তাঁহার ও ইন্দিরা দেবীর যুগ্ম-সম্পাদনায় আট বছর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল 'আনন্দসংগীত পত্রিকা' (প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৩২০)। তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন 'সংগীতসংঘ' (৩০ শ্রাবণ, ১৩১৮)। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী লিখিয়াছেন—"প্রতিভা-দিদির স্থাপিত 'সংগীতসংঘে' রবিকাকা তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। উদাহরণগুলি নিজেই গেয়েছিলেন।"[২১]

এইভাবে নানা সূত্রে এবং ব্যক্তিগত প্রতিভায় প্রমথ চৌধুরী সংগীত বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি গান গাহিলেও সুকণ্ঠ ছিলেন না বলিয়া নিজে সংগীতজ্ঞ হইতে পারেন নাই। ভারতীয় সংগীতের মধ্যে তিনি সবচেয়ে অপছন্দ করিতেন পূরবী রাগিণী—পূরবী শুনিলে তাঁহার মন দমিয়া যাইত। শুধু ভাষার জন্য নহে, সুরের জন্যও। আসলে পূরবীর সুর ও

২১. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, রবীন্দ্রস্মৃতি (১৩৬৭), পৃ. ২৫।

করুণ ভাব তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে মনের অনুকূল ছিল না, তাই তিনি তাহা একেবারে বরদাস্ত করিতে পারিতেন না।

প্রমথ চৌধুরীর এই অর্জিত সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় আছে তাঁহার লিখিত প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধাবলীতে। মার্গসঙ্গীত লইয়াই তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার মতের আদান-প্রদান হইয়াছে নানা চিঠি-পত্রে—রবীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রভৃতির সহিত। বস্তুতঃ পক্ষে বাংলা ভাষায় এ-যাবৎ সঙ্গীত সম্পর্কে যাহা আলোচনা হইয়াছে, তিনি ছিলেন তাহার আদিপর্বের একজন পথপ্রদর্শক। সেদিক হইতে দেখিলে সঙ্গীত-বিচারে তাঁহার ঐতিহাসিক ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, তিনি ইন্দিরা দেবীর সহযোগে 'হিন্দু-সংগীত' (১৯৪৫) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে আছে প্রমথ চৌধুরীর লেখা দুটি প্রবন্ধ—'হিন্দুসংগীত' ও 'স্বরের কথা'।

রবীন্দ্র-সান্নিধ্য

চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন আঠারো বছর বয়সে—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গাদাস চৌধুরীর কৃষ্ণনগরের বাড়িতে।[২২] যখন কবিগুরুকে প্রথম দেখেন, তখন তাঁহার অসামান্য রূপই প্রমথ চৌধুরীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি এর আগে আট বৎসর বয়সেই দাদাদের নিকট রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়াছিলেন এবং সাড়ে তের বৎসর বয়সেই 'ভগ্নহৃদয়' পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তখন কোনো প্রতিক্রিয়া না হইলেও প্রথম রবীন্দ্র-সান্নিধ্য চৌধুরী মহাশয়কে আকৃষ্ট করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী ও বন্ধুদের মধ্যে যে আলোচনা হইত তাহাতে নীরবে উপস্থিত থাকিতে তিনি ভালো-

২২. প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ : রবীন্দ্র পরিচয়) পৃ. ২১।

বাসিতেন। একবার তিনি আলোচনার শেষে আশুতোষের নিকটে এমন একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন যাহা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তোমার ভাইটি বেশ বুদ্ধিমান তো! প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আশুতোষের বিবাহের পর ঠাকুর বাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে। ঠাকুরবাড়িতে রাজা ও রানী'র এক অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন রাজা; প্রমথ চৌধুরী হন কুমার।[২৩] আশুতোষ চৌধুরীর মট্‌স লেনের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের যে বন্ধুজনোচিত যাতায়াত[২৪] শুরু হইয়াছিল তাহা বৈবাহিক সম্পর্কগুলি ক্রমশঃ স্থাপিত হওয়ার পর আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তাহার সুফলভাগী প্রমথ চৌধুরীও হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে বোটে থাকিতেন তখন একবার মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত চৌধুরী মহাশয়ও সেখানে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হইতেই 'সবুজপত্র' প্রকাশের পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় আসিয়াছিল। প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে সপ্তাহে একদিন যে আড্ডা বসিত, যা সবুজ সভা নামে পরিচিত— তাহাতে রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে আসিতেন। [২৫] সবুজপত্র শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে (২৫ বৈশাখ, ১৩২১) প্রথম আত্মপ্রকাশ করেনাই, এই পত্রিকাটিকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা দুইজন পরস্পরের পরিপূরক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কবিগুরু সমালোচনা, তিরস্কার, প্রশংসা, পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়া, 'সবুজপত্র' ও প্রমথ চৌধুরীর মান উন্নত করার চেষ্টা করিয়াছেন,[২৬]; তেমনি প্রমথ চৌধুরী ও তৎসম্পাদিত পত্রিকা ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যে নতুন অধ্যায় যোজনার প্রেরণা যোগাইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে স্নেহের পাত্রী বিবির (ইন্দিরা দেবী) সহিত বিবাহের পর চৌধুরী দম্পতি হইয়া উঠিয়াছিলেন কবিগুরুর

---

২৩. রানী চন্দ, ঘরোয়া (১৩৪৮), অধ্যায় ৯, পৃ. ১২০।
২৪. রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি (বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৫৩), পৃ. ১৪৯।
২৫. প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা, পূর্বাশা, ষোড়শ বর্ষ, পৌষ ১৩৬০।
২৬. রবীন্দ্রনাথ— চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড)

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবিতকালে প্রমথ চৌধুরীকে এতটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, চৌধুরী মহাশয় ধরিয়াই লইয়াছিলেন তাঁহার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই তিনি লিখিয়াছেন—'তিনি কবে কি বলেছেন মনে নেই। খুব সম্ভবতঃ আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি।' সাধারণভাবে দেখিলে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী দুই ভিন্ন পথের পথিক, তবু তলাইয়া দেখিতে গেলে চৌধুরী মহাশয়ের সৃষ্টিকর্মে ও সাহিত্যাদর্শে রবীন্দ্রপ্রভাবের সূক্ষ্ম সূত্র মিলিবেনা এমন কথা বলা ঠিক হইবে না। আর রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভ্যন্তরে প্রমথ চৌধুরীর দূর্নিরীক্ষ্য অস্তিত্বের একটি দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই দিয়া গিয়াছেন। 'রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে কোনরূপ লেখাপড়া করিতেন না। কিন্তু মনে মনে একটি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিতেন। সেই বইয়ের নাম পঞ্চভূতের ডায়েরী…যাতে আমাদেরই (প্রমথ চৌধুরী অন্যতম সঙ্গী ছিলেন) তর্কের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।'[২৭]

মানস-গঠন

প্রমথ চৌধুরীর মানস-গঠনে নানা সূত্র ও উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন হরিপুরের সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সন্তান—স্বগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকিলেও জমিদার-সুলভ আভিজাত্য, সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ তাঁহার মধ্যে রক্তগত সংস্কার হিসাবে কাজ করিয়াছে।[২৮] দ্বিতীয়তঃ, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণবংশের সন্তান। পরিহাসচ্ছলে হইলেও তিনি একদিন একজন অব্রাহ্মণকে সেকথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।[২৯] ইহা হইতে বোঝা যায়,

---

২৭ প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৪৯।

২৮. বাংলা-জমিদার সভার পার্ক স্ট্রীটের আপিস-বাড়িতে প্রমথ চৌধুরী নানা সভা উপলক্ষে যাইতেন।—দ্রঃ অতুলচন্দ্রগুপ্ত, 'প্রমথ চৌধুরী' (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১০৫৪।

২৯. তদেব।

কান্যকুব্জ থেকে আনীত বলিয়া কথিত ব্রাহ্মণবংশের সন্তান প্রমথ চৌধুরী বংশগতভাবে একটি শৃংখলাসম্পন্ন আর্যমন ও পরিশীলিত আর্যসংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, উদার ও সংস্কারমুক্ত হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র দুর্গাদাসের সন্তান এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভ্রাতাদের আধুনিক জীবনচর্যা ও মনোধর্মের সংস্পর্শে তিনি একটি নূতন মানস রূপ সহজভাবেই লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।[৩০] ইহা ছাড়া তাঁহার জীবন ও মনের ওপর কৃষ্ণনগরের পরিবেশ—তথাকার ভাষা, বাক্‌চাতুরী, সঙ্গীত, শিল্প, স্থাপত্য ইত্যাদির প্রভাব পড়িয়াছিল প্রচুর। পদ্মা পারের বাঙাল হইতে চৌধুরীদের কৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালীতে পরিণত করিয়াছিল। সরলা দেবী চৌধুরাণী লিখিয়াছেন "এঁদের (চৌধুরীদের) ভিতর এক রকমের চটক ছিল সেকালের 'আধুনিকতা'। যত না পাবনাই এঁরা, তার চেয়ে বেশী কৃষ্ণনাগরিক। এঁদের বাঙ্গলা উচ্চারণে সেই মনোমোহন লালমোহন ঘোষীয়তা।"[৩১] চতুর্থতঃ প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিগত শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা নিতান্তই তাঁহার জীবিকার কাজে লাগে নাই, লাগিয়াছিল তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তিপ্রবণতা, সংহত মানসিকতা ও রুচিশীলতা বিকাশের কাজে। দেশে থাকিতে যে মনের ধাত তাঁহার গড়িয়া উঠিয়াছিল, বিলাতে গিয়াও তাহার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই, একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন 'সবুজপত্রে'। পঞ্চমতঃ, ঠাকুর বাড়ি, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে তাঁহার জীবন, মন ও চিন্তায় নূতন মাত্রা সংযোজিত, হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ষষ্ঠতঃ, তিনি ছিলেন লাইব্রেরীর আবহাওয়ায় বর্ধিত নাগরিক মানুষ। তিনি জগৎ ও জীবনকে জানিয়াছেন

---

৩০. চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে বিবাহের মূলে এমন কি ঠাকুর পরিবারেও যে পরিবর্তন আসিয়াছিল, সেকথা বলিয়াছেন সরলাদেবী চৌধুরাণী—'আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিভা দেবীর বিবাহের সূত্রে ওঁদের (ঠাকুর বাড়ির সন্তানদের) মহলের মনের ঘর সব প্রথম খুলল।'—'জীবনের ঝরাপাতা' (১৮৭৯ শকাব্দ)। পৃ. ৬৬।

৩১. তদেব। পৃ. ১০০।

প্রধানতঃ বই পড়িয়া, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নহে। তাঁহার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মহাজনরা, তাঁহার দার্শনিক গুরু ছিলেন বের্গসঁ। সুতরাং তিনি ছিলেন পুঁথিগত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁহার মনের গড়নে সেই সংস্কৃতির বিশেষ ছাপ আছে। সপ্তমতঃ, তিনি মনের ও চরিত্রের একটি বিশেষ ধাতু-প্রকৃতি লইয়া জন্মাইয়াছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যাচর্চা ও শোভন জীবনচর্যার মধ্য দিয়া সেই ধাতু-প্রকৃতি নতুন রক্ত-মাংস অস্থি-মজ্জা সংগ্রহ করিয়া একটা সবল মানস-বলয় ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছিল। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসৃষ্টির সহিত তাঁহার মনের গড়ন ও ব্যক্তিত্বের নিবিড় যোগ আছে।

বিবাহ

প্রমথ চৌধুরী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইন্দিরা দেবীকে (১৮৭৩-১৯৬০) বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্বে আশুতোষ চৌধুরী[৩২] ও সুহৃৎনাথ চৌধুরীর[৩৩] মতো তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই। প্রমথ চৌধুরী বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন সরলা দেবী ঘোষালকে (চৌধুরাণী), কিন্তু তিনি রাজী হন নাই। প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন—'সরলাদেবী চৌধুরাণী একদিন আমাকে বল্লেন যে, আপনি ইন্দিরা দেবীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে তিনি রাজি হবেন। আমি সেই কথা শুনে বিবাহের প্রস্তাব করি'[৩৪] এই প্রস্তাব হয় প্রমথ চৌধুরীর লণ্ডন হইতে ফেরার পর খুব সম্ভবতঃ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে। দুজনের প্রথম যোগাযোগের প্রাপ্ত সাক্ষ্য ৩ জুন, ১৮৯৩ সালে প্রমথ চৌধুরীকে (বিলাত যাত্রার আগে) লেখা ইন্দিরা দেবীর একটি চিঠি। তবে চৌধুরীপত্র যে

৩২. প্রসন্নময়ী দেবী, আশুতোষ (প্রবন্ধ), ভারতবর্ষ, ১৩শ বর্ষ, কার্তিক, ১৩৩২।

৩৩. দ্রঃ তত্ত্ববোধিনী, ১৮১৭ শক, ১৪শ কল্প, ১ম ভাগ, চৈত্র।

৩৪. প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা, পূর্বাশা, ষোড়শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৬০।

ঠাকুরকন্যাকে এর আগেই দেখিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা অসংগত নহে; কারণ প্রতিভা দেবীর সহিত আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহে (১৮৮৬) প্রমথ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।[৩৫] যোগেশচন্দ্র চৌধুরীও ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন[৩৬], কিন্তু ইন্দিরা দেবীর ইচ্ছানুসারে প্রমথ চৌধুরীর সংগেই বিবাহ স্থির হয়। কিছুদিন পূর্বরাগ চলার পর তাঁহাদের বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনে তাঁহারা কলিকাতা স্টোর রোড—ব্রাইট স্ট্রীট মে'ফেয়ার, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছেন এবং বহু স্থানে বেড়াইতে গিয়াছেন। তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্ব-কাল ৪৭ বছরের কিছু কম। তাঁহার জীবনের শেষদিকে আর্থিক সাচ্ছল্য ছিল না। চৌধুরী-দম্পতি ছিলেন নিঃসন্তান।

কর্মকাণ্ড

প্রমথ চৌধুরীর জীবন সাংসারিক অর্থে কর্মবহুল নহে। তিনি কখনও নিরবচ্ছিন্ন কর্মসূত্রে আবদ্ধ থাকেন নাই। কৃতবিদ্য হওয়া সত্ত্বেও পরের চাকুরী করিতে তাঁহার মন সরে নাই। এম. এ. পাশ করার পর বহরমপুর ও কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষের পদ অযাচিতভাবে পাইয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম দিকে তেমন পসার না হওয়ায় হাইকোর্টে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেন। আশুতোষ চৌধুরীও প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিয়া তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই, কিন্তু নিষ্ঠার সহিত লাগিয়াছিলেন বলিয়া পরে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।[৩৭] কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সে ধৈর্য ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে হাইকোর্টের

৩৫. প্রসন্নময়ী দেবী. আশুতোষ (প্রবন্ধ), ভারতবর্ষ, ১৩শ বর্ষ, কার্তিক, ১৩৩২।

৩৬ দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৭।

৩৭. প্রসন্নময়ী দেবী, আশুতোষ (প্রবন্ধ) ভারতবর্ষ, ১৩শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩২।

রিসিভারের কাজ করিয়াছেন—যেমন গোপাললাল শীল এস্টেটের রিসিভারের কাজ। তিনি ঠাকুর এস্টেটেরও ম্যানেজারি কিছুদিন করিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনার কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি জীবনে আর তেমন অর্থকরী কর্মে নিযুক্ত থাকেন নাই।

পৈতৃক সম্পত্তির যাহা কিছু মামলা-মোকর্দমার পর অবশিষ্ট ছিল তাহা হইতে আয় তেমন হইত না। তাহাও ভাইদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হইয়া প্রমথ চৌধুরী সামান্য কিছু পাইতেন। বিবাহে যৌতুক হিসাবে তিনি লাখ দুই টাকা পাইয়াছিলেন—তাহার একটি বড় অংশ দিয়া বাড়ি করিয়াছিলেন। পরে সেই বাড়ি কৃষ্ণনগরের রাণী হেমন্তকুমারীকে বিক্রয় করিয়া দিয়া একটি ছোট বাড়ি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আর্থিক কারণেই তাঁহাকে বাড়ি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। 'সবুজপত্র' প্রকাশের জন্য তাঁহাকে ক্ষতিও স্বীকার করিতে হইয়াছিল অনেক।

মৃত্যু

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর (১৩৫৩ সালের ১৬ই ভাদ্র) সোমবার রাত্রিতে প্রমথ চৌধুরী কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর ২৮ দিন।

সাহিত্যচর্চা

ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে পারদর্শী, বিলাত-ফেরৎ ব্যারিস্টার এবং গৃহে ও বন্ধুজনের নিকট চৌধুরী সাহেব নামে পরিচিত প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে বাংলা-সাহিত্য-চর্চা এক আশ্চর্য ঘটনা। তাহার চাইতেও আশ্চর্য হইতেছে তাঁহার রচনাবলীর পরিমাণগত আকার ও গুণগত প্রকার। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন তাঁর পরিচয় আমার কাছে ছিল সমুজ্জ্বল। 'যখন থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি পেয়েছি

তাঁর সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা।…অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের দেশ তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে যথোচিত গৌরব দেয় নি সেজন্য আমি বিস্ময় বোধ করেছি।'[৩৮] প্রমথ চৌধুরীর 'হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করেনা' এবং তাঁর 'মননধর্ম সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন' মনে হওয়ায় কবিগুরু একদা তাহাকে 'বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ'[৩৯] দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরী স্বনামে ও "বীরবল" ছদ্মনামে লিখিতেন।

প্রমথ চৌধুরীর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপবন্ধে প্রথম আত্মপ্রকাশের বিবরণ হইতেছে নিম্নরূপ :

১. প্রবন্ধ : জয়দেব। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত। তখন প্রমথ চৌধুরী এম.এ. ক্লাশের ছাত্র।

২. গল্প : অনূদিত গল্প 'ফুলদানি' [৪০] (মূল : Prosper Merimee-Etrusan Vase)।

সাহিত্য পত্রিকার আশ্বিন; ১২৯৮ সালে প্রকাশিত।

মৌলিক গল্প 'প্রবাস স্মৃতি' ভারতী পত্রিকায় ১৩০৫ সালে প্রকাশিত। লেখার তারিখ কার্তিক, ১৩০৫। তবে ইহাকে গল্প না ভ্রমণ কাহিনী বলা হইবে, তাহা তর্কের বিষয়।

৩. কবিতা : সনেট। লেখার তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১২। 'ভারতী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সালে প্রকাশিত।

৩৮. প্রমথ চৌধুরী, গল্পসংগ্রহ (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ১৩৮১), বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকা (১৩৪১)।

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ, সরকারী রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩৬৮), চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৫৩০-৩১।

৪০. ইহার পূর্বেও তিনি দুইএকটি গল্প ও প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়াছিলেন, একথা ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন (কথাচ্ছলে ইন্দিরা দেবী বর্তমান লেখককে এই কথা বলিয়াছিলেন), তবে তাহা কোথায়ও প্রকাশিত হয়েছিল বলিয়া মনে হয় না।

৪. নাটিকা : কাঠের রাজা (প্রস্তাবনা অংশ)। লিখিত প্রথম অঙ্ক পাণ্ডুলিপি আকারেই লুপ্ত)। বোধহয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত : দ্র : রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড)। বিশ্বভারতী পত্রিকায় মাঘ, ১৩৪৯ সালে প্রকাশিত।

তাঁহার জীবনের শেষের দিকের সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে 'রূপ ও রীতি' এবং 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে ও অন্যান্য রচনায়। এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'সংকেত' পত্রিকার ১৩৫০ সালের চৈত্র সংখ্যা। এখানে ১৩৩৭ সালের 'পরিচয়'-এর বৈশাখ সংখ্যা হইতে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি : "…রূপ ও রীতি নামক আর একটি অখ্যাত কাগজের খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী অভিযোগ করেছেন যে, ঐ আলোচনা (আধুনিক কবিতা সম্পর্কে 'কবিতা' পত্রিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্তের তীব্র মন্তব্য সম্পর্কে 'পরিচয়'-এর পত্রিকা-প্রসঙ্গে আলোচনা) তেমন স্পষ্ট হয়নি। প্রমথবাবু লিখেছেন : 'অনামিক লেখককে আমি জানিনে, তিনি অতুলবাবুর আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে অন্ধতা দেখে দুঃখিত হয়েছেন। এ বিষয়ে অতুলবাবু অন্ধ হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সমালোচক বোবা নন।' বীরবলের যোগ্য এই উক্তি ; এতে খোঁচা আছে, কিন্তু তবু তা উপভোগ্য, কেননা তাতে অনুমাত্র বিষ নেই। * * * প্রমথবাবুর রসবোধ যে অক্ষুন্ন আছে তাহার আরো প্রমাণ সম্প্রতি পেলাম পত্রিকা[৪১] এই অদ্ভুত নামধারী কাগজে প্রকাশিত 'চাহার দরবেশ' নামক একটি গল্পে। কিন্তু যে রসবোধের পরিচয় এই গল্পটিতে আছে তা সাহিত্যের রস নয়, জীবনের রস। গল্প না বলে আলেখ্য বললে বোধহয় ঠিক হবে, কেননা, এতে না আছে সুনির্দিষ্ট প্লট, না আছে মামুলী ছোট গল্পের মতন এর অনিবার্য পরিণতি। এর বিষয়বস্তুও বলতে হবে হালকা, আর ভাষা একেবারে নিরাভরণ। কিন্তু তবু পড়ে মনে হয় মানুষের জীবনের—সমগ্র জীবনের অবশ্য নয়, সামান্য

৪১. পত্রিকা, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৩৭।

একটু অংশের—এমন একটি ছবি যাকে ইংরেজীতে বলে speaking likeness অর্থাৎ এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত মানুষগুলির কথাবার্তা মনে হয় যেন কানে শুনছি লেখায় পড়ছি না। এই জাতীয় রচনা প্রমথবাবুর শুধু বিশেষত্ব নয়, একেবারে তাঁর মৌরসী পাট্টা।"

গ্রন্থ-পরিচয়

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গ্রন্থে প্রকাশ-কাল মুদ্রিত নাই। যেখানে আছে সেখানে গ্রন্থ-প্রকাশের তারিখ এবং গ্রন্থের ভূমিকা, উৎসর্গ ইত্যাদির তারিখ প্রথমে দেওয়া হইল। পরে বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগের তারিখ বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ করা হইল।]

১. তেল নুন লকড়ি (প্রবন্ধ-গ্রন্থ)—গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ সঠিকভাবে জানা না গেলেও ইহা যে প্রমথ চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কেহ কেহ ইহা ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। পৃষ্ঠা ৪৮। মূল্য দেওয়া নাই। গ্রন্থটি ৫নং সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে হরলাল ব্যানার্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৩৮নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা 'ঘোষ প্রেস' হইতে এম. এন. ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত হয়। রচনাটিকে পরে 'নানা-কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

সূচী-পত্র : ইঙ্গ-বঙ্গ জীবনের নানা দিক এবং তার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা।

২. সনেট-পঞ্চাশৎ (কবিতা-সংগ্রহ)—ফাল্গুন, ১৯১৩। (২৫ মার্চ, ১৯১৩)। পৃষ্ঠা ৫০। মূল্য আট আনা।

সূচী-পত্র : সনেট ; ভাস ; জয়দেব ; ভর্তৃহরি ; চোরকবি ; বসন্তসেনা ; পত্রলেখা ; তাজমহল ; বাংলার যমুনা ; বানাঁড শ ; বালিকা-বধূ ; বন্ধুর প্রীতি ; ব্যর্থ জীবন ; মানব-সমাজ ; হাসি ও কান্না ; ধরণী ; কাঁঠালী চাঁপা ; করবী ; কাঠ-মল্লিকা ; রজনীগন্ধা ; গোলাপ ; ধুতুরার ফুল ;

অপরাহ্ন ; ব্যর্থ বৈরাগ্য ; অন্বেষণ ; আত্ম-প্রকাশ ; বিশ্বরূপ ; শিব ; বিশ্ব-ব্যাকরণ ; বিশ্বকোষ ; সুরা ; রূপক ; একদিন ; ভুল ; হাসি ; রোগশয্যা ; মুশকিল-আসান ; বাহার ; পূরবী , শিখা ও ফুল ; গজল ; পাষাণী ; প্রিয়া ; পরিচয় ; ফুলের ঘুম ; স্মৃতি ; প্রতিমা ; উপদেশ ; স্বপ্ন-লঙ্কা ; আত্মকথা ।

৩. **চার-ইয়ারি কথা** (গল্প-গ্রন্থ)—জানুয়ারী, ১৯১৬। (১১ আগস্ট, ১৯১৬)। সবুজপত্রে প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৩২২; বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ৯৭। মূল্য দেওয়া নাই।

সূচী-পত্র : গল্প-গ্রন্থটির পাঁচটি অংশ আছে—ভূমিকা, সেনের কথা, সীতেশের কথা, সোমনাথের কথা, আমার কথা।

৪. **বীরবলের হালখাতা** (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—(১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ ; ১৩৫৬ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থটির যে মুদ্রণ বাহির করেন তাহাতে প্রথম প্রকাশের তারিখ দেওয়া আছে ১৩২৪ সাল)। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ২৭৮। মূল্য দেওয়া নাই।

সূচী-পত্র : হালখাতা ; কথার কথা ; আমরা ও তোমরা ; খেয়াল খাতা ; মলাট-সমালোচনা ; সাহিত্যে চাবুক ; তর্জমা ; বইয়ের ব্যবসা ; বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগ , নোবেল প্রাইজ ; সবুজ পত্র ; বীরবলের চিঠি ; 'যৌবনে দাও রাজটীকা' ; ইতিমধ্যে ; বর্ষার কথা ; পত্র১ ; কৈফিয়ৎ ; নারীর পত্র ; নারীর পত্রের উত্তর ; চুটকি ; সাহিত্যে খেলা ; শিক্ষার নব আদর্শ ; কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল ; পত্র ২ ; প্রত্ন-তত্ত্বের পারস্য উপন্যাস ; টীকা ও টিপ্পনী ; শিশু-সাহিত্য ; সুরের কথা ; রূপের কথা ; ফাল্গুন। এই সূচী-পত্রের প্রথম চোদ্দটি প্রবন্ধ লইয়া 'বীরবলের হালখাতা'র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম পর্ব বাহির হয় ১৩৩৩ সালে।

৫. **নানাকথা** (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—(১৩ মে, ১৯১৯)। পৃষ্ঠা ৩৬২। মূল্য দেড় টাকা।

সূচী-পত্র ঃ তেল-নুন-লকড়ি ; বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাঙলা ওরফে সাধুভাষা ; সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা ; বাঙলা ব্যাকরণ ; সনেট কেন চতুর্দশপদী ; ব্রাহ্মণ মহাসভা ; সবুজ পত্রের মুখপত্র ; সাহিত্য-সম্মিলন ; ভারতবর্ষের ঐক্য ; ইউরোপের কুরুক্ষেত্র ; বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ ; নূতন ও পুরাতন ; বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ? ; অভিভাষণ ; বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য ; অলঙ্কারের সূত্রপাত ; আর্যধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ ; আর্যসভ্যতার সঙ্গে বাহ্য-সভ্যতার যোগাযোগ , ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয় ; নালতামামি ; প্রাণের কথা।

৬. **পদ-চারণ** (কবিতা-সংগ্রহ)—১৯১৯ (১২ জুলাই, ১৯২০) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ৮৪। মূল্য বার আনা।

সূচী-পত্র ঃ 'ও' ; বিলাতে রবীন্দ্র ; বন্ধুর প্রতি ; ফসলে গুলমে মস্ত শে তোবা ? ; পূর্ণিমার খেয়াল ; The Book of Tea , সনেট-সুন্দরী ; অকাল বর্ষা ; সনেট চতুষ্টয়—কবিতা, কাব্যকলা, আমার সনেট, আমার সমালোচক ; সনেট-সপ্তক ; বর্ষা (ছড়া) ; কৈফিয়ৎ (Terza Rima ছন্দে) ; পত্র ; দুয়ানি ; বনফুল ; চৌরপঞ্চ ; ভাল তোমা বাসি যখন বলি , প্রেমের খেয়াল ; দ্বিজেন্দ্রলাল ; স্নেহলতা ; খেয়ালের জন্ম (Terza Rima ছন্দে) ; তেপাটি (Triolet)—উষা ; মধ্যাহ্ন ; সন্ধ্যা ; মধ্যরাত্রি ; মিলন ; বিরহ ; ছোট কালীবাবু ; সমালোচকের প্রতি ; দোপাটি (গাথা সপ্তশতী হইতে অনূদিত) ; সিকি ; দুয়ানি ; সনেট ; থর্সাং ; তত্ত্বদর্শীর সিন্ধু-দর্শন ; শরৎ ; সংসার ; কবির সাগর-সম্ভাষণ।

'উৎসর্গপত্রে' লেখক বলিয়াছেন—'গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস এগুলির

ভিতর আর কিছু না থাক আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason। এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ, এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই, সুতরাং আশা করি, আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।'

৭. **আহুতি** (গল্প-সংগ্রহ) ১৯১৯। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ১৯৯। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

সূচী-পত্র: আহুতি; বড়বাবুর বড়দিন; একটি সাদা গল্প; ফরমায়েসী গল্প; ছোট গল্প; রাম ও শ্যাম।

৮. **আমাদের শিক্ষা** (প্রবন্ধ-সংগ্রহ) (২৫ অগাস্ট, ১৯২০)। পৃষ্ঠা ১০৪। মূল্য দশ আনা।

সূচী-পত্র: আমাদের শিক্ষা; বাংলার ভবিষ্যৎ; বই পড়া; আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবনসমস্যা; নব-বিদ্যালয়; নব-বিদ্যালয় (২); নব-বিদ্যালয় (ভাষা-শিক্ষা)। 'ভূমিকায়' লেখক বলিয়াছেন—'যে সাতটি প্রবন্ধ একত্র করে ছাপাচ্ছি, তার প্রথমটি বাদ বাকী কটি সবই ফরমায়েসী লেখা অর্থাৎ পরের অনুরোধে লেখা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এ তিনটি প্রবন্ধ তিনটি বিভিন্ন সময়ে উক্ত। অতএব এ কটির মধ্যে স্পষ্ট ধারাবাহিকতা নেই'।…

৯. **দু-ইয়ারকি** (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—ভূমিকার তারিখ ২৯শে জুলাই, ১৯২০। (১৯ মার্চ, ১৯২১)। পৃষ্ঠা (ভূমিকা)+১৭৫ মূল গ্রন্থ মূল্য আট আনা। প্রকাশক: প্রমথ চৌধুরী। প্রাপ্তি স্থান কমলা বুক ডিপো লিঃ।

সূচী-পত্র: দু-ইয়ারকি; দেশের কথা (১); দেশের কথা (২); রায়তের কথা; নবযুগ।

'ভূমিকায়' লেখক বলিয়াছেন—'আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সাময়িক প্রসঙ্গ, এ প্রবন্ধ কটি তাই নিয়ে লেখা। সুতরাং প্রবন্ধ কটির ভিতর

স্পষ্টত বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই।...এ প্রবন্ধ কটি যতদূর পারি সহজ করে সরল করে লেখবার অভিপ্রায় আমার ছিল, কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকট এ প্রবন্ধগুলি সহজবোধ্য হবে না। আমার লেখা যে সর্বজনবোধ্য হয়নি, তার জন্য যতটা দোষী আমি তার চাইতে বেশী দোষী আলোচ্য বিষয়।'

১০. বীরবলের টিপ্পনী (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—১৩২৮ (২ অগাস্ট, ১৯২১)। পৃষ্ঠা ১৯৪। মূল্যে দেওয়া নাই।

সূচী-পত্র: কংগ্রেসের দলাদলি; 'এতো বড়' কিম্বা কিছু নয়; সাহিত্য বনাম পলিটিকস্; টীকা ও টিপ্পনী; পত্র; গত কংগ্রেস। পরিশিষ্ট—গুলিখোরের আবেদন পত্র: গর্জ্জন-সরস্বতী সংবাদ।

'মুখপত্রে' লেখক বলিয়াছেন 'দেশে যখন লর্ড কার্জনের উপদ্রব হয়, তখন সে উপদ্রবে—যাঁদের চোখ ও মুখ এক সঙ্গে দুই ফোটে—তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলুম একজন। সে সময় আমি স্বনামে বেনামে যে সকল লেখা লিখি—তার মধ্যে দুটি পুনঃ প্রকাশ করছি। আমার বিশ্বাস এ লেখা দুটি বাসি হলেও বিরস হয় নি, অতএব পাঠকের কাছে অরুচিকর হবে না।... বাকী লেখাগুলি সবই কালকের।'...

১১. রায়তের কথা (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—(১০ আগস্ট, ১৯২৬)। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত। পৃষ্ঠা ১৯ (ভূমিকা ও টীকা) +৮০ (মূল গ্রন্থ)। মূল্য বার আনা।

সূচী-পত্র: রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা; গ্রন্থকারের টীকা; রায়তের কথা;[৪১] অভিভাষণ (উত্তরবঙ্গ রায়ত কনফারেন্সের রঙ্গপুর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ); পত্র।[৪২]

---

৪১. ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দু-ইয়ারকি' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৪২. ১৩২৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বীরবলের টিপ্পনী' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

'মুখপত্রে' লেখক বলিয়াছেন—"আমার লেখা রায়তের কথা যখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি সেকালে তাঁর চোখে পড়েনি। সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি পড়েন, এ বিষয়ে তাঁর মতামতসম্বলিত একখানি পত্র আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য। এ লেখা 'টীকাসমেত' রায়তের কথার ভূমিকাস্বরূপে প্রকাশ করবার অনুমতি রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন।"

১২. প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী—(২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০)—পৃষ্ঠা ৩১১। মূল্য দেড় টাকা। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত।

সূচী-পত্র : এই নির্বাচিত রচনা সংগ্রহে আছে চার-ইয়ারী কথা ও আহুতি শীর্ষক দুটি সম্পূর্ণ গল্পগ্রন্থ। সনেট পঞ্চাশৎ ও পদ-চারণ শীর্ষক দুটি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ; তেল নুন লকড়ি শীর্ষক সম্পূর্ণ প্রবন্ধগ্রন্থ; বীরবলের হালখাতা, দু-ইয়ারকি, নানা কথা, বীরবলের টিপ্পনী,[৪৩] রায়তের কথা নামক প্রবন্ধগ্রন্থগুলি আংশিকভাবে এই গ্রন্থাবলী-সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। অতিরিক্ত আছে কথাসাহিত্য নামে একটি প্রবন্ধ। ইহা ছাড়া আছে আরও আটটি গল্প—অদৃষ্ট,[৪৪] সম্পাদক ও বন্ধু,[৪৪] পুজার বলি,[৪৪] গল্প লেখা,[৪৪] নীল লোহিত,[৪৪] নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা,[৪৪] সহযাত্রী,[৪৪] ভাববার কথা।[৪৫]

১৩. নানা চর্চা (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—'উৎসর্গ পত্রের' তারিখ—১মার্চ,

৪৩. 'দু-ইয়ারকি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'নবযুগ' প্রবন্ধটি 'বীরবলের টিপ্পনী'র সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।

৪৪. গল্পগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'নীল-লোহিত' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৪৫. গল্পটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'নীল-লোহিতের আদি প্রেম' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৯৩২। 'মুখপত্রের' তারিখ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২। (১জুন, ১৯৩২)। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ২৭৬। মূল্য দেড় টাকা।

সূচী-পত্র : ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি; অনু হিন্দুস্থান; মহাভারত ও গীতা; বৌদ্ধ ধর্ম; হর্ষ চরিত; পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ; বীরবল; ভারতচন্দ্র; রামমোহন রায়; বাঙালী পেট্রিয়টিজম্, পূর্ব ও পশ্চিম; য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি; ভারতবর্ষ সভ্য কিনা?; গোল-টেবিলের বৈঠক।

'মুখপত্রে' লেখক বলিয়াছেন—"'এ গ্রন্থে যে সকল প্রবন্ধ একত্র করা হয়েছে যদিচ সেগুলি নানাসময়ে নানাবিষয়ে লেখা, তবুও এগুলির ভিতর একটি যোগসূত্র আছে, এ সবগুলিই আমাদের দেশের বিষয় আলোচনা। এ একরকম ভারতবর্ষের হিস্টরি জিওগ্রাফির বই।...আশা করি এ প্রবন্ধগুলি পাঠকদের মনে ভারতবর্ষের বিচিত্র অতীত এবং বর্তমান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কৌতূহল উদ্রেক করবে।"

১৪. **নীল লোহিত** (গল্প-সংগ্রহ)—১৩৩৯? ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যা পরিচয়ে সমালোচিত। শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত পৃষ্ঠা ১৩১। মূল্য এক টাকা।

সূচীপত্র : নীল-লোহিত; নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা; নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর; অদৃষ্ট; সম্পাদক ও বন্ধু; গল্প লেখা; পুজোর বলি; সহযাত্রী; ঝাঁপান খেলা; দিদিমার গল্প; ভূতের গল্প।

১৫. নীল-লোহিতের আদি প্রেম (গল্প-সংগ্রহ)—১৩৪১ কার্তিক সংখ্যা 'পরিচয়ে' সমালোচিত। (২২ আগস্ট, ১৯৩৪)। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ১০৫। মূল্য এক টাকা।

সূচীপত্র : নীল-লোহিতের আদি প্রেম; ট্রাজেডির সূত্রপাত; অবনী-

ভ্রমণের সাধনা ও সিদ্ধি ; অ্যাডভেঞ্চার-স্থলে ; এ্যাডভেঞ্চার-জলে ; ভাববার কথা।

'উৎসর্গপত্রে' লেখক বলেছেন—'আমার এদানিকের লেখা ক'টি গল্প তোমাকে উপহার দিচ্ছি। পড়ে ফেলো, হয়ত মন্দ লাগবে না, যদিচ গল্প ক'টি পাঁচমিশালী। আর সব ক'টিকে গল্প বলা যায় কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে এ লেখাগুলিকে গল্প বলছি এই কারণে যে এ যুগে গল্প সাহিত্যের কোন ধরাবাঁধা বিষয়ও নেই, রূপও নেই।'…

১৬. ঘরে বাইরে (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—(২৪ নভেম্বর, ১৯৩৬)। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ১২২। মূল্য এক টাকা।

সূচীপত্র ঃ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষানৈতিক ও অন্যান্য বহুবিচিত্র বিষয় সম্পর্কে নয়টি 'প্রস্তাব' বা অধ্যায়। প্রত্যেকটি প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমকালীন সমস্যাগুলি সম্পর্কে টীকা-টিপ্পনী করাই হইতেছে সেই নয়টি প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

মুখপত্রে লেখক বলিয়াছেন—"১৩৪০ বঙ্গাব্দে চোখে পড়বার মতো নানারূপ ঘটনার বিষয় আমি 'উদয়ন' পত্রিকায় আমার ঘোৎ-ফরকা মতামত প্রকাশ করি। সেই পূর্ব লেখাগুলি একত্র করে আমি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করছি। যখন এ লেখাগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন অনেকের কাছে তা গ্রাহ্য হয়েছিল। সুতরাং আমি আশা করি এখন তা অপাঠ্য বলে গণ্য হবে না।…এ সমালোচনাগুলির 'ঘরে বাইরে' নাম আমি দিইনি, দিয়েছিলেন 'উদয়ন' পত্রিকার সম্পাদক।"

১৭. ঘোষালের ত্রিকথা (গল্প-সংগ্রহ)—মুখপত্রের তারিখ ২৮.৯.৩৭। উৎসর্গ-পত্রের তারিখ ৩০.৯.৩৭। শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ৯৩। মূল্য পাঁচ সিকা।

সূচী-পত্র : ফরমায়েসী গল্প[৪৬] ; ঘোষালের হেঁয়ালি ; বীণাবাই।

'মুখপত্রে' লেখক বলিয়াছেন—"মাসখানেক পূর্বে ঘোষালের বেনামীতে আমার লেখা—'বীণাবাই' নামক গল্পের প্রশংসাসূত্রে 'বাতায়ন' পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তার অন্তরে উক্ত প্রবন্ধের লেখক একটি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ঘোষালের গল্পগুলি একত্র করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা উচিত।...আশা করি, 'ঘোষালের ত্রিকথা'—পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে।"

১৮. অণুকথা সপ্তক (গল্প-সংগ্রহ)—১৩৪৬। (১ জুলাই, ১৯৩৯)। শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ৫৯। মূল্য এক টাকা।

সূচী-পত্র : মন্ত্রশক্তি ; যথ ; ঝোট্টন ও লোট্টন ; মেরি ক্রিসমাস ; ফার্স্ট ক্লাশ ভূত ; স্বপ্ন-গল্প ; প্রগতি রহস্য।

'উৎসর্গপত্রে' লেখক বলিয়াছেন—'এই গল্পগুলি সবই ছোটগল্প। ছোটগল্পের সংস্কৃত নাম আমি জানিনে—তাই এদের নাম দিয়েছি অণুকথা। এই সব একরত্তি কথার ভিতর কোন বড় কথা নেই; তা সত্ত্বেও এদের অন্তরে যদি কিছু গুণ থাকে ত, তা তোমার মত সহৃদয় হৃদয়বেদ্য।'

১৯. প্রাচীন হিন্দুস্থান (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬। (১ জুলাই ১৯৩৯)। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত। পৃষ্ঠা ১১৭। মূল্য আট আনা।

সূচী-পত্র : ভূ-বৃত্তান্ত[৪৭] ; ইতিবৃত্তান্ত।

২০. গল্প-সংগ্রহ—২০ ভাদ্র, ১৩৪৮। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সংবর্ধনা সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রকাশিত। কালীপ্রসাদ চৌধুরীকে উৎসর্গীকৃত (উৎসর্গপত্রের তারিখ—৬সেপ্টেম্বর, ১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

---

৪৬. পূর্বে ১৯১৯ সালে 'আহুতি' শীর্ষক গল্প-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

৪৭. পূর্বে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'নানা চর্চা' গ্রন্থভুক্ত 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি' ও 'অনু-হিন্দুস্থান' প্রবন্ধ-দ্বয়ের সংশোধিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ।

ভূমিকা সম্বলিত। পৃষ্ঠা ॥ (ভূমিকা, সূচী-পত্র ইত্যাদি+৫০০ (মূল গ্রন্থ)। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

সূচী-পত্র ঃ প্রবাস স্মৃতি ; চার-ইয়ারি কথা ; আহুতি ; বড়বাবুর বড়দিন ; একটি সাদা গল্প ; ছোটগল্প ; রাম ও শ্যাম ; নীল-লোহিত ; নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা , নীল-লোহিতের স্বয়ংম্বর ; নীল-লোহিতের আদিপ্রেম ; অদৃষ্ট ; সম্পাদক ও বন্ধু ; গল্প লেখা ; পূজার বলি ; সহযাত্রী ; ঝাঁপান খেলা ; দিদিমার গল্প ; ভূতের গল্প ; ট্রাজেডির সূত্রপাত ; অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি ; অ্যাডভেঞ্চার-স্থলে ; এ্যাডভেঞ্চার-জলে ; ভাববার কথা ; ফরমায়েসি গল্প ; ঘোষালের হেঁয়ালি ; বীণাবাই ; পুতুলের বিবাহ-বিভ্রাট ; মন্ত্রশক্তি ; যখ ; ঝোট্টন ও লোট্টন ; মেরি ক্রিস্‌মাস ; ফার্স্ট ক্লাশ ভূত ; স্বপ্ন-গল্প ; প্রগতি রহস্য ; জুড়িদৃশ্য ; চাহার দরবেশ ; সারদাদাদার সন্ন্যাস।

২১. **রায়তের কথা**—বৈশাখ, ১৩৫১। (১৬ মে, ১৯৪৪)। পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থের বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ রূপে আত্মপ্রকাশ। পূর্ব-সংস্করণ থেকে 'অভিভাষণ' ও 'পত্র' বর্জিত।

২২. **আত্মকথা** (আত্মজীবনীর প্রথম পর্ব)—গ্রন্থের তারিখ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ : প্রকাশকের নিবেদনের তারিখ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ ; ভূমিকার তারিখ অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ ; গ্রন্থকারের কৈফিয়তের তারিখ ১৯৪২। (২৮ জুন, ১৯৪৬)। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ১০ (নামপত্র, উৎসর্গপত্র) প্রকাশকের নিবেদন, কৈফিয়ৎ ইত্যাদি+১১৪ (মূল গ্রন্থ)। মূল্য আড়াই টাকা।

সূচীপত্র ঃ জন্ম হইতে বিলাত গমন পর্যন্ত আত্মকথা ইহাতে উপস্থাপিত হইয়াছে।

পুস্তিকা-পঞ্জী

১. বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ডিসেম্বর, ১৯৪৪। (২১ ডিসেম্বর, ১৯৪৪)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা। পৃষ্ঠা ১৭।

সূচীপত্র : বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার পর নবাবী আমল ও ইংরাজ আমলের বাংলা সাহিত্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

২. সেকালের গল্প (ছোটগল্প)—১ আষাঢ়, ১৩৩৯। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত।

৩. নীললোহিতের আদিপ্রেম (ছোটগল্প)—৬ ফাল্গুন, ১৩৩৯। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত।

৪. ট্রাজেডির সূত্রপাত (ছোটগল্প)—৩১ ভাদ্র, ১৩৪০। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত।

৫. সভাপতির অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী; একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন; কৃষ্ণনগর; ২৯ মাঘ, ১৩৩৪। পৃষ্ঠা ১৫।

৬. দুই না এক—বৈশাখ ১৩৫১। থিয়োফিল গোতিয়ের গল্পের অনুবাদ 'ভারতী' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত। প্রতিভা বসু সম্পাদিত।

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

1. The story of Bengalee Literature—(15 August, 1917) Paper read at the Summer Meeting at Darjeeling on the 14th of June, 1917. p. 17.

2. Tales of Four Friends—June, 1944. English translation of car-iyāri kathā by Indira Devi Chaudhurani. p. 119.

যুগ্ম-রচনাবলী

১. বারোয়ারী (উপন্যাস)—২ মে, ১৯২১। বারোজন লেখক এই উপন্যাসের রচয়িতা। প্রমথ চৌধুরীর রচনা ৩৩ হইতে ৩৬ পরিচ্ছেদ।

২. পত্রাবলী। ধর্ম ও বিজ্ঞান। ১ অক্টোবর, ১৯৩১। বীরবল ছাড়া অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও দিলীপকুমার রায়ের পত্রালোচনা গ্রন্থটিতে আছে। প্রমথ চৌধুরীর 'মুখপত্র', বীরবলের পত্র ১-৩ এবং ফ্রান্সের নব মনোভাব 'পত্রাবলীতে' স্থান পাইয়াছে।

অভিভাষণ—প্রমথ চৌধুরী, বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, চন্দননগর, ৯ ফাল্গুন, ১৩৪৩। সাহিত্যশাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণের সঙ্গে দর্শন ও ইতিহাস শাখা দুইটির সভাপতিদের অভিভাষণও একত্রে ছাপা হইয়াছিল।

৪. হিন্দুসঙ্গীত (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—বৈশাখ, ১৩৫২। (১৪ জুন, ১৯৪৫) প্রমথ চৌধুরীর লেখা দুইটি প্রবন্ধ—হিন্দুসঙ্গীত[৪৮] ও সুরের কথা[৪৮]। গ্রন্থটির তৃতীয় প্রবন্ধ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর লিখিত 'সঙ্গীত পরিচয়'।

মরণোত্তর প্রকাশন

১. প্রবন্ধ-সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)—৭ আগস্ট, ১৯৫২। পূর্বপ্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত ছাব্বিশটি প্রবন্ধ। সম্পাদক ও ভূমিকা-লেখক অতুলচন্দ্র গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৩৩।

২. প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু মুসলমান—ফাল্গুন, ১৩৬০। পৃষ্ঠা ৩২।

৩. প্রবন্ধ-সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড)—মার্চ, ১৯৫৪। পূর্বপ্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত চব্বিশটি প্রবন্ধ। সম্পাদক অতুলচন্দ্র গুপ্ত। পৃষ্ঠা ২৭৭।

৪৮. 'হিন্দুসঙ্গীত' ও 'সুরের কথা' প্রবন্ধ দুইটি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'বীরবলের হালখাতা' প্রবন্ধ-সংগ্রহ হইতে লওয়া হইয়াছে।

৪. সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা—৭ আশ্বিন, ১৮৮৩ শকাব্দ। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬ (নামপত্র, গ্রন্থসূচী, কবিতা-সূচী ইত্যাদি) + ১৭১ (মূল গ্রন্থ)।

সূচী-পত্র : সনেট-পঞ্চাশৎ (সম্পূর্ণ গ্রন্থ), পদচারণ সম্পূর্ণ গ্রন্থ, (নূতন সংযোজিত) অন্যান্য দশটি কবিতা এবং গ্রন্থপরিচয়। গ্রন্থপরিচয়ে সংযোজিত হইয়াছে পূর্বকথা (সম্পাদক-লিখিত), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত প্রমথ চৌধুরীর তিনটি পত্র, গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী, প্রসঙ্গ-কথা, বিজ্ঞপ্তি প্রথম ছত্রের সূচী এবং টীকা টিপ্পনী। ১৩৭৮-এর পৌষ সংস্করণে 'সনেট-পঞ্চাশৎ' সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রিয়নাথ সেনের আলোচনা এবং প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট কেন চতুর্দশপদী ?' প্রবন্ধটি অতিরিক্ত সংযোজিত হইয়াছে।

৫. গল্পসংগ্রহ (পরিবর্ধিত সংস্করণ)—২৫ বৈশাখ, ১৩৭৫। এই পরিবর্ধিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ, ১৩৮১। এতে 'প্রসংগকথায়' আছে 'চার-ইয়ারি কথা প্রসংগে প্রমথ চৌধুরী' (বৈশাখী, ১৩৫২), 'প্রমথ চৌধুরীর গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ', 'সাময়িক পত্রে প্রকাশ নির্দেশ,' পুলিনবিহারী সেন লিখিত 'প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থসূচী', টীকা-টিপ্পনী।

সূচী-পত্র : ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত সংস্করণে যে গল্পগুলি ছিল, তাহার অতিরিক্ত আটটি গল্প—প্রিন্স ; বীরপুরুষের লাঞ্ছনা ; ধ্বংসপুরী ; সারদাদাদার সত্যগল্প ; সরুমোটা ; সোনার গাছ হীরের ফুল ; সীতাপতি রায় ; সত্য কি স্বপ্ন।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী

১. আত্মকথার দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে এই রচনাগুলি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইবার অপেক্ষায় আছে—

(ক) আত্মকথা—বিশ্বভারতী, ১ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৯।

(খ) আত্মকথা—বৈশাখী, ১৩৫২।

(গ) আত্মকথা—পূর্বাশা, ষোড়শ বর্ষ, ১৩৬০।

২. পত্রগুচ্ছ কিছু কিছু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক পত্র কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। সবগুলি সম্পাদনার পর খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এযাবৎ যাহা সাময়িক পত্রে বা অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কিছু উল্লেখ করিতেছি—

(ক) পত্রগুচ্ছ—ইন্দিরা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী ও রাধারাণী দেবীকে লিখিত মোট ষোলটি পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫৪।

(খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত মোট তিনটি চিঠি। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা' (১৮৮৩ শকাব্দ) গ্রন্থে মুদ্রিত।

(গ) 'দেশ' পত্রিকায় বোধহয় (পঞ্চাশের দশকে) হারীতকৃষ্ণ দেব সবুজপত্র, সবুজপত্রের আড্ডা ও প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রমথ চৌধুরীর বেশ কয়েকটি পত্র সংযোজিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

(ঘ) 'দেশ' পত্রিকায় (সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৭) সুভাষ চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত ইন্দিরা দেবী-প্রমথ চৌধুরীর পত্রগুচ্ছে প্রমথ চৌধুরীর চিঠিগুলি।

(ঙ) 'দেশ' পত্রিকায় (৮ নভেম্বর, ১৯৮০॥ ৪৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা থেকে ক্রমশঃ প্রকাশিত) সুভাষ চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত 'বি'-কে 'প্র' পত্রগুচ্ছ।

(চ) বরদাচরণ গুপ্তের 'শাশ্বত তরুণ' (বৈশাখ, ১৩৫৪) গ্রন্থে মুদ্রিত প্রমথ চৌধুরীর একটি পত্রের ফটো-কপি। পত্রটির তারিখ ১০. ৫. ১৭—১নং ব্রাইট স্ট্রীট, বালিগঞ্জ হইতে লিখিত।

(ছ) পরিমল গোস্বামী লিখিত 'পত্রস্মৃতি' (আগস্ট, ১৯৭১) প্রমথ চৌধুরীর লিখিত একটি চিঠি।

৩. মৃচ্ছকটিক (প্রবন্ধ)—বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫৪।

৪. বাংলা সাহিত্যের কথা (অনূদিত প্রবন্ধ, অনুবাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)—কল্লোল, পৌষ, ৮ মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩১।

৫. সমালোচনা (প্রবন্ধ)—কল্লোল, আশ্বিন, ১৩৩৩।

৬. বীরবল (প্রবন্ধ)—কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩৪।

৭ লেখা (প্রবন্ধ —কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩৪।

৮. আমি কেন নীরব (প্রবন্ধ)—কল্লোল, ১৩৩৫।

৯. ছোটগল্প—ভূমিকা, সুধীর সরকার সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ'।

১০. ভূমিকা, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে'।

প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে আলোচনা

গ্রন্থরাজি :

১. জীবেন্দ্র সিংহ রায়—প্রমথ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ : ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪। তৃতীয় সংস্করণ ; ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৬। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত।

২. রথীন্দ্রনাথ রায়—বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ—১৯৫৮। দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৬৯। 'জিজ্ঞাসা' কর্তৃক প্রকাশিত।

৩. তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—বীরবল ও বাংলা সাহিত্য। প্রথম প্রকাশ :

১৯৬০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৮ ক্লাসিক প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রবন্ধমালা ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড ; ১৩৫২)

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভূমিকা, রায়তের কথা (প্রমথ চৌধুরী)

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভূমিকা, গল্পসংগ্রহ (প্রমথ চৌধুরী)

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যবিচার (প্রবন্ধ), সাহিত্যের স্বরূপ (১৩৫০)

৫. অতুলচন্দ্র গুপ্ত—ভূমিকা, প্রবন্ধ-সংগ্রহ (প্রমথ চৌধুরী)

৬. অতুলচন্দ্র গুপ্ত—ভূমিকা, শাশ্বত তরুণ (বরদাচরণ গুপ্ত। ১৩৫৪)

৭. অতুলচন্দ্র গুপ্ত—প্রমথ চৌধুরী (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫৪

৮. অতুলচন্দ্র গুপ্ত—রীতিবিচার, শ্লেষ : পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৮

৯. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—চলমান জীবন (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম খণ্ডের ভূমিকার তারিখ ১১ ভাদ্র, ১৩৫৯)।

১০. প্রমথনাথ বিশী—প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত প্রবন্ধ, বাংলার লেখক প্রথম খণ্ড (১৩৫৭) [৪৯]

১১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোল যুগ (চতুর্থ সং)

১২. Buddhadeva Bose—Chapter Two : Pramatha Chaudhuri, An Acre of Green Grass (1948)

---

৪৯. 'বাংলার লেখক' প্রথম খণ্ডে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত প্রবন্ধটি বিশ্বভারতী পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৫৩) একই শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধেরই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

১৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (দ্বিতীয় সং, ১৩৭২)

১৪. অন্নদাশঙ্কর রায়—বীরবল
১৫. অন্নদাশঙ্কর রায়– প্রমথ চৌধুরীর কবিতা
১৬. অন্নদাশঙ্কর রায়—প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি।
১৬ক. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত পত্র (প্রসঙ্গ ঃ প্রমথ চৌধুরী)
} 'প্রবন্ধ' (১৯৬৪)।

১৭. সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—সবুজ কথা

১৮. প্রিয়নাথ সেন—সনেট-পঞ্চাশৎ (পুস্তক-পরিচয়), সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২০

১৯. রমাপ্রসাদ চন্দ—সবুজ-সাহিত্য (সবুজপত্র প্রসঙ্গ); সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

২০. সাহিত্য, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-আশ্বিন-অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৩২৩— মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় সবুজপত্রের ১৩২৩ সালের বিভিন্ন সংখ্যার সমালোচনা আছে।

২১. সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড, ১৯৬৩ সং)

২২. নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩১৯ (প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা— 'সনেট-পঞ্চাশৎ')

২৩. অমিয় চক্রবর্তী—প্রমথ চৌধুরীর গল্প, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪২ (প্রসঙ্গ ঃ 'অণুকথা সপ্তক')

২৪. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—প্রমথ চৌধুরীর গল্প, পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৮ (প্রসঙ্গঃ প্রমথ চৌধুরীর গল্পের সাধারণ আলোচনা)।

২৫. বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ—'চার ইয়ারি কথা', পরিচারিকা, আষাঢ়, ১৩২৪

২৬. সনেট-পঞ্চাশৎ—জাহ্নবী, বৈশাখ, ১৩২০

২৭. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য—'নীল-লোহিতের আদিপ্রেম', পরিচয়, কার্তিক, ১৩৪১

২৮. সুকুমার সেন—'বিচিত্র নিবন্ধ,' (১৯৬০) (প্রসঙ্গ : প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর কবিতা)।

পত্রিকা-সম্পাদনা

১. সবুজপত্র :

প্রমথ পর্যায় : বৈশাখ, ১৩২১—বৈশাখ, ১৩২৯ দ্বিতীয় পর্যায় : ভাদ্র, ১৩৩২—ভাদ্র, ১৩৩৪ মোট দশ বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। দশটি খণ্ডে প্রথম দিকে মাসের হিসাবে গোলমাল নাই, কিন্তু শেষের দিকে গরমিল দেখা যায়। তবে প্রথম হইতেই পত্রিকাটির প্রকাশ ছিল অনিয়মিত, তাহা লইয়া রবীন্দ্রনাথ বিরক্তি বোধ করিয়াছেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পরে পণ্ডিচেরী নিবাসী) সবুজপত্র সম্পাদনায় প্রমথ চৌধুরীকে সাহায্য করিতেন। অষ্টম বর্ষে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম সহ-সম্পাদক হিসেবে মুদ্রিত হইয়াছে। যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরীর ক্যালকাটা উইকলি নোটস প্রেস ও কান্তিক প্রেসে সবুজপত্র ছাপা হইত। ইহার প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছিলেন নন্দলাল বসু—যৌবনের রং সবুজের ওপর সাদা তালপাতার ছবি। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চারি আনা, বার্ষিক দুই টাকা ছয় আনা। প্রচার ব্যাপক ছিল না, কিন্তু গুরুতর প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। সবুজপত্র-বিরোধী পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'নারায়ণ'। অন্যান্য সমালোচক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সাহিত্য'; 'আর্যাবর্ত'; 'যমুনা'; 'ভারতবর্ষ,' 'মানসী,' 'বসুমতী' ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে সবুজপত্র একটি

বিশিষ্ট ও বিতর্কিত পত্রিকা হিসাবে আজিও আলোচনার বিষয় হইয়া আছে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্পাদক প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'মুখপত্রে' পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। 'সবুজপত্র' অনিয়মিত প্রকাশ, মুদ্রণ-প্রমাদ, বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সত্ত্বেও প্রমথ চৌধুরীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। ইহার মাধ্যমে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বাংলা সাহিত্যের বীরবলী যুগ ও সবুজপত্র গোষ্ঠী। দ্বিতীয়তঃ, ইহা তাঁহার নিজস্ব পত্রিকা ছিল বলিয়া ইহার মাধ্যমে তিনি তাঁহার চলিত ভাষারীতি, নতুন রচনারীতি ও সুচিন্তিত সাহিত্যাদর্শ দৃঢ়তা ও যত্নের সঙ্গে প্রচার করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, সবুজপত্র গতানুগতিক ধরনের পত্রিকা ছিল না। নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করা এবং দেশ বিদেশে প্রচারিত বিভিন্ন মত ও পথকে যাচাই করার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল সবুজপত্র। চতুর্থতঃ, এই পত্রিকা নূতন যৌবন-ভাবনায় ও নূতন ঢঙের রীতির রচনায় রবীন্দ্রনাথকেও উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।[৫০] কবিগুরু নিজেই এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমি যখন সাপ্তাহিকপত্র চালনায় ক্লান্ত ও বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বান মাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হইনি।"[৫১]

৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষ সপ্তক (২৫ বৈশাখ, ১৩৪২), ৪৫ নং কবিতা।
৫১। প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংগ্রহের 'ভূমিকা' (১৯৪১)।

২. রূপ ও রীতি : কার্তিক, ১৩৪৭—শ্রাবণ, ১৩৪৯।

৩. বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ, ১৩৪৯—আষাঢ়, ১৩৫০।

৪. অলকা—স্বল্পায়ু, অলকা কতদিন প্রমথ চৌধুরী সম্পাদনা করিয়াছিলেন তাহা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নি। তবে পত্রিকাটির সম্পাদক যে তিনি ১৩৩৯ সালে ছিলেন তাহার লিখিত সাক্ষ্য আছে। পরিমল গোস্বামী ছিলেন পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক।

৫. উদয়ন ও বাতায়ন পত্রিকার সঙ্গেও প্রমথ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সবুজসভা

প্রমথ চৌধুরীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার ১নং ব্রাইট স্ট্রীটের 'কমলালয়ে' একটি সাহিত্য মজলিশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মজলিশটি সবুজসভা বা সবুজ-পত্রের আড্ডা নামে পরিচিত। এই আড্ডার মজলিশবর ছিলেন তিনি স্বয়ং, আর তাঁর সহযোগী ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দিলীপকুমার রায়, বিশ্বপতি চৌধুরী (ল' কলেজে চৌধুরী মহাশয়ের ছাত্র), সতীশচন্দ্র ঘটক, হারীতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদি (ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সবুজপত্রী অর্থাৎ সবুজপত্রের নবীন লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্গত)। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় মজলিশটি বসিত—তবে অন্যান্য দিনেও কেহ কেহ আসিয়া জমায়েত হইতেন। রবীন্দ্রনাথও কয়েকবার আসিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর কখনও সাহিত্যালোচনা কখনও সংগীতচর্চা হইত। সবুজসভায় সকলেরই আপন মত ব্যক্ত করার ও তর্ক-বিতর্কে যোগ দেওয়ার অবাধ সুযোগ ছিল। তবে সমস্ত বক্তব্যেরই লক্ষ্য থাকিতেন প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-

বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সব কিছুরই আলোচনা সেখানে হইত। আলোচনার লক্ষ্য হইত—এ সব বস্তু যাহাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফূর্তি দেয়, যেন বোঝা না হইয়া উঠে। বুদ্ধিতে যাহা বাধে তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, তাহার সমর্থনে যত বড় নামই থাকুক না কেন। আলোচনার ধরনটা কখনও কখনও হালকা হইলেও বিষয়বস্তু হালকা থাকিত না।

সম্মান-লাভ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমথ চৌধুরীকে তাঁহার সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি হিসাবে 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে এক বিরাট প্রমথ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি দেশবাসী কর্তৃক সম্বর্ধিত হন।[৫২]

প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা সাহিত্য

সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র তাঁহার গাণ্ডীব। আর সবুজপত্রীরা পাণ্ডব-সেনার দল। বাংলা সাহিত্যের কুরুক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় নবীন লেখকগোষ্ঠী লইয়া তাঁহার সাহসিক সংগ্রামের কথা ইতিহাস অস্বীকার করিতে পারিবে না। তিনি এক হাতে ভাঙিয়াছেন, অন্য হাতে গড়িয়াছেন। তিনি ছিলেন রাজ-লেখক—তাঁহার সাহিত্য প্রতিভায় নব্যতা ছিল, ছিল অনন্যতা। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহে এক পরম বিস্ময়। যদিও তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব আজও বিতর্কের অতীত নয়, তবুও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ ঠিক বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের কর্ণধারের ভূমিকা দিতে চাহিয়াছিলেন এবং নিজের উত্তমর্ণরূপে তাঁহাকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন।

৫২। প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ, কার্তিক, ১৩৫৩।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর ঐতিহাসিক ভূমিকা কী, তাহা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১. বয়সের হিসাবে তিনি ছিলেন পুরাতন ও নূতন কালের যোগসূত্র। পুরাতন কাল হইতে যতটুকু লওয়ার মতো তাহা তিনি যথাযথ ভাবে লইয়াছিলেন এবং নিজের মনকে তাহাতে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, আধুনিক কালের হাওয়া বহিতেছে বুদ্ধির জগৎ হইতে। নতুন সাহিত্য মুখ্যতঃ বুদ্ধি প্রসূত। তাই তিনি যুগধর্মী হইয়া বুদ্ধিধর্ম বা মননশীলতার উজ্জ্বল সূর্যালোক বাংলা সাহিত্যে ছড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

২. প্রমথ চৌধুরী বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী জীবনচর্যায়, ব্যক্তিস্বভাবে ও চিন্তাপ্রণালীতে একটা শৈথিল্য বা ঢিলে-ঢালা ভাব বহন করিয়া চলে। তাঁহার সাহিত্যেও আছে সেই স্বভাবগত ও চিন্তাগত শৈথিল্য, অস্পষ্টতা ও অপরিচ্ছন্নতার ছাপ। তিনি তাঁহার রচনায় সেই পূর্বোক্ত শৈথিল্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন; যুক্তিতর্কের সাহায্যে চিন্তার সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন প্রকাশে তিনি মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যকে সত্য অর্থে সুচিন্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

৩. তিনি দেখিয়াছিলেন, অনেক বাঙালী লেখক লেখা জিনিসটাকে চর্চার বিষয় বলিয়া মনে করেন না—মনে করেন নৈসর্গিকী প্রতিভার ফল। ফলে তাঁহাদের রচনায় মধ্যে পূর্ণাঙ্গতার চিহ্ন নাই। কিন্তু তিনি নিজে লেখা জিনিসটাকে আর্ট বলিয়া মনে করিতেন এবং 'ধীরে ও ধনে' লিখিতেন। প্রমথ চৌধুরী এই আর্টের আদর্শ, যত্ন ও পূর্ণমনস্কতার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—কী লিখিব ইহা যেমন ভাবনার বিষয়, তেমনি কেমন করিয়া লিখিব তাহাও সমান ভাবনার বিষয়। বাংলা সাহিত্যকে পরিণত বাচা করার কাজে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য।

৪. প্রমথ চৌধুরীর স্টাইল তাঁহার মনোজীবনের শৈল্পিক অভিক্ষেপ ব্যক্তিত্ব ও মননধর্মিতার সাহিত্যিক প্রকাশ। তাঁহার 'আদিম মানব' নামক প্রবন্ধটি সাধু ভাষায় লেখা, কিন্তু বীরবলী সাহিত্যের নিজস্ব ঢঙটি তাহাতে বজায় আছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—'লোকে যাকে বীরবলী ঢঙ বলে, সে ক্রিয়াপদের হ্রস্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না। ও হচ্ছে রচনার একটা বিশেষ ভঙ্গি।' প্রমথ চৌধুরী নিজের ভাববস্তু প্রকাশ করিতে গিয়া যুক্তি-তর্কে, শব্দ-নির্বাচনে, ভাষার কারিগরিতে, উইট-প্যারাডক্স অ্যান্টিক্লাইমেক্স-এপিগ্রামের চাতুরীতে প্রচুর মনোনিবেশ করিয়াছেন—ফলে সব মিলিয়া তাঁহার রচনার এমন একটা বিশেষ ভঙ্গি দাঁড়াইয়া গিয়াছে যাহার নাম বীরবলী ঢঙ। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয়, তাঁহার বলিবার ভঙ্গিটি ঠিক অন্যের মতো নহে; কথাগুলি এমনভাবে আর কেহই বলেন নাই, বলিতে পারিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার লেখার ভঙ্গি লেখার বিষয়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। লিপিকুশলতার এই বীরবলী ঢঙ বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর দান।

৫. বীরবল সব বিষয়কে তলাইয়া দেখিতে ভালো বাসিতেন—তাহার হাতিয়ার ছিল বুদ্ধিযন্ত্র ও যুক্তিযন্ত্র। কিন্তু বিষয়-বিচারে তিনি কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বগত পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন না, কারণ তিনি ছিলেন 'ism-নাস্তিক।' যেখানেই স্খলন-পতন-ত্রুটি-শৈথিল্য দেখিয়াছেন সেখানেই তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। ফলে এক বিশেষ ধরনের হাস্যরস—অম্লকষায় রস—তাঁহার লেখায় জমিয়া উঠিয়াছে। অম্লকষায় হাস্য-রস বীরবল রাখিয়া গিয়াছেন বাংলা সাহিত্যে।

৬. বাঙালী ভালোবাসে সেই মানুষকে—যে হৃদয়বান, আবেগ-প্রবণ, ভাবাসক্ত ও আত্মহারা। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ছিলেন ভাবালুতাহীন, নির্বিকার, নিরাসক্ত ও আত্মসচেতন। তাঁহার লেখায় যেখানে সহৃদয়তা ও আবেগ আছে সেখানেও তাহা এত গভীর প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম যে, তাহা পাঠকের

নিকট ধরা পড়িতে চায় না। 'যদি কোন পক্ষপাত প্রকাশ পায় সে একমাত্র মৌল মনুষ্যত্বের প্রতি, আর তাহা সত্যকার পক্ষপাত নয়।' প্রমথ চৌধুরী এই নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্ততার আদর্শ বাংলা সাহিত্যে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

৭. প্রমথ চৌধুরী মনে করিতেন, বাণীর বসতি রসনায়। মুখের কথার সঙ্গে লেখার কথার যতটা মিল রাখা যায় ততটাই সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গল (অবশ্য সাহিত্যের ভাষার আর্টের গুণ থাকিবেই, ইহা তিনি মানিতেন)। তাই তিনি আমৃত্যু সাধু ভাষার বিপক্ষে ও চলিত ভাষার সপক্ষে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, রচনাবলীতে, সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় এবং অন্যত্র। বস্তুতঃ এক ভাষা-আন্দোলনের নেতা হিসাবেই প্রমথ চৌধুরী অধিকতর পরিচিত। পরিণামে তাঁহারই জয় হইয়াছে। আধুনিক বাংলা গদ্যের সারা শরীরে তাঁহার সেই জয়ের চিহ্ন ছড়াইয়া আছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে সাধু ভাষাকে প্রায় সিংহাসনচ্যুত করিয়া চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রমথ চৌধুরীর এক বিশিষ্ট কীর্তি।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
ও
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৮৮

মূল্য : চার টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রশান্ত রায়
মাঝি পত্রিকা-প্রেস, ৭ সুকিয়া রো, কলিকাতা-৭০০০০৬

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১২৬০ বঙ্গাব্দের ১৫ই চৈত্র পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে মহেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গোপীনাথ রায় চূড়ামণি। মহাত্মা রামমোহন রায় যে পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন মহেন্দ্রনাথও সেই বংশের সন্তান। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্ট নারায়ণের অধস্তন চতুর্বিংশতম পুরুষ ব্রজবিনোদের তিনপুত্র ছিল, ইঁহাদের নাম নিমানন্দ, রামকিশোর ও রামকান্ত। রামমোহন শেষোক্ত রামকান্তের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। রামকিশোর ছিলেন মহেন্দ্রনাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। সুতরাং জ্ঞাতিত্ব সূত্রে মহেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের প্রপৌত্র স্থানীয় ছিলেন। ইঁহাদের কৌলিক উপাধি বাঁড়ুজ্যা বা বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ পরশুরাম নবাব সরকারে চাকুরী সূত্রে 'রায়' উপাধি পাইয়াছিলেন।

শিক্ষা

গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা শেষে মহেন্দ্রনাথ রায় রাধানগর গ্রামে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত কলেজের বিদ্যালয় বিভাগে প্রবেশ করেন। বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করার সময়ে ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৭৭) দারিদ্র্য-হেতু মহেন্দ্রনাথকে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করিয়া

জীবিকান্বেষণে বাহির হইতে হয়। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পূর্বে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ মহেন্দ্রনাথের বিদ্যাবত্তা ও বিদ্যানুরাগের জন্য তাঁহাকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দান করেন। ইহার পর হইতে মহেন্দ্রনাথ রায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি রূপেই পরিচিতি লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা শেষ না করিতে পারিলেও মহেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য উত্তম রূপে আয়ত্ত করেন। মাতৃভাষা বাংলা এবং ইংরাজী ভাষাতেও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কর্ম ও পারিবারিক জীবন

বাল্যকাল হইতেই মহেন্দ্রনাথ সাহিত্য চর্চায় প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃত কলেজে পাঠকালেই তিনি রামমোহনের জীবনী রচনার উপকরণ সংগ্রহে ব্রতী হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দৈনিক 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র একজন লেখক ছিলেন। শিক্ষান্তে জীবিকার তাড়নায় মহেন্দ্রনাথকে কিছুকাল ছাপাখানার প্রুফ দেখা, গৃহশিক্ষকতা প্রভৃতি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পর তিনি কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে অবস্থিত ব্রাউটন ইনস্টিটিউশন নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের 'হেড্-পণ্ডিত' নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কালে মহেন্দ্রনাথের অন্যতম ছাত্র ছিলেন—পরবর্তী সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সংগঠক ও খ্যাতনামা সাহিত্যসেবক—ব্যোমকেশ মুস্তাফী। ব্রাউটন ইনস্টিটিউশন কিছুদিন পরে 'কটন ইনস্টিটিউশন' নাম ধারণ করিয়া অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। মহেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ে কাজ করেন নাই; অতঃপর তিনি কলিকাতার 'সিটিস্কুল', 'কেশব একাডেমি', 'এডোয়ার্ড ইন্সটিটিউশন,'

আন্দুল উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হেড্-পণ্ডিত রূপে কার্য করেন। কলিকাতার কেশব একাডেমিতেই মহেন্দ্রনাথের শিক্ষক জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। মৃত্যুকালে তিনি বঁ্যাটরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ব্যতীত মহেন্দ্রনাথ 'আর্য দর্শন' 'অনুসন্ধান' 'জন্মভূমি' 'সাহিত্য-সংহিতা' 'কল্পনা' প্রভৃতি সাময়িক পত্র সম্পাদন ও পরিচালনার কার্যেও সময়ে সময়ে নিযুক্ত ছিলেন। অবশ্য সম্পাদক রূপে এই সকল পত্রিকায় তাঁহার নাম সর্বক্ষেত্রে প্রকাশিত হইত না। ১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি স্বনামে 'পুরোহিত' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তিনি 'অনুশীলন' নামেও একটি মাসিক পত্র প্রবর্তন করেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে এই দুইটি পত্র মিলিত ভাবে 'অনুশীলন ও পুরোহিত' নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। অর্থাভাব বশতঃ মহেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'অনুশীলন ও পুরোহিত' দীর্ঘজীবী হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে মহেন্দ্রনাথ ইহার সদস্য নির্বাচিত হন। ইহার কিছুদিন পর ১৩০৩ বঙ্গাব্দে মহেন্দ্রনাথ এক বৎসরের জন্য সবেতন (মাসিক ২০ টাকায়) পরিষদের সহকারী সম্পাদকপদেও কার্য করেন।

অল্প বয়সেই মহেন্দ্রনাথের সহিত হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন বাকড়া গ্রামের ভূপতি ভট্টাচার্যের এক কন্যার বিবাহ হয়। মহেন্দ্রনাথ পুত্র-সৌভাগ্যে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার তিনটি কন্যা ছিল। দারিদ্র্য নিবন্ধন তিনি কন্যাদের সুপাত্রে বিবাহ দিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তিনি সাতিশয় মনোকষ্ট অনুভব করিতেন। মহেন্দ্রনাথের শেষ জীবন অতিশয় দুঃখময় ছিল। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়।

ইহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পঞ্চাননী দেবী বিধবা হইয়া একটি শিশুপুত্র সহ মহেন্দ্রনাথের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। চিরদরিদ্র মহেন্দ্রনাথের দারিদ্র্য-জ্বালা ইহাতে আরও বর্ধিত হইয়াছিল। অনেক সময় তাঁহাকে অনশনেও দিন কাটাইতে হইত। অনশনক্লিষ্ট মহেন্দ্রনাথের নিকট দুঃস্থ ব্যক্তিগণ নিত্য যাতায়াত করিত, কারণ পরদুঃখকাতর মহেন্দ্রনাথ ঐ দুঃস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া কোন ধনী ব্যক্তির নিকট যাইতেন, এবং তাহার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। ধনী ব্যক্তি মহেন্দ্রনাথের অনুরোধে প্রার্থীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতেন। তেজস্বী মহেন্দ্রনাথ নিজের দুর্দশার কথা জানাইয়া কখনও কোন ধনীর সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি অভুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া কেহ তাঁহাকে জলযোগ করাইতে চাহিলেও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃস্থ অবস্থায় থাকা কালে মহেন্দ্রনাথ তাঁহার সাহায্যার্থে পরিচিত সমাজ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার হস্তে গোপনে পৌঁছাইয়া দিতেন—ইহা তৎকালে অনেকেরই জানা ছিল। মহেন্দ্রনাথ কিছুকাল কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহেন্দ্রনাথকে প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন।

মৃত্যুর দুইমাস পূর্বে কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর সংবাদে মহেন্দ্রনাথ সাতিশয় শোকগ্রস্থ ও অসুস্থ হইয়া শয্যাগ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি হাওড়ার দক্ষিণ ব্যাঁটরা পল্লীতে বামাচরণ কুণ্ডুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। কয়েকদিন জ্বরাতিসার রোগ-ভোগের পর ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৪ঠা অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর, ১৯১২) মহেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

মহেন্দ্রনাথের চরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। তাঁহার বিদ্যাবত্তা অমায়িকতা ও সহৃদয়তার গুণে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মহেন্দ্রনাথকে 'জীবন্ত বিশ্বকোষ' (Living Encyclopaedia) বলিয়া বর্ণনা করিতেন। মহেন্দ্রনাথ বয়ঃকনিষ্ঠগণকে বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য যুবকগণকে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করিতেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ব্যোমকেশ মুস্তাফী প্রভৃতি তাঁহার বহু সাহিত্যশিষ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তদানন্তীন কালে মহেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্য সংসারে 'সাহিত্যাচার্য' রূপে পরিগণিত ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও মহেন্দ্রনাথ

১৩০০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পদিন পরেই (১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে) মহেন্দ্রনাথ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় একান্তভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন। পরিষদের শৈশব অবস্থায় ইহার সদস্য সংগ্রহ, পাঠাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ, পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অথবা পরিষদে পাঠের জন্য প্রবন্ধ সংগ্রহ, অধিবেশনে গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণকে উপস্থিত হইবার আমন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যানুরাগী সমাজে সুপরিচিত মহেন্দ্রনাথ সুযোগ পাইলেই ইঁহাদিগকে পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট করিতেন এবং ইঁহাদিগকে পরিষদের কার্যে নানাভাবে আনুকূল্য করিতে উৎসাহিত করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রূপে শ্রাদ্ধসভায় নিমন্ত্রিত মহেন্দ্রনাথকে

সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণকে পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে দেখা যাইত। পূর্বেই বলা হইয়াছে পরিষৎ প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বৎসরে (১৩০৩) মহেন্দ্রনাথকে এক বৎসরের জন্য মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে পরিষদের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এই সামান্য অর্থ হইতেও তিনি কোন কোন সময়ে পরিষৎ তহবিলে অর্থদান করিতেন। এক বৎসর পর (৬ বৈশাখ, ১৩০৪) পরিষদের অর্থকৃচ্ছ্রতার কারণে মহেন্দ্রনাথ এই পদ ত্যাগ করেন। পরিষদের প্রথম যুগে মহেন্দ্রনাথ পরিষদ কর্তৃপক্ষের কতদূর আস্থাভাজন ছিলেন পুরাতন কার্য-বিবরণী হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিষদের প্রথম বর্ষে বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক নামগুলির বর্ণবিন্যাসের একতা সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন পরিষৎ কর্তৃক তাহা গৃহীত হয় (দ্রঃ— প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)। পরিষদের প্রথম বর্ষের তৃতীয় অধিবেশনে বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নের জন্য পরিষৎ একটি পরিভাষা-সমিতি গঠন করেন। অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি যথাক্রমে এই শাখা-সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও সভ্য নির্বাচিত হন। পরিষদের তৃতীয় বৎসরে মহেন্দ্রনাথ 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন ও তাঁহার উপর কবিকঙ্কন চণ্ডীর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রস্তুতের ভারার্পণ করা হয়। এই বৎসরে পরিষৎ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী সংস্কারের জন্য গঠিত শিক্ষা-সমিতি, ভৌগোলিক পরিভাষা সমিতি, ঐতিহাসিক সমিতি, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান পরিভাষা সমিতি প্রভৃতি যে কয়টি শাখা সমিতি গঠন করেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, আচার্য রামেন্দ্র-

সুন্দর ত্রিবেদী, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গণ্যমান্য ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধিকেও সেগুলির সদস্য নির্বাচিত করা হইয়াছিল।

পরিষদের চতুর্থবর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে যে "বাঙ্গালাভাষা ও ব্যাকরণ" সমিতি গঠিত হয়—ঐতিহাসিক শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরিষদের পঞ্চম বর্ষে রামমোহনের (রায় নহেন) রামায়ণ সম্পাদনায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর মহেন্দ্রনাথের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই বৎসরই পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি মহেন্দ্রনাথকে সম্রাট্ আকবর সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনার ভার অর্পণ করেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্মভারগুলি যথাসম্ভব পালন অবশ্য করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যভগ্ন হওয়ায় কবিকঙ্কন চণ্ডী সম্পাদন ও আকবর সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটী হইতে পরিষদের কার্যালয় কোন প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব আলোচনার উদ্দেশ্যে ৩রা ফাল্গুন পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই উপলক্ষে পরিষদের স্থানান্তরবিরোধী সদস্যগণ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর অবশিষ্ট সভ্যগণ পরিষৎ কার্যালয় অন্যত্র স্থানান্তরের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তৎপরদিন অর্থাৎ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন পরিষৎ কার্যালয় ১৩৭।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের (অধুনা বিধান সরনি) একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অন্যত্র স্থানান্তরের বিরোধী সদস্যগণ কয়েকদিন

পর কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের ১০৬/১ নং গ্রে স্ট্রীটস্থ ভবনে মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কারের সভাপতিত্বে ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে 'সাহিত্যসভা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই সাহিত্যসভা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই তিন ভাষাতেই সাহিত্যচর্চার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এই সাহিত্য-সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ইহার সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন।

মহেন্দ্রনাথ এই সভার মুখপত্র 'সাহিত্য-সংহিতা'র সহকারী সম্পাদকের পদও গ্রহণ করেন। এই মাসিক পত্রটির প্রথম সংখ্যা ১৩০৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া এই মাসিক পত্রটি অতিশয় যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। সমসাময়িক কালের বহু বিশিষ্ট লেখক এই পত্রিকাটির নিয়মিত লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তদানীন্তন কালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা অনেকেই সাহিত্যসভা তথা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে বিনয়কৃষ্ণের আশ্রয় হইতে সাধারণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে ঠাকুর পরিবার এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই অগ্রণী ছিলেন। পরিষদের প্রাচীন-পন্থী সদস্যগণ ইহার বিরোধী ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ শেষোক্ত দলে যোগদান করেন। আদৌ যেরূপ উৎসাহ সহকারে মহেন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন অনুরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে তিনি সাহিত্য-সভারও সেবা করেন। সাহিত্যসভার পুস্তকালয়ে তিনি তাঁহার আবাল্য

সঞ্চিত পুঁথি ও পুস্তকাদি দান করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর অতি উৎসাহের সহিত সাহিত্য সভার সেবা করিলেও মহেন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার যোগ কোন দিনই ছিন্ন করেন নাই। জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত জরাজীর্ণ শরীর মহেন্দ্রনাথ সাহিত্য সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়া সাহিত্য পরিষদের সেবায় শেষ জীবন ব্যয়িত করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করায় তৎকালে সাহিত্য পরিষদের প্রাণ-স্বরূপ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তাফী, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি তাঁহাকে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে পুনরায় পরিষদে সাদরে ফিরাইয়া আনেন। পরিষদে পুনরায় যোগদানের কিছুকাল পরেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে মহেন্দ্রনাথকে পরিষদের বিশেষ সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ইহার পর মহেন্দ্রনাথ মাত্র দুই বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং এই দ্বিতীয় পর্বে দীর্ঘকাল পরিষদের সেবা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৪ঠা অগ্রহায়ণ ষাট বৎসর বয়সে মহেন্দ্রনাথের পরলোক গমনের পর ৭ই পৌষ তাঁহার ও যশস্বী সাংবাদিক সদ্যোমৃত সখারাম গণেশ দেউস্করের পরলোক গমনে শোক প্রকাশের জন্য পরিষদের একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। সভাপতি সহ বিপিনচন্দ্র পাল, নগেন্দ্রনাথ বসু, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, জলধর সেন প্রভৃতি বক্তাগণ সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথের স্মরণীয় দানের কথা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করেন। এই শোকসভায় পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তাফী লিখিত মহেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। ব্যোমকেশ মুস্তাফী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার

প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরু ও পরবর্তী জীবনে সাহিত্য পরিষদের সহকর্মী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

"তাঁহার নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আপন সত্তা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে বহুল পরিমাণে ঋণী। ইহার প্রাথমিক গঠন কালে বিদ্যানিধি একজন প্রধান মিস্ত্রী ছিলেন—অনেক উপাদান তাঁহার যত্নে ইহার দেহ গঠনে তাঁহার হস্তেই সংযোজিত হইয়াছে—ফাটা চটা মেরামতেও তাঁহাকে সে বিষয়ে বিষম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পরিষদ যত কাল বাঁচিবে ততকাল বিদ্যানিধি মহাশয়কে আপনার অন্যতম গঠনকর্তা বলিয়া স্মরণ করিতে বাধ্য এবং পরিষদের বর্তমান হিতৈষীবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত ইহার গঠনকার্যে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে কোন দিনই ভুলিতে পারিবেন না। আর যাঁহারা পরিষদ গঠনে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও আন্তরিক যত্ন দেখেন নাই তাঁহারা এই পরিষদের অপর গঠন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের নামটি স্মরণ রাখিলে বাধিত হইব। পরিষদের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি আছে যাঁহারা পরিষদকে বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী সমাজের—এক কথায় বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্থল ও উন্নতির সোপান বলিয়া মনে করেন এই পরিষদের জন্মেতিহাসের সহিত একাত্ম ভাবে জড়িত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের নাম যদি স্মরণ না রাখেন তবে তাহা কেবল তাঁহাদের অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে।" (আর্যাবর্ত, পৌষ ১৩১৯ পৃ. ৬২৮-৩৩) মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে আহুত এই বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ভার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হয়।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১লা জুন, ১৯১৯) পরিষদের

পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে মহেন্দ্রনাথ ও পরিষদের আর এক প্রতিষ্ঠাতা এল. লিওটার্ডের দুইটি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিষদ্‌মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন এবং তিনিই এই প্রতিকৃতি দুইটির আবরণ উন্মোচন করেন। তৎপূর্বে সভাপতির অনুরোধে "সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীসুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি মহাশয় মহেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ভাষণ দানকরেন—"স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের জীবন চরিত অনেকটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব আত্মজীবন চরিত। পরিষৎ যখন শিশু তখন বিদ্যানিধি মহাশয় কি ভাবে ইহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার কার্যবিবরণী হইতে জানা যায়। পরিষৎ সামান্য অবস্থা হইতে আজ যে এত বড় হইয়াছে, তাহার মূলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কতখানি আত্মদান ছিল তাহা স্মরণে রাখা উচিত। তাঁহাকে নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে পরিষদের দপ্তর বগলে করিয়া কলিকাতার সাধারণের দ্বারে দ্বারে পরিষদের জন্য সাহায্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল—তিনি কোথাও সম্মান এবং কোথাও অপমান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিষদের কল্যাণকামী বিদ্যানিধি সে অপমানকে পুরস্কার জ্ঞান করিতেন। পরিষৎ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার চিত্রখানি প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন।…তিনি চিরদিন বীরের মত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের মহান আদর্শ চিরদিন আমরা স্মরণ রাখিব।" (দ্রঃ পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ)।

(১) জীবন-চরিত লেখক মহেন্দ্রনাথ

জীবন-চরিত লেখক রূপেই মহেন্দ্রনাথ প্রথমে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন।

সংস্কৃত কলেজে পাঠরত থাকা কালে মহেন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার প্রবর্তক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের একটি জীবনী রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার স্ববংশীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনী রচনার জন্য উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র দৈনিক 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত একটি পত্র হইতে জানা যায় যে তিনি রামমোহন সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক-প্রকাশের সংকল্প করিয়াছেন ও এই উদ্দেশ্যে তাঁহার বর্ষীয়ান পিতৃব্য প্রাণধন রায় ও রামমোহনের সমকালীন জীবিত ব্যক্তিদের নিকট সাধারণের অজ্ঞাত বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ রামমোহনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী কোন দিনই রচনা করিয়া প্রকাশ না করিলেও রামমোহন জীবন চরিত গবেষণায় তাঁহাকে পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। ১২৯১ হইতে ১৩১০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তদানীন্তন কালের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র—'প্রবাহ', 'অনুসন্ধান', 'সাহিত্য', 'জন্মভূমি', 'নব্যভারত', 'প্রকৃতি'-ও 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার মোট সতেরোটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে অজ্ঞাত বহু তথ্য মহেন্দ্রনাথের নিবন্ধগুলিতে স্থান পাইয়াছিল—পরবর্তী কালের রামমোহন-গবেষকেরা মহেন্দ্রনাথ প্রচারিত তথ্যগুলি হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ রামমোহনের বংশপরিচয় ও অন্যান্য কিছু পারিবারিক বৃত্তান্ত মহেন্দ্রনাথ সংগৃহীত তথ্যাবলী হইতে তাঁহার জীবন-চরিতকারগণের অধিগত হইয়াছে।

মহেন্দ্রনাথের রামমোহন বিষয়ক নিবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নিরাসক্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রামমোহন চরিত্রটি পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রামমোহন সম্বন্ধীয় বহু অলীক অপবাদ তিনি খণ্ডন করিয়াছেন আবার অন্যদিকে রামমোহন সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে তাঁহার রচনায় মতপ্রকাশ করিয়াছেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ সিটি কলেজ হলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন সম্বন্ধে একটি ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে কবি রামমোহনকে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তক রূপে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেন। এই ভাষণটি ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত হইলে মহেন্দ্রনাথ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 'প্রবাহ' (ফাল্গুন, ১২৯১) পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মহেন্দ্রনাথের বক্তব্য ইহাই ছিল যে মহাত্মা রামমোহন কে একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা বা প্রবর্তক বলিয়া ধরিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়—তাঁহার মতে রামমোহন ছিলেন বিশ্বের সকল ধর্মমতেরই প্রতিভূ। ছাত্রাবস্থা হইতে রামমোহনচর্চায় নিয়োজিত ও রামমোহনের বংশে জন্মগ্রহণে গর্বিত মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং রামমোহন সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক কেন রচনা করেন নাই—তাহার কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

মহেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল যাবৎ "আর্যদর্শন" পত্রিকার (১২৮১-১২৯২) সম্পাদনা ও পরিচালনায় ব্রতী ছিলেন। এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও ঘোষিত সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিভিন্ন সময়ে অবিভক্ত বঙ্গের বিভিন্ন শহরে বাস করিতে থাকায় প্রকৃত পক্ষে মহেন্দ্রনাথকেই পত্রিকাটি সম্পাদন করিতে হইত। সম্ভবতঃ আর্যদর্শন সম্পাদনা সূত্রে তদানীন্তন কালের সুলেখক ও ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি পরিচয় লাভ করেন এবং নগেন্দ্রনাথ রামমোহনের একটি জীবনী লিখিতেছেন জানিতে পারিয়া স্বয়ং রামমোহনের পৃথক জীবনী রচনার সংকল্প পরিত্যাগ করেন। নগেন্দ্রনাথকে রামমোহন-জীবনী রচনায় মহেন্দ্রনাথ যে সাহায্য করেন তাহার প্রমাণস্বরূপ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত' গ্রন্থের "তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন"টি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে (১৮৯৭ খ্রীঃ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ): "তৃতীয় সংস্করণ রচনা কালে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনীলেখক ও রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি মহাশয় রাজার জীবনী সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিষয় আমাকে অবগত করাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ লিখিবার সময়ও বিদ্যানিধি মহাশয় রাজার জীবনী সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঘটনা আমাকে জ্ঞাত করাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১২৮৭ ও ১২৯৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণেও মহেন্দ্রনাথ সংগৃহীত কয়েকটি তথ্য নগেন্দ্রনাথের পুস্তকের পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে। মহেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানের ফলেই রামমোহনের জন্মাব্দ, হস্তাক্ষর, জন্মমাস, জন্ম তারিখ, তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সহমরণ বৃত্তান্ত তাঁহার পূর্বপুরুষগণের 'রায়' উপাধি প্রাপ্তির ইতিহাস, পিতৃপিতামহাদির নাম-ধাম, ১২৩৬ বঙ্গাব্দের ২৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখ যুক্ত ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ভূমির মূল দলিলের প্রতিলিপি প্রভৃতি রামমোহন গবেষকদের নিকট সুলভ হইয়াছে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ রচিত 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন

বৃত্তান্ত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশ কালে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় জীবিত ছিলেন। জীবনী রচনার উপকরণ সংগ্রহ মানসে মহেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের সহিত একাধিকবার সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার নিকট হইতে কিছু লিখিত উপকরণ সংগ্রহ করেন। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়-কুমারের কর্মচারী খামারগাছি নিবাসী রামচন্দ্র রায় ও চাঁদড়া নিবাসী অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ও মহেন্দ্রনাথ আরও কিছু উপকরণ সংগ্রহ করেন। প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত হওয়ায় মহেন্দ্রনাথ রচিত অক্ষয়কুমারের জীবনীটি সাধারণ পাঠকগণ কর্তৃক বিশেষ ভাবে আদৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত রীতিতে যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত গ্রন্থটি ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত মহেন্দ্রনাথ রচিত অক্ষয়কুমারের জীবনী গ্রন্থটি সমসাময়িক কালে লিখিত শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থ রূপে আদৃত ছিল। আধুনিক পদ্ধতিতে জীবন চরিত রচনায় অন্যতম পথিকৃতের গৌরব সম্ভবত মহেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে সকল ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের তালিকার সহিত প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এই পুস্তকটি উচ্চ-প্রশংসিত হয় ("... a publication of great value")। এই প্রতিবেদনটি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীচন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক রচিত হয়। বহু সুধী ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হইলেও আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেকেএই জীবনীটি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মহেন্দ্রনাথের পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিযোগ এই ছিল যে ব্রাহ্মসমাজ গঠনে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব মহেন্দ্রনাথ যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জন, অক্ষয়কুমারকে ব্রাহ্মসমাজের বহু সৎ

প্রচেষ্টার প্রবর্তক বা জনক রূপে চিত্রিত করিতে গিয়া মহেন্দ্রনাথ পরোক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহিমাকে খর্ব করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ রচিত অক্ষয়-জীবনী প্রকাশের দুই বৎসর পর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শ্রীনকুড় চন্দ্র বিশ্বাসরচিত—"অক্ষয় চরিত" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (ইং ১৮৮৭), ইহাতে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃ-বৃন্দ যে মনোভাব পোষণ করিতেন তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস রচিত জীবনীটি সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ রচিত অক্ষয়-জীবনী আজ দুষ্প্রাপ্য ও প্রায় বিস্মৃত।

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত কালের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ 'নব্য-ভারত' পত্রিকায় 'মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত', 'অক্ষয়কুমার দত্ত ও তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা' ও 'অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্মবিষয়ক মত' বিষয়ে চারিটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (৪র্থ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১২শ সংখ্যা ; ৫ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা ; ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, । মহেন্দ্রনাথ রচিত উপরোক্ত প্রবন্ধের প্রথম তিনটি পাঠ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'নব্যভারত' পত্রিকায়, (১২৯৪, চৈত্র, ৫ম খণ্ড) 'জীবনচরিত লেখকদের দৌরাত্ম্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—ইহাতে তিনি মহেন্দ্রনাথের রচনার বহু দোষ উদ্ঘাটন করেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে ব্রাহ্মসমাজ গঠনে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্বকে মহেন্দ্রনাথ অতিরঞ্জিত করিয়াছেন ; এতদূর কৃতিত্বের প্রশংসা অক্ষয়কুমারের প্রাপ্য নহে। তিনি আরও লেখেন যে মহেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে যে ভাবে ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা যথার্থ নহে, তাঁহার মতে অক্ষয়কুমার ছিলেন 'অজ্ঞেয় বাদী'। মহেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে 'অদ্ভুত মত' নামে একটি প্রতিবাদ প্রকাশ করেন (নব্যভারত, ও ৬ষ্ঠ খণ্ড/৩য় সংখ্যা)। এই

প্রবন্ধের উত্তরে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্যঙ্গচ্ছলে লেখেন যে অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে 'অক্ষয় উপাসক সম্প্রদায়' নামে একটি অধ্যায়ও সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অক্ষয় উপাসক। তিনি এই প্রবন্ধের উপসংহারে আরও লেখেন যে মহেন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তির জ্ঞান সঞ্চার করার সাধ্য তাঁহার নাই। এই প্রবন্ধ রচনাকালে বসু মহাশয়ের বয়স ৭৪/৭৫ হইয়াছিল। মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বক্তব্য খণ্ডন করিয়া নব্যভারতে আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (নব্যভারত, ষষ্ঠ খণ্ড ৯ম সংখ্যা)। অক্ষয়কুমার শেষ-জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ এই জন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার করিতে পারেন নাই। মহেন্দ্রনাথের ন্যায় নিরপেক্ষ জীবনী লেখকের রচনা এই জন্যই তাঁহার পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই। রাজনারায়ণ বসুমহাশয়ের সহিত বাদ প্রতিবাদে অবতীর্ণ হইয়া মহেন্দ্রনাথ কুত্রাপি তাঁহার প্রতি কোন অসৌজন্য মূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই, যদিও মহেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বসু মহাশয়ের মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায়। মহেন্দ্রনাথের সংযত মন্তব্যগুলি হইতে বুঝা যায় যে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ভীষ্ম পিতামহসদৃশ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রতিও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়কে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে রাজনারায়ণ বসুর মত সর্বজন মান্য ও প্রভাবশালী মনীষীর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল।

মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার সতীর্থ ও বান্ধবদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে মহেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী রচনায়

জন্যও বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় মহেন্দ্রনাথ লিখিত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় কোন প্রবন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাঁহার সংগৃহীত উপকরণগুলিরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। মহেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে নব্য-ভারত পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা ও ৯ম খণ্ড একাদশ সংখ্যা)। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে এই নিবন্ধ দুইটিতে কেশব-চন্দ্রের মহত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

(২) দেশীয় সংবাদ পত্রের ইতিহাস

দেশীয় সংবাদ পত্রের ইতিহাস রচনায় স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্তি ও খ্যাতি সর্বজন বিদিত। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে তাঁহার 'দেশীয় সংবাদ পত্রের ইতিহাস'—১ম খণ্ড গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়—এই পুস্তকে ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে এই পুস্তকটির একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ "বাংলা সাময়িক পত্র" নামে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে ১৮১৮-১৮৬৭ পর্যন্ত সাময়িক পত্রগুলি আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৬৭ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলো-চনাধারা সম্প্রসারিত। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার গ্রন্থের নিবেদনে এই মত প্রকাশ করেন যে "দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের সাময়িক পত্রের ইতিহাস কেহ সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই।" ব্রজেন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি সর্বাংশে যথার্থ নহে। ব্রজেন্দ্রনাথের বহু পূর্বে এই বিষয়টি অবলম্বন

করিয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গত কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্য' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (মৈমনসিংহ, জুলাই, ১৯১৭)। এই পুস্তকটিতে ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলির বিবরণ আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ কেদারনাথ অথবা মহেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করেন নাই। ১৩০৩ হইতে ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত "জন্মভূমি" মাসিকপত্রে এই বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ ১৬টি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত "সোমপ্রকাশ" ও প্রথম বাংলা প্রাত্যহিক পত্র "পরিদর্শক" সম্বন্ধেও তাঁহার দুইটি নিবন্ধ এই পত্রে প্রকাশিত হয় (১০ম ভাগ/১ম সংখ্যা, ১১ ভাগ/৬ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৮ ও পৌষ ১৩০৯)। 'নব্য-ভারত', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ও 'অনুসন্ধান'এ এই বিষয়ে তাঁহার আরও পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শুধু 'জন্মভূমি' পত্রিকাতেই মহেন্দ্রনাথ প্রথমাবধি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ (বঙ্গাব্দ ১২৬৩) পর্যন্ত মোট ৮৪টি বাংলা সংবাদ পত্রের বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৫, ৫ম বর্ষ/৪র্থ সংখ্যায়) মহেন্দ্রনাথের 'বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকা (কালানুসারী ইতিবৃত্ত)' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় (পৃ. ২৪৫-২৬৯) তাহাতে 'বেঙ্গল গেজেট' হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, 'সমাচর দর্পণ', 'সংবাদ কৌমুদী' প্রভৃতি পত্রের বিস্তৃত আলোচনা স্থান পাইয়াছে। প্রকাশের পূর্বে এই প্রবন্ধটি ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ২৬ শে অগ্রহায়ণ পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। এই সভায় মহেন্দ্রনাথের দ্বারা সংগৃহীত 'সমাচার দর্পণ' এর প্রথম কয়েক বৎসরের 'ফাইল'ও প্রদর্শিত হয়। পরিষদের পক্ষ হইতে 'সমাচার দর্পণ' এর প্রধান প্রধান অংশগুলির একটি 'সঙ্কলন' প্রকাশের প্রস্তাবও গৃহীত হয় ও মহেন্দ্রনাথের উপর ইহা সম্পাদন ও প্রকাশের

ভারাপর্ণ করা হয়। কোন অজ্ঞাত কারণে এই প্রস্তাবটি কার্যকর হয় নাই। ইহার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ব্রজেন্দ্রনাথ 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' (১৩৩৯-৪২) সঙ্কলন করিয়া যশস্বী হন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'সমাচার দর্পণ' এর যে সংখ্যাগুলি রক্ষিত আছে তাহা যে মহেন্দ্রনাথ কর্তৃক আবিষ্কৃত এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ব্রজেন্দ্রনাথের কীর্তি-সৌধের বহু উপকরণ যে বিস্মৃত সাহিত্য-সাধক মহেন্দ্রনাথের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও শ্রমে সংগৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায় মহেন্দ্রনাথের ঋণ স্বীকার করেন নাই। ইহা দুঃখের বিষয়।

(৫) নাট্যশালার ইতিহাস

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস রচনার আবশ্যকতা বা সম্ভাবনা যখন কাহারও মনে উদিত হয় নাই সেই সময়ে মহেন্দ্রনাথ এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাস রচনার ন্যায় বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাস রচনায় প্রথম পদক্ষেপের দুঃসাহস মহেন্দ্রনাথই প্রথম প্রদর্শন করেন।

এই বিষয়ে মহেন্দ্রনাথের প্রথম রচনাটি তাঁহার স্বসম্পাদিত "পুরোহিত" মাসিকের ২য় ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ, ১৩০১)। এই প্রবন্ধের মুখবন্ধে মহেন্দ্রনাথ লেখেন যে "১২৪৭ সালে বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয়ের সূচনা, সেই সময় হইতে বর্তমান পর্যন্ত ৫৪ বৎসর অতীত। আমরা এই অর্ধশতাব্দীর ঊর্ধ্বকালের ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যাহা এপর্যন্ত কেহ লক্ষ্য করেন নাই এবং

ভবিষ্যতে কিছু পরে চেষ্টা করিলেও যে, ইতিহাস সঙ্কলনে কেহ সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ স্থল, সেই বিষয়ে সময় থাকিতে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম। দেখিতে দেখিতে কত বিষয়ই আমাদের অনায়ত্ত হইয়াছে ও হইতেছে। তত্তৎ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টির অসদ্ভাবই ঐরূপ হওয়ার হেতুভূত। ভবিষ্য সাহিত্যেতিহাসবেত্তৃগণের সাহায্যার্থ আমরা বাঙ্গালা থিয়েটারের অতীত ঘটনাবলী যদ্দূর সম্ভব সংগ্রহ করিতে যত্নপর হইলাম। এখনও যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছেন, নাট্যাভিনয়ে যাঁহারা জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত করিয়াছেন, অথবা যে সকল প্রাচীন লোক সে কালের দর্শক ছিলেন, তাঁহাদিগের সহায়তায় ও সমসাময়িক পত্রিকাদি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া আমরা আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছি।

মাননীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরীশ-চন্দ্র ঘোষ (নাট্যকার), অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু (নাট্যকার), মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, হরিদাস দাস (বৈষ্ণব), নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, নীলমাধব চক্রবর্তী, কুঞ্জবিহারী বসু, প্রভৃতি অনেকের নিকট হইতে আমরা সাহায্য পাইয়াছি ও পাইবার আশা রাখি। এই জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

মহেন্দ্রনাথ তাঁহার রঙ্গভূমির ইতিহাসে থিয়েটারগুলির আলোচনা করেন, এই পর্যায়ে বাগবাজারে নবীন বসুর বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় (১২৯২, ইং ১৮৩৫) প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে সুঁড়ো পল্লীতে 'উত্তরচরিত' অভিনয় (১৮৩১) বটতলায় 'জুলিয়স সীজর' অভিনয়, পিয়ারী বসুর বাটীতে 'ওথেলো', 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' অভিনয় (১৮৫৩, ৫৪), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার কর্তৃক 'কুলীন

কুল সর্বস্ব' অভিনয়, ছাতুবাবুর বাটিতে 'শকুন্তলা' অভিনয় (১৮৫৭-১২৬৪ বাং), কালী সিংহের বাটিতে 'বেণীসংহার' ও 'বিক্রমোর্বশী' অভিনয় (১৮৫৭), চুঁচুড়ায় 'কুলীন কুলসর্বস্ব' অভিনয় (১৮৫৭), পাইকপাড়ায় 'রত্নাবলী' অভিনয়, বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা, কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে চিৎপুর রোডের ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে 'বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনয় (১৮৫৯), শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকেল পার্টীর অভিনয় প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে সখের থিয়েটারের যুগ শেষ হয়, এই বৎসরই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সাধারণ রঙ্গালয় বিষয়ক মহেন্দ্রনাথ লিখিত কোন প্রবন্ধের সন্ধান আমরা পাই নাই। মহেন্দ্রনাথের বহুপরবর্তী কালে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (১৭৯৫-১৮৭৬) লিখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথের আরব্ধ কর্মটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে এই পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় এক্ষেত্রেও ব্রজেন্দ্রনাথ পূর্বসূরী মহেন্দ্রনাথের নিকট ঋণ স্বীকার করেন নাই।

(৪) বঙ্গভাষা সংস্কারক মহেন্দ্রনাথ

বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ অতিশয় সচেতন ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষাও বাঙ্গলা ভাষার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে 'অনুসন্ধান' 'নব্যভারত' 'অনুশীলন' ও 'পুরোহিত' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁহার ৩০ টিরও অধিক রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি সুনামধন্য ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দোষ ত্রুটি এবং শৈথিল্য

প্রদর্শন করিয়া সাময়িক পত্রে মহেন্দ্রনাথ অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কবি নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ পুস্তকটি সেকালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। এই পুস্তকটির প্রচলিত সংস্করণ ব্যাকরণগত ও অন্যবিধ বহু ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ ছিল—"অনুসন্ধান" পত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যায় এই ভ্রম-প্রমাদের আলোচনা মূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র অথবা অন্যকেহ মহেন্দ্রনাথের সমালোচনার কোন উত্তর দেন নাই তবে মহেন্দ্রনাথের সমালোচনা যে যথার্থ ছিল তাহার প্রমাণ এই যে নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের" পরবর্তী সংস্করণে এই ভুল ত্রুটিগুলি সংশোধোন করিয়াছিলেন।

(৫) সামাজিক ইতিহাস রচনায়

পুরাণ এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভারত ইতিহাস সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় তিনি প্রাচীন আর্য রমণীগণের কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। এইরূপ কতকগুলি আর্যরমণীর জীবনী সম্বলিত মহেন্দ্রনাথের একটি পুস্তক ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পরও 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় তিনি আরও কয়েকটি জীবনী প্রকাশ করেন, এইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। বামাবোধিনী পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথের লিখিত পৌরাণিক বিষয় সংক্রান্ত বহু রচনা বিনা নামেও প্রকাশিত হইত। মহেন্দ্রনাথ বেদ-পুরাণ মন্থন করিয়া বহু বৈদিক ঋষির পারিবারিক পরিচয় উদ্ধার করিয়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেন। অতঃপর এই ঋষিদের বংশ পরম্পরা অনুসরণ করিয়া বিশেষতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির সামাজিক ইতিহাস

সম্বন্ধে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস (বর্ণ ও পরিবার গত) রচনা করিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন—কিন্তু এই বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তৎকালীন মহেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় তাঁহার রচিত সামাজিক ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ রূপে স্বীকৃত ছিলেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরের ইতিহাস নামক সুদীর্ঘ নিবন্ধের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১২৯৯ বাং)।

বাঙ্গলার ইতিহাস চর্চার শৈশব কালে মহেন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধগুলি হইতে বাঙ্গালী সমাজের উচ্চবর্ণগুলির ইতিহাস বিষয়ে বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ যে ছাত্র পাঠ্য পুস্তকটি রচনা করেন তাহাতে তৎকালীন বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস গুলিতে দৃষ্ট ভ্রম গুলি তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস পুস্তকগুলির ভ্রম সম্বন্ধে তিনি এই গ্রন্থগুলির রচয়িতাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন ; এমন কি স্বর্গত মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে মহেন্দ্রনাথের পত্রাঘাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

(৬) সাময়িক পত্র সম্পাদন

ছাত্রাবস্থাতেই মহেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১২৮১ বঙ্গাব্দে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় "আর্যদর্শন" মাসিক পত্রটি প্রকাশিত হইলে মহেন্দ্রনাথ লেখকরূপে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। অল্প কিছুদিন পর তিনি 'আর্যদর্শনের' সহকারী

সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে ১২৯২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত মহেন্দ্রনাথই ছিলেন এই পত্রের প্রকৃত সম্পাদক কারণ এই সময় (১২৮১-১২৯২ বঙ্গাব্দ) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণকে সরকারী কার্যোপলক্ষে কলিকাতার বাহিরে সুদূর মফঃস্বলে বাস করিতে হইত। 'আর্যদর্শন' পত্রের বহু নামহীন রচনাই যে মহেন্দ্রনাথের লেখনীপ্রসূত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই পত্রিকার প্রকাশ স্থগিত হওয়ার পর মহেন্দ্রনাথ 'অনুসন্ধান' পত্রের সম্পাদনা কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ; যদিও এই পত্রটির ঘোষিত সম্পাদক ছিলেন ইহার স্বত্বাধিকারী স্বর্গত দুর্গাদাস লাহিড়ী। মহেন্দ্রনাথের একটি রচনা হইতে জানা যায় যে তিনি ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্দশ সংখ্যা পর্যন্ত পাক্ষিক 'অনুসন্ধান' পত্রের সম্পাদনা করেন। সাহিত্যসভার মুখপত্র "সাহিত্য -সংহিতা" নামক উৎকৃষ্ট সাহিত্য-পত্রটি সাহিত্যসভার সহকারী সম্পাদক রূপে মহেন্দ্রনাথকেই তত্ত্বাবধান করিতে হইত। কিছুকাল তিনি 'কল্পনা' নামক একটি মাসিক পত্রেরও সম্পাদনা করেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি 'পুরোহিত' নামে একটি মাসিক পত্র প্রবর্তন করেন, উহার কয়েকমাস পর ১৩০১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'অনুশীলন' নামে আরও একটি মাসিক পত্র তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, কিছুদিন পর ১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে এই দুই পত্র একত্র যুক্ত হইয়া 'অনুশীলন ও পুরোহিত' নামে প্রকাশিত হইতে থাকে, ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে।

মহেন্দ্রনাথ "বঙ্গবাসী"র কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক পরিচালিত "জন্মভূমি" নামক মাসিক পত্রের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ৭ম বর্ষের পর (১৩০৫) এই পত্রটি হাটখোলার যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট হস্তান্তরিত হয়। যতীন্দ্রনাথ সাহিত্যসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন

এবং মহেন্দ্রনাথকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস হইতে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত মহেন্দ্রনাথ 'জন্মভূমি'র সম্পাদনার সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিচিত্র প্রতিভাধর, সুপণ্ডিত ও অধ্যবসায়ী মহেন্দ্রনাথ ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁহার আরব্ধ বহু গবেষণা কার্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায় রূপে গড়িয়া উঠে নাই। কোনও ধনীর অর্থ সাহায্য অথবা স্ব-ব্যয়ে পুস্তক প্রকাশ করিতে হইত। তেজস্বী ব্রাহ্মণ মহেন্দ্রনাথ ধনীর অর্থ সাহায্য নিজের জন্য ভিক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, নিজব্যয়ে পুস্তক প্রকাশের সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। এইজন্য তাঁহার বহু রচনা অমুদ্রিত থাকিয়া গিয়াছে। সেকালের সাময়িক পত্র সমূহে প্রকাশিত তাঁহার বহু রচনা সেই পত্র-পত্রিকাগুলির সহিত কালক্রমে অদৃশ্য হইয়াছে। তিনি, কবিতা রচনাতেও অভ্যস্ত ছিলেন, সাময়িক পত্রে বিশেষতঃ 'সাহিত্য সংহিতা'য় তাঁহার অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

যথাসাধ্য চেষ্টায় আমরা মহেন্দ্রনাথের রচনার যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি তাহা যে সম্পূর্ণ ইহা বলা যায় না। তথাপি মহেন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্য-প্রতিভার আংশিক পরিচয় দিতে ইহা সাহায্য করিবে এই ভরসায় এখানে বিবৃত করা হইতেছে:

(ক) গ্রন্থ:

(১) সামুয়েল হ্যানিম্যানের জীবনী—নভেম্বর, ১৮৮১, কলিকাতা, ৮৪ পৃ. মূল্য ।।.

(২) বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত—আগষ্ট ১৮৮৫, (ভাদ্র, ১২৯২) কলিকাতা, ৩২৪ পৃ. মূল্য ৸.

(৩) প্রাচীন আর্য রমণীগণের ইতিবৃত্ত—এপ্রিল ১৮৮৭, কলিকাতা, ১০৮ পৃ. মূল্য ।৶১০

(৪) ব্যাকরণ প্রবেশিকা—২য় সংস্করণ, ১৮৮৮, পৃ. ৬০,
(৩য় সংস্করণ, ১৮৮৯-এ প্রকাশিত হয়, প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল অজ্ঞাত)

(৫) সমগ্রভারত ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর—সেপ্টেম্বর-১৮৯৪, কলিকাতা, ১০৪ পৃ. মূল্য ।।.

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নোত্তর—নভেম্বর-১৮৯৪, কলিকাতা, ৬৪ পৃ. মূল্য ।.

(৭) ভূবিদ্যার প্রশ্নোত্তর—১৮৯৪, কলিকাতা, পৃ. ৬০ সম্পাদিত বা সঙ্কলিত গ্রন্থ।

(৮) সন্দর্ভ সংগ্রহ—কলিকাতা, ১৮৯৭

বংশাবলী [নির্বাচিত সূচী] ১ম খণ্ড (১) ভরদ্বাজ গোত্র (২) শাণ্ডিল্য গোত্র (৩) কাশ্যপ গোত্র (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০) ; **রঙ্গভূমির ইতিহাস** ১ম ও ২য় ভাগ-(১৮৩১-১৮৬৫, ১৮৬৬-১৮৭৪) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪) ; **খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ** (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬), Suttee and Ram Mohun Roy (Reprinted from Hindu Magazine Vol. I. No. 1, Oct. 1891)

সম্পাদিত গ্রন্থ

(১) হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলী (আর্যদর্শন সম্পাদক রচিত)—কলিকাতা, ১২৮৭

(২) রাধিকা মঙ্গল—উদ্ধবানন্দ রচিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৮৯৬ ইং

(৩) সচিত্র রাজস্থান (১ম খণ্ড)—বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩০৫ ভূমিকা—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

[সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ]

(ক) রামমোহন বিষয়ক ঃ

রামমোহন প্রবাহ ফাল্গুন, ১২৯১ (মাঘ ১২৯১ ভারতীতে প্রকাশিত **রবীন্দ্রনাথের** রামমোহন **সম্বন্ধীয়** ভাষণের সমালোচনা।)

রামমোহন রায় **সম্বন্ধে** কয়েকটি অজ্ঞাত বৃত্তান্ত, সাহিত্য ২য় বর্ষ/১১ সং ফাল্গুন, ১২৯৮

রামমোহন রায় বেদ জানিতেন কিনা ? অনুসন্ধান (৫ম বর্ষ) ১৫ই আষাঢ় ১২৯৯

রামমোহন রায় কিরূপ সমাজ সংস্কারক ছিলেন অনুসন্ধান ৫ম বর্ষ **১৫ই শ্রাবণ ১২৯৯**

রাজা রামমোহন রায় জন্মভূমি ৫ম বর্ষ/৮ম **সং** ২রা **শ্রাবণ ১৩০৩**

রাজা রামমোহন রায় (১) নব্যভারত ১৪ খণ্ড/৩য় সংখ্যা আষাঢ় ,,

ঐ	(২)	ঐ ,,	৬ষ্ঠ সং আশ্বিন ,,
ঐ	(৩)	ঐ ১৫ খণ্ড	/১ম সং বৈশাখ ১৩০৪
ঐ	(৪)	ঐ ,,	/৭ম সং কার্তিক ,,
ঐ	(৫)	ঐ ১৭ খণ্ড	/৬ষ্ঠ সং আশ্বিন ১৩০৬
ঐ	(৬)	ঐ ১৮ খণ্ড	/১ম সং বৈশাখ ১৩০৭

রাজা রামমোহন রায় সাহিত্য ১০ম বর্ষ/৭ম সংখ্যা **কার্তিক ১৩০৬**

(খ) বাংলা সাময়িক পত্র বিষয়ক :

সাময়িক সাহিত্য		নব্যভারত	১০ম খণ্ড/১২ সং চৈত্র, ১২৯৯
বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ইতিহাস	(১)	জন্মভূমি	৬ষ্ঠ ভাগ / ৬ষ্ঠ সং জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩
,,	(২)	,,	,, /১০ম সং আশ্বিন, ,,
,,	(৩)	,,	,, /১১ সং কার্তিক, ,,
,,	(৪)	,,	৭ম ভাগ/১ম সং পৌষ, ,,
,,	(৫)	,,	,, ৫ম সং বৈশাখ ১৩০৪
,,	(৬)	,,	,, ৮ম সং শ্রাবণ, ,,
,,	(৭)	,,	,, ৯ম ১০ম, সং ভাদ্র-আশ্বিন, ,,
,,	(৮)	,,	,, ১১ সং কার্তিক, ,,
,,	(৯)	,,	,, ১২ সং অগ্রহায়ণ, ,,
,,	(১০)	,,	৮ম ভাগ /১ম সং, পৌষ ,,
,,	(১১)	,,	৮ম/৩-৪ সং ফাল্গুন-চৈত্র, ,,

বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ইতিহাস (১২) জন্মভূমি ৮মভাগ/ ৮মসং শ্রাবণ, ১৩০৫

,, ,, (১৩) ,, ৮ম/১০ম সং আশ্বিন, ,,

,, ,, (১৫) ,, ৯মভাগ/৩য় সং আশ্বিন ১৩০৭

,, ,, (১৬) ,, ৯ম/৪র্থ সং কার্তিক, ,,

(সংবাদ পত্রের ইতিহাস) সোম প্রকাশ ১০ম ভাগ/১ম সং শ্রাবণ, ১৩০৮

বাঙ্গলা প্রথম প্রাত্যহিক পত্র পরিদর্শক (১৮৬০-৬২) ১১/৬ষ্ঠ সং পৌষ, ১৩০৯

বেঙ্গল গেজেট নব্যভারত ১৮ খণ্ড/৩য় সং আষাঢ়, ১৩০৭

বেঙ্গল গেজেট ও সমাচার দর্পণ নব্যভারত ১৮ খণ্ড/১২শ সং চৈত্র, ,,

বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকা (কাল-ক্রমানুসারী ইতিবৃত্ত) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৫ম বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা ১৩০৫

বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট অনুসন্ধান ১৩ বর্ষ ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৬

গ। **রঙ্গালয় বিষয়ক ঃ**

নাট্যশালার ইতিহাস পুরোহিত ২য় ভাগ/৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩০১

রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত অনুশীলন ১ম ভাগ/১ম সং আশ্বিন, ,,

,, ,, ১ম ভাগ/২য় সং কার্তিক, ,,

রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত অনুশীলন ১ম ভাগ/৫ম সং মাঘ, ১৩০১
,, অনুশীলন ও পুরোহিত
২য় ভাগ/২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২
,, ২য় ভাগ/৬ষ্ঠ সং আশ্বিন, ,,

(ঘ) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ :

বাঙ্গালার বিবরণ অনুসন্ধান ৫ম বর্ষ ২৯শে মাঘ, ১২৯৮
,, ,, ,, ১৫ই চৈত্র, ,,
,, ,, ,, ৩০শে চৈত্র, ,,
,, ,, ,, ১৫ই বৈশাখ, ১২৯৯
,, ,, ,, ৩১শে ,, ,,
,, ,, ,, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ,,
,, ,, ,, ৩১শে আষাঢ়, ,,
ঐতিহাসিক বিশৃঙ্খলা জন্মভূমি ৫ম ভাগ/৪র্থ সং চৈত্র, ১৩০১
আমাদের ভ্রমণ অনুশীলন ও পুরোহিত,
২য় ভাগ /২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২
ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ (১) অনুসন্ধান ৯ম বর্ষ আষাঢ়, ,,
,, ,, (২) ,, ,, শ্রাবণ, ,,
হিন্দু মুসলমানের প্রথম পরিণয় ,, ১২ বর্ষ ৬ই আশ্বিন, ১৩০৫
ভারতীয় ইতিহাসের একাংশ (১) নব্যভারত ১৫ খণ্ড/২য় সং জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪
,, ,, ,, (২) ,, ,, /৩য় সং আষাঢ়, ,,
,, ,, ,, (৩) ,, ,, /৯ম সং পৌষ, ,,

ঐতিহাসিক কথা নব্যভারত ১৬ খণ্ড/ ১১ সং ফাল্গুন, ১৩০৫
একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন অনুসন্ধান ১২ বর্ষ ৮ই অগ্রহায়ণ, ,,
হিন্দু মুসলমানে পরিণয় ,, ১৩ বর্ষ ২১শে ,, ১৩০৬
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ,, ,, ৬ই পৌষ, ,,
আবুল ফজলের পূর্বপুরুষ নব্যভারত ১৭ খণ্ড/২য় সং জ্যৈষ্ঠ, ,,
বাঙ্গলার ইতিহাস ,, ,, /৮ম সং অগ্রহায়ণ,
রাজা টোডর মল সাহিত্য ৮ম বর্ষ / ১০ম সং মাঘ,
রাজা বীরবল ,, ৯ম বর্ষ / ৬ষ্ঠ সং কার্তিক,
আকবর ও জহাঙ্গীরের
হিন্দু পত্নী ,, ৫ম বর্ষ / ১২ সং অগ্রহায়ণ, ১৩০২
মহম্মদ গজনবী জন্মভূমি ৯ম বর্ষ / ৬ষ্ঠ সং পৌষ, ১৩০৫
বঙ্গের ইতিবৃত্ত নব্যভারত ১৯ খণ্ড / ১০ম সং মাঘ, ১৩০৮
বঙ্গের পাল রাজাগণ ,, ,,
সম্রাট জহাঁগীরের স্বলিখিত আত্মজীবন সাহিত্য সংহিতা ৩য় বর্ষ
৫ম-৬ষ্ঠ সং ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০৯

(৬) বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক :

বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান অবস্থা অনুসন্ধান (পাক্ষিক) ৬ষ্ঠ বর্ষ /
৩১শে শ্রাবণ, ১২৯৯
,, ,, ,, ১৫ই ভাদ্র, ,,
,, ,, ,, ১৫ই কার্তিক, ,,
,, ,, ,, ৩০শে ,, ,,

বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান অবস্থা অনুসন্ধান(পাক্ষিক) ১৫ অগ্রহায়ণ,১২৯৯
,, ,, ,, ৩০শে ,, ,,
,, ,, ,, ২৯শে পৌষ, ,,
,, ,, ,, ২৯শে মাঘ, ,,
,, ,, ,, ১৫ই ফাল্গুন, ,,
বাঙ্গালা ভাষা ,, ৮ম বর্ষ ২৮শে বৈশাখ,১৩০১
,, ,, ,, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ,,
,, , ,, ২৮শে অগ্রহায়ণ ,,
বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান অবস্থা (১) অনুসন্ধান (সাপ্তাহিক) ১১শ বর্ষ
২৭শে শ্রাবণ, ১৩০৪
,, (২) ,, ৩রা ভাদ্র, ,,
,, (৩) ,, ১০ই ভাদ্র, ,,
,, (৪) ,, ১৭ই ভাদ্র, ,,
,, (৫) ,, ২৪শে ভাদ্র, ,,
,, (৬) ,, ৩১শে ভাদ্র, ,,
,, (৭) ,, ১৮ই আশ্বিন, ,,
সাহিত্য পরিষদ ও বাঙ্গালা ভাষা ,, ২১শে মাঘ, ,,
বর্তমান বঙ্গভাষা ,, ৯ই ভাদ্র, ১৩০৫ ১২শ বর্ষ
,, ,, ১৬ই ,,
বাঙ্গালা ভাষা ,, ৩০শে ,,
,, ,, ২৪শে কার্তিক ,,
ঐতিহাসিক পরিভাষা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ অনুশীলন ও
পুরোহিত / ২য় ভাগ ৪র্থ সং শ্রাবণ, ১৩০২

বর্ত্তমান বঙ্গভাষা (১) নব্যভারত ১১শ খণ্ড / ৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩০০

,, (২) ,, ঐ ১০ম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩০০

,, (৩) ,, ১২শ খণ্ড / ৩য় সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩০১

কয়েকটি বাংলা শব্দ ,, ১৭শ খণ্ড / ৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩০৬

(চ) বংশ বিবরণ বা সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক
(পৌরাণিক ও আধুনিক)

বংশাবলী

কৌলীন্য প্রথার ইতিহাস (১) কল্পনা ৬ষ্ঠ ভাগ / ১ম সং ১২৯৩
(২) ,, ,, / ২য় সং ,,
(৩) ,, ,, / ৩য় সং ,,
(৪) ,, ,, / ৪র্থ সং ,,
(৫) ,, ,, / ৫ম সং ,,

প্রাচীনবংশবিবরণ(ঋষি বংশ) নব্যভারত ৭ম খণ্ড / ৬ষ্ঠ সং আশ্বিন, ১২৯৬
,, ,, / ১১শ সং ফাল্গুন, ,,
,, ৮ম খণ্ড / ৫ম সং ভাদ্র, ১২৯৭
,, ,, / ৮ম সং অগ্রহায়ণ, ,,
,, ১০ম খণ্ড / ৫ম সং ভাদ্র, ১২৯৯
,, ,, / ৮ম সং চৈত্র, ,,

থানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ	অনুসন্ধান	১০ই আষাঢ়,	১২৯৯
,,	,,	১৫ই শ্রাবণ,	,,
সামাজিক ইতিহাস	পুরোহিত	১ম ভাগ / ৫ম সং চৈত্র,	১৩০০
,,	,,	২য় ভাগ / ১ম সং বৈশাখ	১৩০১
,,	,,	,, / ২য় সং জ্যৈষ্ঠ	,,
,,	,,	,, / ৩য় সং আষাঢ়,	,,
,,	অনুশীলন ও পুরোহিত	,, / ৩য় সং জ্যৈষ্ঠ,	১৩০২
,,	,,	,, / ৫ম সং ভাদ্র,	,,
বংশাবলী	,,	,, / ২য় সং জ্যৈষ্ঠ,	,,
,,	,,	,, / ৩য় সং আষাঢ়,	,,
ভরদ্বাজ গোত্র (বংশাবলী)	,,	,, / ৬ষ্ঠ সং আশ্বিন,	,,
একটি বৈদিক ঋষি (গৃৎসমদ)	জন্মভূমি	১০ম বর্ষ / ৭ম সং মাঘ,	১৩০৮

(ছ) বিবিধ

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম মহোৎসব	নব্যভারত	৭ম খণ্ড, ৮ম সং অগ্রহায়ণ,	১২৯৬
ঐ	,,	৯ম খণ্ড, ১১শ সং ফাল্গুন,	১২৯৮
আমাদের ভ্রমণ	অনুশীলন	১ম ভাগ ৫ম-৭ম সং	১৩০১
একটি হিন্দু রমণী	,,	১ম ভাগ ৩য়-৪র্থ সং	,,
হাবড়া হইতে শ্রীরামপুর	,,	১ম ভাগ ৩য় সং	,,
ভদ্রেশ্বর হইতে ত্রিবেণী	,,	১ম ভাগ ৪র্থ সং	,,
সতীদাহের আমূল ইতিবৃত্ত	প্রকৃতি	২৭শে ভাদ্র,	১২৯৮
,,	,,	৩রা ও ১০ই আশ্বিন,	,,
কে সতীদাহ নিবারণ করেন ?	বামাবোধিনী পত্রিকা	মাঘ	,,

সহমরণ জন্মভূমি ৪র্থ ভাগ ৩য় সংফাল্গুন, ১৩০০

রত্নাবলী কাহার প্রণীত, সাহিত্য-সংহিতা ১মখণ্ড ১০ম সং মাঘ, ১৩০৭

" " ২য় খণ্ড ১ম সং বৈশাখ, ১৩০৮

সাধক শ্রেষ্ঠ মহাকবি তুলসীদাস " ৪র্থ খণ্ড ৭ম সং কার্তিক, ১৩১০

তুলসীদাস " ৪র্থ খণ্ড ১২শ সং চৈত্র, "

দ্রৌপদী " ৪র্থ খণ্ড ৮ম-৯ম সং অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০

প্রাচীন ভারত ও আর্যমত (প্রতিবাদ) সমাচার চন্দ্রিকা ২১শে ভাদ্র ১২৮৪

অদ্বৈত বাদ আর্যদর্শন ৬ষ্ঠ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭

গুরুনানকের জীবন চরিত " " চৈত্র, "

দাদাভাই নারোজী অনুসন্ধান ৫ম ভাগ ৩১শে আষাঢ়, ১২৯৯

অনুক্রমণিকা পুরোহিত ১ম ভাগ ১ম সং অগ্রহায়ণ, ১৩০০

হিন্দুর পর্বাহ " ৫ম ভাগ ৫ম সং চৈত্র, ১৩০০

হিন্দুর খাদ্যাখাদ্যবিচার " ২য় ভাগ ২য় সং জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১

হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম অনুশীলন ও পুরোহিত ২য় ভাগ ৪র্থ সং শ্রাবণ, ১৩০২

স্বায়ত্ত শাসনের সংস্কার আবশ্যকতঅনুসন্ধান ৫ম বর্ষ ১৫ই পৌষ, ১২৯৮

ধর্মশাস্ত্র ও গর্ভাধান নব্যভারত ৯ম খণ্ড ২য় সং জ্যৈষ্ঠ, "

একটি আলেখ্য (বৈদেহী ও দ্রৌপদী) " ১৭ খণ্ড ১০ম সং ফাল্গুন, ১৩০৬

সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি পুরাতন পুঁথি " ১৬শ খণ্ড ৬ষ্ঠ সং আশ্বিন, ১৩০৫

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত " ৪র্থ খণ্ড ৫ম সং ভাদ্র, ১২৯৩

অক্ষয়কুমার দত্ত ও
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা " " ১২ সং চৈত্র, "

অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম বিষয়ক মত নব্যভারত ৫ম খণ্ড ১০মসং মাঘ১২৯৪

" " ৬ষ্ঠ খণ্ড ১০ম সং বৈশাখ১২৯৫

অদ্ভুত মত (চৈত্র,১২৯৪ সংখ্যায় রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ)

নব্যভারত ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩য় সং আষাঢ়, "

ঐ " " ৯ম সং পৌষ, "

সংযম জন্মভূমি ৯ম বর্ষ ১ম সং শ্রাবণ, ১৩০৭

হিত দেবত্বে ও কবিত্বে " " ২য় সং ভাদ্র, "

গোবিন্দ চক্রবর্তী " " ৭ম সং মাঘ, "

" " " ৯ম সং চৈত্র, "

" " " ১০ম সং বৈশাখ, ১৩০৮

সরস্বতী স্রোতস্বতী " " ১২শ সং আষাঢ়, "

মিত্রসভা " ১২ বর্ষ ৫ম সং অগ্রহায়ণ, ১৩১১

জীবে দয়া " ১৩ বর্ষ ৬ষ্ঠ সং পৌষ, "

" " " ৭ম সং মাঘ, "

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার ব্যবহার (১) বামাবোধিনী পত্রিকা ২য় ভাগ

৪র্থ সং ভাদ্র, ১২৯৫

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার ব্যবহার (২) বামাবোধিনী পত্রিকা ২য় ভাগ

৪র্থভাগ ৪র্থ সং বৈশাখ, ১২৯৭

" (৩) " " জ্যৈষ্ঠ, "

বানভট্ট সাহিত্য কল্পদ্রুম ২য় বর্ষ ভাদ্র, ১২৯৮

শ্রীহর্ষ কয়জন(১) " " কার্তিক-অগ্রহায়ণ, "

" (২) " " ফাল্গুন, "

মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২য় বর্ষ

২য় সং ১৩০২

কবি উদ্ধবানন্দ " ৩য় বর্ষ । ৩য় সং ১৩০৩

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গসাহিত্যের পাঠক ও গবেষকগণের নিকট দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বর্তমানে একটি বিস্মৃত বা অর্ধবিস্মৃত নাম। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে তিনি আপনার শক্তি, যত্ন ও নিষ্ঠা দ্বারা বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে সাহিত্যানুরাগীদের স্মৃতির উপর তাঁহার দাবী আছে।

জীবন কথা

দুঃখের বিষয় দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই জানা যায়। এমন কি তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ পর্যন্ত আমাদিগের অজ্ঞাত। 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় (৭ম ভাগ, পৃ. ৩৩৪) একটি উল্লেখ হইতে এইমাত্র জানা গিয়াছে যে তাঁহার পিতার নাম ছিল হারাধন মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে তাঁহাদিগের নিবাস ছিল। ১৮৫৭ হইতে ১৮৯০ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার ঘাঁটিয়া বর্ধমান জেলার বর্ধমান রাজকলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৫ বৎসর ৯ মাস বয়সে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাত্র একজন দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যাইতেছে। ইনি যদি আমাদিগের উদ্দিষ্ট দেবেন্দ্রনাথ হন তাহা হইলে তাঁহার জন্ম ১৮৭১-৭২ (১২৭৮ বঙ্গাব্দ ?) সালে কোনও সময় হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা

যাইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২ আষাঢ় ১৩২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে সেজন্য শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না, ১৩২৪ অথবা ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কোনও সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উল্লিখিত বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ হইতে জানা যায়, দেবেন্দ্রনাথ কাশীতে পরলোক গমন করেন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও তৎপ্রবর্তিত আর্যসমাজ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছিলেন ও স্বভাবতঃ সমকালীন আর্যসমাজমণ্ডলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ ও সশ্রদ্ধ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সূত্রে আমরা তাঁহার জীবন সম্পর্কে কয়েকটি কথা জানিতে পারি। কলিকাতা আর্যসমাজভুক্ত প্রচারক কিছুকাল পূর্বে লোকান্তরিত অশীতিপর দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করেন নাই, কিন্তু লোকপরম্পরা তাঁহার সম্পর্কে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা এই : 'দেবেন্দ্রনাথের কোনও জীবিকা ছিল না। বর্ধমান জেলার গঙ্গাতীরবর্তী কোনও স্থানে তাঁহার বাড়ী ছিল। বৈষয়িক অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া অর্থোপার্জনে তাঁহার মন ছিল না ; ধর্ম ও সাহিত্য চর্চা করিয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরামর্শে ও কলিকাতা আর্যসমাজের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম স্বামী দয়ানন্দের জীবনী চর্চায় প্রবৃত্ত হন।' কলিকাতা আর্যসমাজের এক অতিবৃদ্ধ পরিচারকের মুখ হইতে শুনা গিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজেও দেবেন্দ্রনাথের খুব যাতায়াত ছিল। এই তথ্যটি সত্য হওয়া সম্ভব, কেননা দেবেন্দ্রনাথ রচিত 'সেণ্ট্ পলের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থখানি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। শিব-

নাথের সহিত পরিচয়সূত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

Bengal Academy of Literature বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বৎসর (১৩০০ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে ১৩০২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তাঁহার সদস্য পদত্যাগ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ অতি ঘনিষ্ঠভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং বিশেষ নিষ্ঠাভরে অক্লান্তভাবে ইহার সেবা করিয়াছিলেন। পরিষদের সহিত যুক্ত হইবার পূর্বেই তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত 'মহাত্মা সেণ্ট্ পলের জীবনবৃত্তান্ত', 'বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' এবং 'শান্তিমঠ' নামক একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতার বিভিন্ন সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়া ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জাতিগঠন-মূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়াও তখন তিনি সুপরিচিত।

১৩০২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের পরও দেবেন্দ্রনাথ কিছুকাল কলিকাতায় বাস করেন। কলিকাতায় বিভিন্ন সময়ে তিনি ১/২ সুকিয়াস স্ট্রীট, ২১০/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (বর্তমান বিধান সরণী) ও ৮২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট প্রভৃতি ঠিকানায় বাস করিতেন। ১৩০৪-৫ বঙ্গাব্দে তিনি কলিকাতা হইতে 'উদ্দীপনা' নামক একখানি বাংলা সাময়িক পত্র পরিচালন করিতেন বলিয়া জানা যায়। দুঃখের বিষয় 'উদ্দীপনা'র কোনও সংখ্যা এখন পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মনে হয় 'উদ্দীপনা' দীর্ঘজীবী হয় নাই। দেবেন্দ্র-নাথের জীবনের শেষ ২০।২৫ বৎসর সম্ভবতঃ কাশীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং কাশীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দেবেন্দ্রনাথ রচিত 'স্বামী দয়ানন্দের জন্মস্থানাদিনির্ণয়' গ্রন্থখানি হইতে জানা যায় যে দেবেন্দ্রনাথ

কাশীতে হারার বাগ মহল্লার বি ৭।৩৩ সংখ্যক বাড়ীতে বাস করিতেন। প্রায় ৪৬ বৎসর পূর্বে এই নম্বর বদলাইয়া ৭/১২ হইয়াছে। উক্ত পরাতন জীর্ণ একতলা বাড়ীটি সংস্কৃত ও পুনর্নির্মিত হইয়া বর্তমানে কলিকাতা বৈঠকখানা পল্লী নিবাসী এক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সম্পত্তি। কাশীর দীর্ঘজীবী বাঙ্গালী অধিবাসীদের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, দেবেন্দ্রনাথ অকৃতদার ছিলেন। তিনি একাই উক্ত জীর্ণ ভবনে বাস করিতেন এবং সর্বদা সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন। স্বামী কৃষ্ণানন্দ (বিখ্যাত ধর্মবক্তা পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন) প্রতিষ্ঠিত কাশী যোগাশ্রম, স্থানীয় আর্যসমাজ ও বেদোদ্বোধিনী সভার সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বেকার দেবেন্দ্রনাথের দুগ্ধযোগানিয়া কাশী হাড়ারবাগ মহল্লার অতিবৃদ্ধ কালীচরণ সর্দারের সাক্ষ্য অনুসারে, দেবেন্দ্রনাথ স্থূলোদর, শ্যামবর্ণ ছিলেন এবং কানে কিছু কম শুনিতেন। তিনি সর্বদা লেখাপড়া লইয়াই থাকিতেন, তাঁহার নিকট বহু লোকের যাতায়াত ছিল। তাঁহার সংগৃহীত বিপুল গ্রন্থরাজি তাঁহার মৃত্যুর পর জলের দামে বিক্রয় হইয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথের যে জন্মসন অনুমান করা হইয়াছে (উহার সুনিশ্চিত প্রমাণ নাই) তদনুসারে ৪৭।৪৮ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। ঔপন্যাসিক, জীবনীকার, প্রাবন্ধিক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, সুবক্তা Bengal Academy of Literature ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সংগঠক ও প্রথম দেশীয় সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ এক সময় বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে আপন শ্রম, নিষ্ঠা ও মনীষা বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সহিত তাঁহার সংস্রব হইতে প্রতীয়মান হয় ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে তাঁহার মতামত

প্রগতিশীল ছিল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তিনি বর্তমানে প্রায় বিস্মৃত এবং যথোচিত উপাদানের অভাবে তাঁহার জীবনের একটি অস্পষ্ট রেখাচিত্র মাত্র অঙ্কিত করিয়াই আমাদিগকে ক্ষান্ত থাকিতে হইতেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও দেবেন্দ্রনাথ

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই (৮ শ্রাবণ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ) কলিকাতার শোভাবাজার পল্লীতে অবস্থিত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের ২/২ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটস্থ ভবনে 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' নামক এক সভা স্থাপিত হয়। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ উক্ত সভা পুনর্গঠিত হইয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামে আত্মপ্রকাশ করে, যদিও 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' এর প্রতিষ্ঠাদিবসটিই উত্তর কালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাদিবস রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। 'বেঙ্গল একাডেমী অব্ লিটারেচার' স্থাপিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ৮ই অক্টোবর ১৮৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ইহার অষ্টম অধিবেশনে তৎকালীন তরুণ বঙ্গসাহিত্যসেবক দেবেন্দ্রনাথ সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রস্তাবক্রমে 'একাডেমি'র সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে প্রতি রবিবার ও পরে প্রতি পনের দিন অন্তর এই সভার অধিবেশন হইত এবং সভার কার্যাদি ইংরাজিতে নির্বাহিত হইত। ১৮৯৩ এর আগস্ট মাস হইতে প্রবর্তিত 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারে'র মুখপত্রে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই

প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত, তবে ইহাতে ইংরাজীরই প্রাধান্য ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই সভার কার্যকলাপে ইংরাজীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সদস্যগণের কেহ কেহ আপত্তি করেন। প্রতিষ্ঠানের বিজাতীয় নামটি লইয়াও আপত্তি উত্থাপিত হয়। এই প্রতিবাদের ফলেই 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং ইহার কার্যকলাপের মধ্য হইতে ইংরাজী ভাষাকে বিদূরিত করিয়া বঙ্গভাষা একচ্ছত্র স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইংরাজীর কবল মুক্ত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-কে বিশুদ্ধ স্বাদেশিক রূপ দিবার নিমিত্ত যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে তরুণ সদস্য দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম।

'একাডেমি'র সদস্য হওয়ার পর হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ইহার অধিবেশনগুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। ১২ নভেম্বর ১৮৯৩ তারিখের অধিবেশনে তিনি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' রচয়িতা কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলীর একটি সমালোচনা পাঠ করেন এবং উহা একাডেমির মুখপত্রে প্রকাশিত হয় (Vol. No. 5, December 1893, pp. 3-6)। ২৬ নভেম্বর ১৮৯৩ তারিখের অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ রচিত 'নব্যবঙ্গ' শীর্ষক নবপ্রকাশিত উপন্যাসের এক সমালোচনা ইংরাজী ভাষায় তৎকালীন সহ-সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক পঠিত হয়। হীরেন্দ্রনাথ উপন্যাসটির বর্ণনকৌশল, গল্পাংশের পারিপাট্য ও ব্যঙ্গনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। সমালোচনাটি 'একাডেমি'র মুখপত্রে প্রকাশিত হয় (Vol. I, No. 6, January 1894, pp. 9-10) ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র লিখিত 'অপচয় ও উন্নতি' গ্রন্থের একটি সমালোচনা পাঠ করেন; উহাও একাডেমি পত্রিকায়

প্রকাশিত হয় (Vol. I, No. 8, March 1894, pp. 3-5) । এই সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথের লেখনী প্রসূত 'নব্যভারত' (অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩০০) এবং 'সাহিত্য' (অগ্রহায়ণ ১৩০০) পত্রিকাদ্বয়ের সমালোচনাও স্থান পায় এই সকল তথ্য হইতেই প্রমাণিত হয়, প্রথম হইতেই গভীর উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত দেবেন্দ্রনাথ এই সাহিত্যসংস্থার সহিত নিজেকে জড়িত করিয়াছিলেন।

'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর্' নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনার কয়েক মাসের মধ্যেই ইহার নাম ও কার্য কলাপে ইংরাজী ভাষার আধিপত্য বিষয়ে সদস্যগণের অসন্তোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। এবিষয়ে যে দুইজন সদস্য সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করেন ত'াহারা ছিলেন মনস্বী রাজনারায়ণ বসু ও উমেশচন্দ্র বটব্যাল। ই'হাদের দুইজনই ছিলেন মফঃস্বল বাসী, একাডেমির অধিবেশনগুলিতে তাহারা উপস্থিত হইতে পারিতেন না। তরুণ দেবেন্দ্রনাথ প্রতিটি সভায় উপস্থিত থাকিয়া একাডেমির দেশীয় নাম গ্রহণ ও বাংলা ভাষার প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সংগ্রাম চালাইতেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ এর অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ এবিষয়ে একটি ভাষণ দান করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ইহা সুখের বিষয়, সভা ইতিমধ্যেই বৈদেশিক হইতে দেশীয় শব্দে শব্দিত হইয়াছে অতঃপর তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার্থ সমিতিতে ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন, ইংরাজী ভাষায় কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করণ ইত্যাদি বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে ইহাতে একাডেমির বিরুদ্ধে একটা সর্বজনীন আপত্তি উঠিয়াছে, এবং এই আপত্তিকারীগণের মধ্যে আছেন শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু, 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি। তিনি আরও বলেন যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা ও উন্নতি সমিতির

মূললক্ষ্য হওয়া উচিত, ইংরাজী সাহিত্যের এবং অপরাপর সাহিত্যের আলোচনা যদি একাডেমি বা পরিষদে করিতেই হয় তবে তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির স্বার্থেই করিতে হইবে। যদি কেহ বলেন যে বাঙ্গলায় লেখা অভ্যাস নাই তবে তাঁহাকে বাঙ্গলায় লেখা অভ্যাস করিতে হইবে। তিনি বলেন যে বাঙ্গালীর ইংরাজী জ্ঞানের গর্ব সত্ত্বেও অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইংরাজী রচনা অতি দুর্বল। একাডেমির মুখপত্রে যে ইংরাজী রচনা প্রকাশিত হয় তাহা আদৌ গৌরবজনক নয়, অশুদ্ধ ও শোভাহীন। বিশুদ্ধ ও মার্জিত ইংরাজীতে শুধুমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা ও উন্নতির জন্য লিখিত প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য কোন প্রবন্ধ সভার মুখপত্রে প্রকাশ করা হইবে না এই নিয়ম গৃহীত হওয়া উচিত।

এই ভাষণে দেবেন্দ্রনাথ আরও প্রস্তাব করেন যে, সাহিত্য-সমাজে নেতৃস্থানীয় এইরূপ এক ব্যক্তি সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং অন্য এক ব্যক্তিকে সহকারী সভাপতি করা হউক আর পরিষদের কার্যনির্বাহার্থ অনধিক দশ কিংবা অন্যূন আটজন লইয়া একটি কার্যনির্বাহক-সমিতি গঠিত হউক। পরিষদের যাবতীয় কার্য এবং নিয়মাবলী কার্য-নির্বাহক সমিতির তত্ত্বাবধানে নির্বাহিত ও গঠিত হউক এবং প্রতিমাসে একবার তাহার অধিবেশন হউক। এই ভাষণের অন্তিম অংশে দেবেন্দ্র-নাথ বলেন, "জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে যখন জাতির উন্নতির অতি নিকট ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন জাতীয় সাহিত্যের আলোচনার্থ এই সাহিত্য পরিষদের প্রতি আপনাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই পরিষদের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধ করাকে জীবনের একটি প্রিয় ও পবিত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যে স্থলে শ্রদ্ধার উদয় হয়—পবিত্রতার উদ্দীপনা হয়--সে স্থলে গাম্ভীর্য আপনা আপনি আসিয়া পড়ে।

এতএব শ্রদ্ধান্বিত পবিত্র ও গম্ভীর চিত্তে এই সাহিত্য পরিষদের লক্ষ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হওয়াই আমাদের পক্ষে কর্তব্য হইতেছে।" দেবেন্দ্রনাথের এই ভাষণটির পর সভা স্থির করেন যে এই প্রস্তাবগুলি সদস্যগণ কর্তৃক ধীর ভাবে বিচার-বিশ্লেষণের পর পরবর্তী কোন সভায় প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করার চেষ্টা হইবে (B. A. L, April 1894)। দেবেন্দ্রনাথের এই ভাষণটি পঠিত ও মুদ্রিত হওয়ার পরই একাডেমি তথা পরিষদ সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া ভবিষ্যৎ নিয়মাবলীর একটি খসড়া সভার সদস্য ও বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের মতামত আহ্বান করেন। এই খসড়াটির সহিত দেবেন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাব বা ভাষণটির সুসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথের ভাষণের ভিত্তিতেই 'খসড়া'টি রচিত হইয়াছিল।

অতঃপর ২৯শে এপ্রিল, ১৭ই বৈশাখ ১৩০১ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সেই বর্ষের জন্য রমেশচন্দ্র দত্ত ও নবীন চন্দ্র সেন যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি ও সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হন। মিঃ লিওটার্ড ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদক এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শরচ্চন্দ্র দাশ যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সভায় পরিবর্তিত নিয়মাবলী আলোচিত হয় নাই। পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৩০১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় (১৭ই জুন, ১৮৯৪) পরিষদের সংশোধিত নিয়মাবলী গৃহীত হয় ও পূর্ববর্তী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সংশোধিত করিয়া নিম্নলিখিত রূপে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতিকে পুনর্গঠিত করা হয়ঃ সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত; সহকারী সভাপতি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সম্পাদক—এল্‌ লিওটার্ড ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পত্রিকা সম্পাদক—

রজনীকান্ত গুপ্ত গ্রন্থরক্ষক—চন্দ্রকান্ত তালুকদার, ধনরক্ষক—এল্. লিও টার্ড। মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ও অপর তিনজন কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। এই সভায় দেবেন্দ্রনাথকে পরিষৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকও নিযুক্ত করা হয়। অন্যতম সম্পাদক লুই লিও-টার্ড বাংলা ভাষা জানিতেন না। সভার সকল প্রকার কাজকর্ম বঙ্গভাষায় নির্বাহিত হইতে থাকায় নবগঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্বভার দেশীয় সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথকেই বহন করিতে হইত। ২৯শে জুলাই ১৮৯৪ পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা পরিভাষা রচনার জন্য একটি "পরিভাষা-সমিতি" গঠিত হয়। অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও পরিষৎ সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ যথাক্রমে এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সমিতির মোট ৮ জন সদস্যের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পরিচালনায় অল্পকাল মধ্যেই পরিভাষা সংকলনের কাজ আরম্ভ হয় এবং এই বৎসরের মধ্যেই কার্তিক সংখ্যা হইতে পরিষৎ পত্রিকায় সংকলিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রকাশিত হইতে থাকে। অন্যতম সম্পাদক লুই লিওটার্ড পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশনে (১৯শে কার্তিক) পদত্যাগ করেন। পরবর্তী অধিবেশনে (৯ই ডিসেম্বর, ২৪শে অগ্রহায়ণ) দেবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবক্রমে ও সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের সমর্থনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মিঃ লিওটার্ডের স্থলে পরিষদের অন্যতর সম্পাদক নিযুক্ত হন। বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচরের ২৯ জন সভ্য লইয়া পুনর্গঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বৎসরটি সমস্যাসংকুল ও ঘটনাবহুল ছিল। দেবেন্দ্রনাথ নানা পরিবর্তন ও বাধাবিপত্তির মধ্যে সভাপতি রমেশচন্দ্রের

সহযোগিতায় পরিষদকে এই বৎসরটি নির্বিঘ্নে পার হইতে সাহায্য করেন। বর্ষশেষে পরিষদের সভ্যসংখ্যা ২০১ জন হয়। পরিষদের প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে—'দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সর্বাংগীণ উন্নতি সাধনে যারপরনাই পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে পরিষদের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, এই জন্য পরিষদ তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন' (প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণ—পৃ. ৭)।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি ১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে—ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটিতে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি?' শীর্ষক একটি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ প্রকাশিত হয় (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩০১, পৃ. ৩৬-৪৭)।

এইভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সূচনাকাল হইতে দেড় বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথ পরিষদের সম্পাদক রূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মিঃ লিওটার্ডের পদত্যাগের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত রামেন্দ্রসুন্দর মুখ্যতঃ পত্রিকাধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুপ্তকে সাহায্য করিতেন। প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণে অন্যতর সম্পাদক রূপে রামেন্দ্রসুন্দরের নামের উল্লেখও নাই। পরিষদের দ্বিতীয় বর্ষে দেবেন্দ্রনাথ পরিষদের একমাত্র সম্পাদক নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বর্ষে ছয় মাস কাল একক ভাবে সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৪শে আশ্বিন দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের সদস্য ও সম্পাদক পদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট পরিভাষা-সমিতি ও গ্রন্থ-সমিতির সম্পাদক পদ ত্যাগ করিয়া সভাপতির নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। কার্যনির্বাহক-সমিতির ষষ্ঠ-অধিবেশনে (১০ই কার্তিক, ২৬শে অক্টোবর)

এই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। এই অধিবেশনেই সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁহার স্থানে পরিষদের সম্পাদক নিযুক্ত হন। সাহিত্য পরিষদের সূচনা কাল হইতে সম্পাদকের গুরুদায়িত্বভার উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া কি কারণে সহসা দেবেন্দ্রনাথ এমন কি ইহার সদস্যপদ পর্যন্ত ত্যাগ করিলেন তাহা অজ্ঞাত থাকিয়া গিয়াছে। ১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের নামটি পরিষদের কাগজপত্রে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর পরে পরিষদের চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে (২রা আষাঢ় ১৩২৫, ১৬ই জুন ১৯১৮) দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার নামটি শেষ বারের মত পরিষদে উচ্চারিত বা উল্লিখিত হয়। ডাঃ চুনীলাল বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পরিষদ সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন—"আজ আমি অতীব দুঃখের সহিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি। পরিষদের যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন ইনি পরিষদের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তাফী মহাশয় যেরূপ একাগ্রতার সহিত পরিষদের সেবা করিতেন পরিষদের প্রথম সৃষ্টি হইবার পর প্রথম সম্পাদক রূপে ইনিও সেইরূপ পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহার চেষ্টা এবং উদ্যোগে তখন পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। অনেকদিন যাবৎ রোগ ভোগ করিয়া কাশীতে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত" (পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্যবিবরণী হইতে)।

বঙ্গ সাহিত্য ও দেবেন্দ্রনাথ

বঙ্গ সরস্বতীর সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ দেবেন্দ্রনাথের নাম ও কীর্তি বাঙ্গালী বিস্মৃত হইলেও তাহা মুছিয়া যায় নাই। ভারতের একটি বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের নামটি সুপরিচিত। দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের একটি বিরাট কীর্তি তৎকর্তৃক ভারতের অন্যতম ধর্ম প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দের জীবনী প্রণয়ন। আর্যসমাজ ভারতের একটি মুখ্য ধর্ম সম্প্রদায় হইলেও ইহার প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দের কোন জীবনীগ্রন্থ দেবেন্দ্রনাথের পূর্বে কেহ রচনা করেন নাই। পাঞ্জাব, গুজরাট, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে দীর্ঘকাল ভ্রমণ ও অনুসন্ধান চালাইয়া স্বামী দয়ানন্দের জীবন সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বহু প্রাথমিক ও প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করেন ও তাহার ভিত্তিতে সর্বপ্রথম স্বামী দয়ানন্দের জীবন চরিত রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি তদানীন্তন কালের ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়। স্বনামধন্য মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বৈশাখ / ১৮১৮ শক (১৮৯৬) সংখ্যায় এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন "গ্রন্থকর্তার রচনা শক্তি অল্প নয়—তিনি সুপাঠ্য সরল এবং স্থানে স্থানে হৃদয়ের আবেগ মিশ্রিত ভাষায় দয়ানন্দ স্বামীর অটল ঋজুকায় এবং অপ্রতিহত অধ্যবসায় মধ্যে আমাদের মনশ্চক্ষে আনয়ন করিলেন। ...এরূপ মহচ্চরিত্র পঠনের পুণ্যফলের জন্য গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রহিলাম, যেরূপ উপাদেয় সামগ্রী তাহাকে অল্পে আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না।"

দেবেন্দ্রনাথ রচিত দয়ানন্দ চরিতের দ্বিতীয় খণ্ডটি যথাকালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণে দুটি খণ্ডই একত্রে প্রকাশিত হয়। একত্র দুইখণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ২৯৮ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বৈদিক পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতি সম্প্রতি কলিকাতা আর্যসমাজ হইতে এই অমূল্য গ্রন্থের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৮৪)। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে দেবেন্দ্রনাথের কাশীবাস কালে তাঁহার রচিত 'স্বামী দয়ানন্দ স্বামীর জন্মস্থানাদি নির্ণয়' গ্রন্থটি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে এলাহাবাদের লীডার পত্র লেখেন যে দেবেন্দ্রনাথ স্বামী দয়ানন্দ সম্পর্কিত গবেষণায় কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপৃত ছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ এক সময়ে নিজের একটি জীবনী হিন্দী ভাষায় রচনা করেন ইহাতে তাঁহার পূর্বাশ্রমের কথা অবশ্য অনুক্ত ছিল। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে দেবেন্দ্রনাথ কৃত এই রচনার বঙ্গানুবাদটিও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্র-নাথ রচিত 'হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ' নামে আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ 'বান্ধব' পত্রিকা এইরূপ মন্তব্য করেন "বঙ্গীয় কৃতবিদ্যদের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট দেবেন্দ্রনাথের নূতন পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার দয়ানন্দ চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি বর্ধন করিয়াছে। তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তকও লোকের উপকারে আসিবে। তিনি সুলেখকদের মধ্যে সর্বাংশে আসন পাইবার যোগ্য" (পৃ. ৯৫-৬ বান্ধব, চৈত্র ১০৮)। দেবেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থটি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দী-ভাষী অঞ্চলে দয়ানন্দের অনুরাগী ও মতাবলম্বীর সংখ্যাধিক্য থাকিলেও হিন্দী ভাষায় তাঁহার

কোন সুলিখিত জীবনী ছিল না। এই অভাব দূরীকরণার্থে দেবেন্দ্রনাথ রচিত দয়ানন্দ চরিতের দুইখণ্ড বাবু ঘাসীরাম কর্তৃক ১৯১৩ বঙ্গাব্দে হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়া মীরাট হইতে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ গ্রন্থটি একাধিক বার পুনর্মুদ্রিতও হইয়াছিল। এই হিন্দী সংস্করণে অনুবাদকের 'নিবেদন' হইতে জানিতে পারা যায় যে দেবেন্দ্রনাথ ২খণ্ড দয়ানন্দ চরিত, আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ এবং দয়ানন্দ স্বামীর জন্ম স্থানাদি নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের পরও বহু উপাদান দয়ানন্দ জীবন সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া সংগ্রহ করেন। এবং এই উপাদানগুলির সাহায্যে দয়ানন্দের একটি সুবৃহৎ জীবনী দুই বৎসরের মধ্যে লিখিয়া দু'তিন বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশ করা দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল। সম্ভবতঃ দীর্ঘকালীন রোগ ভোগ এবং অকাল মৃত্যুর জন্য দেবেন্দ্রনাথের এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার সংগৃহীত এই উপকরণগুলি বারানসীস্থ আর্যসমাজের হস্তগত হয়, তাঁহারা ইহার সদ্ব্যবহার করেন। সর্দার হরবিলাস সর্দা রচিত দয়ানন্দ স্বামীর সুবৃহৎ ইংরাজী জীবনী গ্রন্থে দয়ানন্দ-জীবনী গবেষণায় দেবেন্দ্রনাথের ঋণ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ আহৃত অপ্রকাশিত উপাদানগুলি ব্যবহারেরও স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ রচনাপঞ্জী

পুস্তক-পুস্তিকা

(১) বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তি যুক্ততা (৬৬ পৃ.)
এপ্রিল, ১৮৮৬, কলিকাতা

(২) মহাত্মা সেণ্ট পলের জীবন বৃত্তান্ত, ১৮৮৭, কলিকাতা

(৩) শান্তি মঠ (উ) অক্টোবর, ১৮৮৭, কলিকাতা

(৪) সন্দর্ভমালা (পাঠ্য পুস্তক) এপ্রিল, ১৮৮৯, কলিকাতা

(৫) নব্যবঙ্গ (উ) ১৮৯৩, কলিকাতা

(৬) শিক্ষা সুহৃদ (পাঠ্য পুস্তক) ১৮৯৫, কলিকাতা

(৭) সাধনা ও মুক্তি ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮, কলিকাতা

হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ (দ্বিতীয় সং) ১৯০২, কলিকাতা

হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা অক্টোবর, ১৮৯২, কলিকাতা

জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা ও উন্নতি এপ্রিল, ১৮৯৫, কলিকাতা

হিন্দুর জাতীয় পতন ফেব্রুয়ারী ১৮৯২, কলিকাতা

স্বামীদয়ানন্দ স্বামীর জন্মস্থান নির্ণয় ১৩২৩, কলিকাতা

দয়ানন্দের স্বরচিত জীবন বৃত্তান্ত ১৩১৫, কলিকাতা

দয়ানন্দ চরিত ১ম খণ্ড (১৩০২) ১৮৯৬, কলিকাতা

দয়ানন্দ চরিত ১ম ও ২য় খণ্ড(একত্রে) দ্বিতীয় সং ১৯২৯, কলিকাতা

'দয়ানন্দ চরিত' তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা আর্য সমাজ হইতে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগ্রামস্থল প্রবন্ধ

আলোচনা ২য় খণ্ড (১৩০৫) পৃ. ৩০৫-১০

আমিষ ভক্ষণ ,, ,, পৃ. ৩২৯-৩৩

সেণ্ট পলের নবজীবন লাভ ,, ,, পৃ. ৪১৮-২৪

আচার্য বিরজানন্দ বান্ধব ৩য় খণ্ড (১৩১১) আশ্বিন, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা

হিন্দু সমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা (১) নব্যভারত ৪র্থ ভাগ/ ৩য় সংখ্যা আষাঢ় ১২৯৩ পৃ. ১১৫-২০

" (২) নব্যভারত ৪র্থ ভাগ/ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১২৯৩ পৃ. ২০১-৭

" (৩) নব্যভারত ৫ম ভাগ/ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১২৯৪ পৃ. ২৯-৩৩

" (৪) নব্যভারত ৫ম ভাগ/ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ ১২৯৪ পৃ. ১৬৪-৬৯

" (৫) নব্যভারত ৫ম ভাগ/ ৭ম সংখ্যা কার্তিক ১২৯৪ পৃ. ৩৬ -৭৩

" (৬) নব্যভারত ৫ম ভাগ/ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১২৯৪ পৃ. ৪২২-২৬

" (৭) নব্যভারত ৫ম ভাগ/ ৯ম সংখ্যা পৌষ ১২৯৪ পৃ. ৫২৫-৩০

" (৮) নব্যভারত ৬ষ্ঠ ভাগ/ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১২৯৫ পৃ. ৩২-৫

" (৯) নব্যভারত ৬ষ্ঠ ভাগ/ ৩য় সংখ্যা আষাঢ় ১২৯৫ পৃ. ১৩২-৩৫

মহিমা ধর্ম নব্যভারত ৫ম ভাগ/ ৯ম সংখ্যা পৌষ ১২৯৪ পৃ. ৪৮০-৮৩

" নব্যভারত ৫ম ভাগ/ ১১ সংখ্যা ফাল্গুন, ১২৯৪ পৃ. ৫৫৬-৬১

বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১২ শক
পৃ. ৯১-

জাতীয় সাহিত্যে আবশ্যকতা কি ? সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম বর্ষ
১ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩০২

দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কলিকাতা হইতে 'উদ্দীপনা' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, প্রায় দেড় বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রটি সম্পাদন করেন।

পরিশিষ্ট (ক)

উল্লেখ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩ই চৈত্র ১৩০০ (২৫শে মার্চ ১৮৯৫) তারিখে অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশ অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির নিকট লিখিত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিম্ন লিখিত পত্রখানি পঠিত হয় ঃ

"বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" সভাপতি
মহাশয় সমীপেষু ঃ—

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।

"বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার" অর্থাৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রায় স্থাপনাবধিই আমি ইহার সহিত সংশ্লীষ্ট হইয়াছি। ইহার অঙ্গীভূত বলিয়া আমি যেমন একাডেমি বা পরিষদের মঙ্গল কামনা করি, জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির নামেও আমি সেইরূপ ইহার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। অধিকন্তু জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও আলোচনার্থ এইরূপ একটি সমিতি বা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, —ইহা আমার একটা বহুকাল

পোষিত বাসনা। আজ এই কারণ-ত্রয়ের পরতন্ত্র হইয়াই ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

প্রথমত:—"বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর্" রূপ একটা বৈদেশিক আখ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনার্থ কোন সমিতি আখ্যাত হওয়া কোন অংশেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। সুখের বিষয় যে সমিতি ইতিমধ্যেই বৈদেশিক শাব্দ্য বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া দেশীয় শব্দে শব্দিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আখ্যাটা কিছু দীর্ঘ, এই কারণ আমি জিজ্ঞাসা করি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিবর্তে কেবল সাহিত্য পরিষদ বলিলে কি কিছু হানি হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার্থ সমিতিতে ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন, ইংরাজিতে সমিতির কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করণ, বিশেষতঃ বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকাদির ইংরাজিতে সমালোচনা একটা অসঙ্গত ও অযুক্তিযুক্ত প্রথা। হিন্দুর মন্দিরে মৌলবির পৌরোহিত্য যেরূপ দেখায়, বাঙ্গালার আলোচনার্থ সভামধ্যে ইংরাজীর আবৃত্তি, উচ্চারণ ঠিক সেইরূপ দেখায়। এই অসঙ্গত প্রথার প্রবর্তনার নিমিত্ত একাডেমির প্রতিকূলে একটা সার্বজনিক আপত্তি উঠিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে বরণীয় আসন প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিরই নিকট আমি একাডেমি সংক্রান্ত কথার উত্থাপন করিয়াছি, সেই ব্যক্তিই এই প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ও বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই বিষয়ে আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, সেই সকল পত্র এই প্রথার তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ। যাঁহারা আমাদের সাহিত্যের নেতৃ-স্বরূপ, যাঁহারা সকল প্রকার বাধা ও অন্তরায়কে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার মঙ্গলের নিমিত্ত দেহের শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিয়াছেন

ও করিতেছেন, তাঁহাদিগের আপত্তি উপেক্ষার সামগ্রী নহে। আর যদি আমরা তাঁহাদিগের আপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া দূরাবস্থিত বস্তুর ন্যায় তাঁহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আমরা আমাদিগের গর্বিত বুদ্ধি অনুসারেই পরিচালিত হই, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করি, আমরা কোন দিনই আমাদের উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হইব না। এই কারণে আমি প্রস্তাব করি, সমিতিতে কথোপকথন—সমিতির কার্যবিবরণ এবং প্রাপ্ত পুস্তকাদির সমালোচনা বাঙ্গালাতেই সম্পন্ন হউক। তবে বিদেশীয় সভ্যাদিগের অবগতির জন্য ইংরাজিতে কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিলে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

তৃতীয়ত ঃ—বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা ও উন্নতিই সমিতির মূল লক্ষ্য হইবে। ইংরাজি সাহিত্যের আলোচনা কেহ করিবেন না, এরূপ কথা আমি কাহাকেও কোনদিন বলি নাই—বলা উচিত মনে করি না। পক্ষান্তরে ইহাই বলিয়া থাকি, ইংরাজী সাহিত্যের—কেবল ইংরাজী সাহিত্যের কেন অপরাপর সাহিত্যের আলোচনা ব্যতিরেকে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি একরূপ অসম্ভব। আমরা ইংরাজীর জন্য ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা করিব না—বাঙ্গলার জন্যই ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা করিব। ইংরাজী সাহিত্যে যাহা সার আছে, ফরাসি সাহিত্যে যাহা সার আছে, গ্রীক সাহিত্যে যাহা সার আছে, এবং অপরাপর সাহিত্যে যাহা সার আছে, তৎসমস্ত সাবধান পূর্বক সংগৃহীত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে ঢালিয়া দিব। এইরূপ করিলেই বাঙ্গালার শক্তি সম্পদ সঞ্চারিত হইবে—আমাদের সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হইবে। আমার এই কথার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, আমার বাঙ্গালায় লেখা অভ্যাস নাই, আমি ইংরাজীতে

না লিখিয়া পারি না। অভ্যাস না থাকে, অভ্যাস অবলম্বন করুন। তিনি যদি অভ্যাস বলেই ইংরাজী রচনায় সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অভ্যাস বলেই বাঙ্গালা রচনাতেও সমর্থ হইবেন। বৈদেশিকত্ব আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় এরূপ প্রবেশ করিয়াছে যে, এরূপ কথা বলিতে আমরা লজ্জাবোধ করি না। বিশেষতঃ আমাদিগের মধ্যে যিনি জাতিত্ব সম্পর্কে একজন ভিন্ন ব্যক্তি, তিনি অর্থাৎ উদ্যমশীল লিওটার্ড সাহেব যখন ইংরাজ হইয়াও একমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের কল্যাণের জন্যই বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেছেন, তখন তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করা কি আমাদের পক্ষে কর্তব্য নয়? আর ইংরাজী রচনারই বা সেরূপ শোভা কই,—সমৃদ্ধি কই? ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বলিয়া বিখ্যাত, এইরূপ এক ব্যক্তি সেদিন আমাকে বলিয়াছেন—"তোমাদের একাডেমির কাগজে যে ইংরাজী বাহির হয়—তাহাতে তোমাদের Credit নষ্ট হইতেছে।"

এ কথাটাকে কি আপনারা বিশেষ আলোচনা সাপেক্ষ বলিয়া মনে করিবেন না? এই কারণ আমি অনুরোধ করি যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি—বিশুদ্ধ ও মার্জিত ভাষায় ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা করেন, এবং সেই প্রবন্ধ যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা ও উন্নতির উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়,—এক কথায় যদি তাহা সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুমোদক হয়, তাহা হইলেই আপনারা তাহা গ্রহণ করিয়া পত্রিকাস্থ করুন। নচেৎ ইংরাজী রচনার সহিত পরিষদের কোনরূপ সম্পর্ক না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থতঃ—এবম্বিধ ইংরাজী রচনা পরিষদের নিকট উপস্থিত হইলে তাহার গ্রহণ ও আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার আলোচনাদি

বাঙ্গালার সহিত মিশ্রিত না হয়, এই কারণ তাহা স্বতন্ত্রভাবে ও স্বতন্ত্র-দিনে করিতে হইবে।

পঞ্চম বা শেষ কথা—সাহিত্য সমাজের নেতৃস্থানীয় এইরূপ এক ব্যক্তিকে সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং অন্য এক ব্যক্তিকে সহকারী-সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করা হউক। আর পরিষদের কার্যকলাপ নির্বাহার্থ অনধিক দশ কিংবা অন্যূন আট জন লইয়া একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হউক। পরিষদের যাবতীয় কার্য এবং নিয়মাবলী কার্য-নির্বাহক সমিতির তত্ত্বাবধানে নির্বাহিত ও গঠিত হউক এবং প্রতি মাসে একবার করিয়া তাহার অধিবেশন হউক।

ষষ্ঠতঃ—কার্য-নির্বাহক সমিতি অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য চারিজন সুদক্ষ ব্যক্তিকে সমালোচক নিযুক্ত করিবেন। পরিষদের যে সকল পুস্তক পত্রিকাদি উপস্থিত হইবে সেই সকল সমালোচনার জন্য নিযুক্ত সমালোচক-দিগের হস্তে অর্পণ করিবেন।

জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে যখন জাতির উন্নতির অতি নিকট ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তখন জাতীয় সাহিত্যের আলোচনার্থ এই সাহিত্য পরিষদের প্রতি আপনাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই পরিষদের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধ করাকে জীবনের একটা প্রিয় ও পবিত্র কার্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যে স্থলে শ্রদ্ধার উদয় হয়—পবিত্রতার উদ্দীপনা হয়—সে স্থলে গাম্ভীর্য আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। অতএব শ্রদ্ধান্বিত পবিত্র ও গম্ভীর চিত্তে এই সাহিত্য পরিষদের লক্ষ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হওয়াই আমাদিগের পক্ষে কর্তব্য হইতেছে।

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার—পৃ. ২-৩] এপ্রিল ১৮৯৪,
Vol. No 7.

পরিশিষ্ট (খ) দেবেন্দ্রনাথ রচিত দয়ানন্দ চরিত (সমালোচনা)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দয়ানন্দ চরিতের প্রথম খণ্ড আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। দয়ানন্দ স্বামী আমাদের দেশের আধুনিক ধর্ম সংস্কারকদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান শ্রেণীভুক্ত, এ বিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ কোনো প্রদেশে আর্যধর্মের জয় পতাকা অনুদ্ধত রাখেন নাই—অথচ তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র ও যতকিছু সম্বল সমস্তই পুরাতন ভারতবর্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ হইতে সংগৃহীত ; তেজস্বী ব্রাহ্মণ কোনো একটি বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও পর-জাতির নিকট ঋণী নহেন। না বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়ে, না প্রচার-পদ্ধতি বিষয়ে, না চরিত্র সংগঠন বিষয়ে তিনি ভারতের নির্ভীক আর্য সন্তান ছাড়া আর কিছু! ধন্য সেই তেজীয়ান মহাপুরুষ যাঁহাতে ধর্মনিষ্ঠা, সরলতা, উদ্যমশীলতা, দেশের হিতার্থে জীবন সমর্পণ, সত্য-প্রিয়তা, এইরূপ নানা মহদগুণ একাধারে মিলিত হইয়া মহিমান্বিত পুরাতন ভারতবর্ষের মান রক্ষা করিয়াছে এবং আধুনিক ভ্রষ্ট ভারতবর্ষকে ধিক্কার দিতেছে! বর্তমান গ্রন্থ পাঠে আমরা একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, যে ভারতবর্ষে দয়ানন্দের ন্যায় ধর্মাত্মা বীরপুরুষ আজিও জন্মগ্রহণ করেন, সে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই আর্যভূমি। গ্রন্থকর্তার রচনাশক্তি অল্প নয়—তিনি সুপাঠ্য, সরল, এবং স্থানে স্থানে হৃদয়ের বেগ জনিত অত্যুক্তি-মিশ্রিত ভাষায় দয়ানন্দ স্বামীর তেজোময় অটল ঋজুকায় এবং অপ্রতিহত অধ্যবসায় মধ্যে আমাদের মনশ্চক্ষে আনয়ন করিলেন। তাঁহার লেখনীরগুণে, দয়ানন্দ স্বামীকে সেই একদিন উদ্যান-মধ্যে দেখিয়া-

ছিলাম—আবার যেন তাঁহাকে চক্ষের সমক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এরূপ মহচ্চরিত্র পঠনের পুণ্য-ফলের জন্য গ্রন্থকারকে, বার বার ধন্যবাদ দিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিলাম, যেরূপ উপাদেয় সামগ্রী তাহাতে অল্পে আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮১৮ শক পৃ—১৭৩]

পরিশিষ্ট (গ) দেবেন্দ্রনাথ রচিত নব্যবঙ্গের সমালোচনা

[From, 'The Bengal Academy of Literature' Vol. I, January 6, 1894, No. 6. p. 9.]

This is a novel of Society purporting to hold up the mirror to the 'nature' of modern Bengali. It is a sort of contemporary history. The novelist attempts to pourtray the life and thought of the Neo-Bengali Society. His canvas is crowded with a variety of familiar figures fair and dark, with features truth fully limned. but with proportions a bit exaggerated. The artist has at command many colours, though in his drawings, the black is, a shade, pre dominant.

Navya Banga is a novel, with, as the author tells us, a purpose. As such it has naturally, purhaps, some what suffered in art. In all such novels the purpose fixes itself in the author's brain and works itself out in detriment oftentimes of his art. Even the works of such artists as

Dickens and Thackeray have suffered, because they set before themselves a purpose to work out in their novels. A novelist should be an artist before all things.

* * *

Character painting, is the author's strong point. There are not many beautiful characters such as on may love, but these are generally true. Iago is true but not loveable. So here we have Bimala, Bagala, Ratikanta and Nerendra-nath.…

* * *

Naya Banga provokes comparison with Saranalata Whose plot it resembles in the earlier chapters.

Bavani excites our pity and love in the same way as Sarola does ; but there is here no Gadadhar Chanra to lighten the tedium of this earthly existence. Mr. Chaki has his prototype in Chundranath Basu's Pashupati Sangbad. Pashupati however is a Bengali Don Quixote. ...But Chaki is a scoundrel in patriot's clothes ; one absolutely detests him.

For the causticity of its satire, the novel may be compared with Kalpataru of Babu Indranath....

—**Hirendronath Datta.**

সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—১১৯

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শ্রীহারাধন দত্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৮৯

মূল্য : পাঁচ টাকা

[আরতি মল্লিক স্মৃতি তহবিলের অর্থে মুদ্রিত]

মুদ্রাকর
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

১৮৯৩-১৯৪৭

অনতিকাল পূর্বেও কবি এবং সাহিত্যসেবী হিসাবে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের প্রসিদ্ধি ছিল। মূলতঃ কবি হিসাবেই তাঁহার সমধিক খ্যাতি। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কাব্যসাহিত্যে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অবদান উপেক্ষার নয়। সাহিত্যের বহুধাক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কাব্য এবং শিশু ও কিশোর সাহিত্যে প্যারীমোহন ছিলেন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। সাময়িক পত্র-সেবায় তাঁহার অধিকার নৈপুণ্য ও প্রখর সতর্কতা সপ্রশংস উল্লেখের উপযোগী। মৃত্যুর অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি বিলোপোন্মুখ। বিংশশতকের তৃতীয় দশকে যে কয়জন নবীন লেখক কবিতায়, গদ্যরচনায় স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্যারীমোহনের নাম স্মরণীয়। সাম্প্রতিক কালে তাঁহার কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না। তাঁহার বহুপ্রশংসিত কাব্যানুবাদ মেঘদূতের চাহিদা সত্ত্বেও গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। কালধর্মে তাঁহার সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে এযুগের সাহিত্যানুরাগী সমাজের পরিচয়ের সেতুবন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। মৃত্যুর তিনদশক পরে সমসাময়িক বিরূপ অবহেলা ও সরব গুণকীর্তন দুই বিপরীত মেরুর বাহিরে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের সাহিত্যসাধনার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন তৎকালীন সাহিত্যের ইতিহাস-পর্যালোচনার পক্ষে আবশ্যক।

জন্ম : বংশপরিচয়

প্যারীমোহন সেনগুপ্তের পৈতৃকনিবাস হুগলীজেলার হরিপাল-তারকেশ্বর সন্নিকট গোপীনাথপুর গ্রাম। তাঁহার জন্মতারিখ ১৭ই ফাল্গুন, বুধবার,

১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৩ খ্রীঃ)। প্যারীমোহন ঐতিহ্যসম্পন্ন রাঢ়ীয় বৈদ্যপরিবারের সন্তান। শাস্ত্রানুশীলন আয়ুর্বেদচর্চা ও শিক্ষানুরাগের জন্য এই পরিবারের সুনাম ছিল। প্যারীমোহনের পিতা জলেশ্বর সেনগুপ্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। জলেশ্বর কবিরাজি করিতেন। পিতামাতার তিন কন্যা, দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠপুত্র শৈশবেই পরলোকগমন করেন। প্যারীমোহনই কনিষ্ঠ। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্যারীমোহনের পিতৃবিয়োগ হয়। এই শৈশবকাল হইতেই প্যারীমোহন জীবনসংগ্রামের আস্বাদলাভ করেন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

প্যারীমোহনের বাল্যজীবন স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয় নাই। অষ্টমবর্ষে পিতৃহীন হইয়া সহায় সম্বলহীন বিধবামাতার একমাত্র অবলম্বন প্যারীমোহন রূঢ় জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হন। জীবনের এই পর্বে তিনি আত্মীয়-স্বজনগনের আনুকুল্য হইতে বঞ্চিত হন। জননীর দুঃখলাঘব দূরের কথা তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার মত নিকট আত্মীয়ের অভাব ছিল না। এই দুঃসময়ে প্যারীমোহন জননী বৈদ্যবাটী পিত্রালয়ে আশ্রয়গ্রহণ করেন। প্যারীমোহন গ্রাম্য-পাঠশালায় উচ্চপ্রাথমিক ও ছাত্রবৃত্তির কিয়দংশ পাঠ করেন। মাতুলালয়ে অবস্থানকালে ছাত্রবৃত্তির পাঠ সমাপ্ত করিয়া চাঁপদানী হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হন। চাঁপদানী হুগলীর প্রাচীন স্থান, বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' স্থানটির উল্লেখ দেখা যায়। চাঁপদানী বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে প্যারীমোহন পুনরায় জীবন সংকটে পতিত হন। মাতুলালয়ে তাঁহার অবস্থান অবাঞ্ছিত বিবেচিত হয়। অস্বস্তিকর পরিবেশে তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এই দুঃসময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৎসল পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে তিনি নিজের অসহায়তার কথা নিবেদন করেন। সদাশয় পণ্ডিত মহাশয় পূর্বেই প্যারীমোহনের মেধা ও উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাইয়াছিলেন। অতঃপর এই ছাত্রবৎসল শিক্ষক মহাশয়ের সুপারিশ

ক্রমে প্যারীমোহন চাঁপদানীর ধনাঢ্য জমিদার-পরিবারের নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কুমুদবান্ধব মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হন। এই দুই মুখোপাধ্যায় ভ্রাতা প্যারীমোহনকে তাঁহাদের নিজ বাটীতে আশ্রয়দান করেন এবং নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করিবার সর্ববিধ সুযোগ করিয়া দেন। মুখোপাধ্যায় পরিবারের সদাসয়তা, অকৃপণ সাহায্য এবং সহযোগিতা প্যারীমোহনকে নবজীবনে উদ্দীপ্ত করে। প্যারীমোহন আমৃত্যু মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্দেশে তাঁহার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "কোজাগরী" কাব্যের 'উৎসর্গ পত্রে' প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়কে 'পিতৃতুল্য পূজনীয়' রূপে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন —

> স্নেহ প্রেমে আর করুণাধারায় রিক্তচিত্তে মম
> করিলে সরস, করিলে সবল ; দেখাইলে অনুপম
> মানবজীবন লক্ষ্য আমারে,—আজি তোমাদেরি করে
> তোমাদেরি গড়া জীবনের ফুল নিবেদি ভকতিভরে।

পারিবারিক বিপর্যয় ও নানাবিধ বিঘ্ন-সংকটে জর্জরিত প্যারীমোহনের বিদ্যালয় জীবনের পাঠ বিলম্বিত হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাঁপদানী উচ্চবিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তিনি সুবর্ণপদক লাভ করেন। অতঃপর প্যারীমোহন কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজে কলা বিভাগে প্রবেশ করেন। এই কলেজে তিনি কলাবিভাগের অধ্যাপক মণ্ডলীর কাছে বিশেষ স্নেহভাজন ছাত্রের গৌরব লাভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত আই. এ. পরীক্ষায় সকল বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াও ইতিহাসে অসাফল্যের জন্য অকৃতকার্য হন। তাঁহার প্রথাবদ্ধ ছাত্রব্রতের পরিসমাপ্তি এখানেই।

বিবাহ

কলেজে পঠদ্দশায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) প্যারীমোহন পাটনা টি. কে. ঘোষ একাডেমীর প্রধান শিক্ষক সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া-কন্যা উমাদেবীকে বিবাহ করেন। উমাদেবী আমৃত্যু স্বামীর জীবন যুদ্ধের সহযাত্রিণী ছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

শৈশব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি প্যারীমোহনের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রজীবনে বাঙলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্যাদি অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। সাহিত্যালোচনার উৎসাহে কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির প্রতি তাঁহার আগ্রহ শিথিল করিয়াছিল। বারো-তেরো বৎসর বয়স হইতে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। কবিতা লেখা ও কবি-সাহিত্যিকগণের সান্নিধ্য ও সাহচর্য অর্জনে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ঐ বৎসরেই আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহিত তাঁহার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার কাছেই প্যারীমোহন বাঙলা তথা ভারতীয় ও বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করেন। ইহার কিছু পূর্বেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির নাম 'ইন্দ্রধনু'।[১] ইহার পরেই 'পাগলা' ও 'একা' কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়।[২] এই সূত্রেই প্যারীমোহন প্রবাসী সম্পাদক

১। মর্মবাণী, ২৫শে কার্তিক ১৩২৩

২। প্রবাসী, আষাঢ় ও ভাদ্র ১৩২৪

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এইরূপে প্যারীমোহন সাহিত্য ক্ষেত্রে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করিবার মত মানসিক শক্তি অর্জন করেন। সাহিত্য সেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও প্রসারিত হইয়া ওঠে।

জীবিকা সন্ধানে

প্যারীমোহন জন্মাবধি দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। সাহিত্য সেবক জীবনের এই উন্মেষপর্বে তাঁহার কল্পনাবিলাসী কবিমন যখন তারুণ্যের পাখা মেলিয়া উড্ডীন হইতে চাহিতেছিল সেই সময়ে তাহার পারি-বারিক দায়-দায়িত্ব দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। জননী, বিধবাভগিনী, স্ত্রীসহ তাঁহার সংসারে অর্থকষ্ট বাড়িয়া যাইতে থাকে। এই সময়ে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্যারীমোহন "কলিকাতা মিলিটারী সাপ্লাই একাউন্টস্ অফিসে" মাসিক ৫০ টাকা বেতনে কেরাণীর চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারী অফিসের এই চাকুরীর সহিত তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। অফিস দপ্তর ও ফাইলের জঞ্জালস্তূপের মধ্যে তাঁহার কবিমন হাঁপাইয়া উঠিল। বৃত্তি পরিবর্তনের জন্য মরণপণ সংগ্রাম শুরু হইল। এমনই সময়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে। প্যারীমোহন জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদস্বরূপে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দেন।

সাময়িক পত্র-সেবা

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অতঃপর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১৩২৬) 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। ঔপন্যাসিক সমালোচক ও প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

সুপারিশ তাঁহার এই চাকুরীলাভে সহায়ক হইয়াছিল। স্বয়ং সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্যারীমোহনের প্রতি সস্নেহ আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে চারুচন্দ্র 'প্রবাসী,' 'মডার্ণ রিভিয়্যু' পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিয়ু'র মত বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুইখানি অতিকায় মাসিক পত্রিকার সহকারী-সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য সুসম্পন্ন করা শ্রমশীল চারুচন্দ্রের পক্ষেও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। প্যারীমোহন দ্বিতীয় সহকারী-সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করিলেন। চারুচন্দ্রের শ্রম লাঘব হইল। বেতন সামান্য হইলেও এই নূতন সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে প্যারীমোহন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। পেটের ক্ষুধা না মিটিলেও তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ 'প্রবাসী'র কর্মক্ষেত্র হইতেই প্যারীমোহন বৃহত্তর সাহিত্য ও বৈদগ্ধ্যের জগতের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার বিকাশোন্মুখ হৃদয় মঞ্জরিত হয়। শতধারায় নিঃসৃত হয় তাঁহার লেখনীমুখ। কবি ও লেখক হিসাবে তাঁহার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। 'প্রবাসী'র 'তেজস্বী সম্পাদক' নামক এক নিবন্ধে প্যারীমোহন লিখিয়াছেন,—"আমার এই সামান্য জীবনে কয়েকজন অসামান্য ব্যক্তির সাহচর্য ও উপদেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ইহা আমার দুঃখময় জীবনে এক পরম তৃপ্তির কথা। যৌবনের গোড়ার দিকেই আমি আমার অপরিণত বুদ্ধি ও রুচিকে সুপরিচালিত করিবার মতো আদর্শগুণযুক্ত যে পুরুষকে লাভ করিয়াছিলাম তিনি হইতেছেন ভক্তিভাজন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।…'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ' নীতি অনুসারেই রামানন্দবাবুর পার্শ্বে চারুবাবুর উপস্থিতি ঘটিয়াছিল। রামানন্দবাবুর সৎ ও সাধুনীতির এবং সৎ অভিপ্রায়ের পালক ও বাহক ছিলেন চারুবাবু। আর চারুবাবুর বহু সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনার উদার পোষক ছিলেন রামানন্দবাবু। এই উভয় ব্যক্তির প্রীতিপূর্ণ দৃঢ়বদ্ধ কর্মের ছায়াতলে আমি এক অপরূপ শিক্ষার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাময়িক পত্র সম্পাদনার যে পাঠ তিনি গ্রহণ করেন তাহা 'প্রবাসী'-'মডার্ণ রিভিয়্যু' পত্রিকা দু'খানির গৌরব ও পরিপুষ্টি বিধানে বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হইয়াছিল। প্রবাসী সম্পাদক প্যারীমোহনের উপর অনেক দুরূহ কাজের ভার দিয়া নির্লিপ্ত থাকিতেন—প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া প্যারীমোহন যথাসময়ে তাহা সুচারুরূপে নির্বাহ করিতেন। প্রধান সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র 'প্রবাসী'র কোন কোন বিভাগের ভার প্যারীমোহনের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। প্যারীমোহন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সুসংবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারিতেন। সহ-সম্পাদক হিসাবে তরুণ লেখককে আবিষ্কার এবং তাঁহাদের উৎসাহদান প্যারীমোহনের লক্ষ্য ছিল। প্রবাসীর কর্মজীবন প্যারীমোহনের সাহিত্যিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রায় নয় বৎসরকাল, 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিয়্যু'র সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি ঐ দায়িত্বভার হইতে অব্যাহতি নেন।

পরবর্তীজীবনে ভিন্নবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও সাময়িকপত্র-সেবামূলক সাহিত্যকর্মে তাঁহার আগ্রহ স্তিমিত হয় নাই। 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিয়্যু'র কার্যকালে তিনি সরলাদেবী সম্পাদিত 'ভারতী' (১৩৩১-৩৩) পত্রিকা সম্পাদনার আংশিক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার দিনলিপি হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্যারীমোহনকে সাহিত্য সেবায় অনুপ্রাণিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি তাঁহার সম্পাদিত "পঞ্চপুষ্প" (১৩৩৬-৩৯) নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদনাকাজে প্যারীমোহনকে সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্যারীমোহন অতিশয় দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদনায় অমূল্যচরণকে সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অধুনালুপ্ত 'উদয়ন' (চৈত্র-১৩৩৯) মাসিক পত্রিকাখানির প্রথম সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদনা ব্যাপারে স্বত্বাধিকারী অনিলকুমার দে-র

সহিত মত পার্থক্য হওয়ায় তিনি 'উদ্বোধনে'র সম্পাদনা দায়িত্ব ত্যাগ করেন।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের দিকে 'বসুমতীর' সহিত তাঁহার সংশ্রব স্থাপিত হয়। এই বৎসরের আশ্বিন মাসে 'বসুমতী'তে 'সাময়িক প্রসঙ্গ' ফিচারটি প্রবর্তিত হয়। প্যারীমোহন 'বসুমতী'র সাময়িক প্রসঙ্গ বিভাগটি বেশ কিছুকাল পরিচালনা করেন।

১৯৪৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীমোহন "নব বঙ্গদর্শন" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দের আশীর্বাদ ও সহযোগিতাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা আর রূপায়িত হইয়া ওঠে নাই.

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কুচবিহার রাজবাটী হইতে প্রকাশিত 'কুচবিহার দর্শন' (?) পত্রিকাখানির সম্পাদনায় তিনি সহযোগিতা করিতেন। সাময়িক পত্র-সেবা প্যারীমোহন সেনগুপ্তের সাহিত্য-সেবক-জীবনের এক স্মরণীয় দিক। মূলতঃ কবি হইলেও পরিবর্তমান সাহিত্য সমাজ, দেশ ও কাল সম্পর্কে তাঁহার চিত্ত সদাজাগ্রত ছিল। তাঁহার অনায়াস লিখনচাতুর্য ও বৈদগ্ধ্য গুণগ্রাহী সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল।

অধ্যাপনা

'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়া প্যারীমোহন সেনগুপ্ত "বঙ্গবাসী কলেজে" অধ্যাপনা কর্মে লিপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্জিত শিক্ষাগত সাফল্যের কোন প্রতীক তাঁহার ছিল না। কোন উপাধিও তিনি অর্জন করেন নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত একখানি প্রশংসা পত্র ছিল তাঁহার সম্বল। শান্তিনিকেতন হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে লিখিত ঐ প্রশংসাপত্রে রবীন্দ্রনাথ

লিখিয়াছিলেন—"I have much Pleasure is testifying to the high character and abilities of Sriman Pyarimohan Sengupta. His knowledge of Bengali literature and his literary gifts fit him for the post of a lecturer in Bengali literature" কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রের জোরে প্যারীমোহন "বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর আনুকূল্যলাভে সমর্থ হন। এইরূপ গুণগ্রাহিতা বর্তমান কালে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর প্যারীমোহন 'বঙ্গবাসী কলেজে' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত হন। এই কলেজেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাইয়া গিয়াছেন। এজন্য গিরিশচন্দ্র বসুর প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। গিরিশচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধানিবেদনচ্ছলে তিনি লিখিয়াছেন—"যিনি পিতার ন্যায় স্নেহগুণে আমার অকৃতি জীবনকে ধন্য করিয়াছেন সেই অশেষ শ্রদ্ধাভাজন।"[১] বঙ্গবাসী কলেজের কর্মজীবনে কবি ও অধ্যাপক হিসাবে তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বৈষয়িক সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও সারস্বতসেবক হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ঘটে। অধ্যাপক জীবনেই প্যারীমোহন ১৩৪১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেক্সট বুক কমিটির' সদস্যপদ লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকের সংকলক ও সম্পাদক পদেও তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে লিখিত একখানি অভিজ্ঞান পত্রে Council of Postgraduate teaching in Arts and Science এর তদানীন্তন কর্মসচিব শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখেছিলেন—"...he was appointed by the Calcutta university as one of the compiler of the present Intermediate Bengali Selecticus and has one of the editors of an an-

১। কিশোর কবিতা (১৩৪১)। উৎসর্গ

thropology to be shortly published by the university…"
প্যারীমোহন দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের পূর্বেই য়ুরোপে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। তাহার তরঙ্গ আসিয়া পেঁছাইল এদেশের শহরে গ্রামে-গঞ্জে প্রতিটি মানুষের জীবনে। কলিকাতায় ইভ্যাকুয়েশনের হিড়িক পড়িল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট আন্দোলনের জোয়ারে দেশ আলোড়িত। এই সময় বঙ্গবাসী কলেজ কুষ্ঠিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ঠিক এই পর্বে স্থান পরিবর্তনে ব্যতিব্যস্ত বিপর্যস্ত প্যারীমোহন কুষ্ঠিয়াতে বাসা বাঁধিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। যুদ্ধ শেষে প্যারীমোহন পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। প্যারীমোহন বি এ. পাঠ্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'কপালকুণ্ডলা' পুস্তক দু'খান এই সময়ে সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। ছাত্রপাঠ্য পুস্তক হইলেও এই পুস্তক দু'খানর আলোচনা অংশে তাঁর উচ্চ সাহিত্যবোধ বৈদগ্ধ্য ও সমালোচক সত্তার নিদর্শন বিদ্যমান। প্যারীমোহন ছিলেন সুপণ্ডিত ও আদর্শ শিক্ষক। প্রথাসিদ্ধ পুঁথিগত বিদ্যায় সিদ্ধ না হইয়াও বড় শিক্ষক হওয়া যায়। প্যারীমোহন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিছুকাল পূর্বে স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি যোগ্য : শিক্ষার মানের প্রসঙ্গও প্রাসঙ্গিক। সব সময়ে কিন্তু সে মান পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করে না। অতীতে যে সব বিদ্যালয় সুনাম অর্জন করিয়াছিল তাহাদের শিক্ষকদের ডিগ্রি-ডিপ্লোমা হয়ত তেমন ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষাদিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদের কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা সত্যই কিছু শিখিত যদিও শিক্ষাগত সাফল্যের প্রতীক বিশেষ কিছু তাঁহাদের ছিল না। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, কিংবা প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অথবা পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর অত্যন্ত উঁচুদরের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু স্নাতক

পর্যায়ের উপরে তাঁহারা কেহই ওঠেন নাই।"[১] অধ্যাপনা কালে প্যারীমোহন ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যাপ্রণালী ছিল হৃদয়গ্রাহী। বাঙলা এবং অপরাপর সাহিত্য তিনি উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে

দীয়মান সাহিত্যিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্বজ্জনদিগকে একত্রিত করিয়া সাহিত্যিক গোষ্ঠীসৃজনে প্যারীমোহনের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। 'প্রবাসী সঙ্গত' ও 'সবুজ সমিতি' নামক সাহিত্য সমিতি দুটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্যারীমোহনের অবদান ছিল। তিনি এই দুইটি সাহিত্য সমিতি সম্পাদক ছিলেন। প্যারীমোহন ছিলেন 'প্রবাসীর' সহ-সম্পাদক ও কবি। সেজন্য এই সাহিত্য সমিতি দুইটি একদিকে যেমন কবিগোষ্ঠী অপরদিকে তেমনই 'প্রবাসী'র লেখকবৃন্দের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সমিতি দুইটিতে শুধুমাত্র যে আলোচনা হইত তাহা নয়—কবিতা, ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাদিও পাঠ করা হইত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র নন্দী, সুবোধ রায় এবং অন্যান্য বহু বিদ্বজ্জন 'প্রবাসী সঙ্গত' ও 'সবুজ সমিতির' সভ্য ছিলেন।

বাঙলা ভাষা-সাহিত্য ও বাঙালীর সারস্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত প্যারীমোহনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগে নৈহাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে প্যারীমোহন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের নির্দেশে শাস্ত্রী মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা

১। কাহার স্বার্থে। (সম্পাদকীয় নিবন্ধ), আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ অগস্ট ১৯৭৬

জানাইবার জন্য প্যারীমোহন ছয়ছত্রের একটি কবিতা লিখিয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে প্যারীমোহন 'বঙ্গভারতী' নামে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি 'পঞ্চপুষ্প' শ্রাবণ, ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

বঙ্গভারতী তোমার আরতি করিছে আজিকে দিনের দল
লহগো প্রণতি, শ্রদ্ধা. ভকতি, লহগো হর্ষ, অশ্রুজল।
তোমারি পুণ্যে দেউল ধন্য, তারি বেদীতলে তুলিয়া তান।
গাহিব জয়তু ভারতী মহতী, তুমিই দেবতা, তুমিই প্রাণ
আশা উল্লাস প্রীতি উচ্ছ্বাস বাসনা বেদনা তোমাতে লীন
তুমি গো ধন্য, জানি না অন্য দেবতা আমরা তোমা বিহীন।

× × × × × × ×

হে দেবী, তোমার গড়েছে আগার যারা তারা নহে অর্থবান্
বিভববিহীন দীনতমদীন গড়েছে দেউলে সঁপি পরাণ।
মানব-ইন্দ্র দীন রামেন্দ্র, দীন ব্যোমকেশ অস্থি দ্যায়।
তাদেরি শোণিতে রচি চারিভিতে বাণীমন্দির আজি দাঁড়ায়।
হে বাণী দেউল পুণ্য অতুল ওহে পরিষৎ নমস্কার!
তিমির-নাশন বিদ্যা-আসন, ভাবের জ্ঞানের শুদ্ধাগার।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্যারীমোহন জোড়াসাঁকোর 'রবিমণ্ডলে' নিয়মিত যাতায়াত করিতেন। 'রবিমণ্ডল' প্যারীমোহনকে বিশ্বকবির অন্তরঙ্গ ও নিবিড় নৈকট্যে আনয়ন করিতে সহায়তা করিয়াছিল।

স্বাদেশিকতা

প্যারীমোহনের জীবনের ধ্রুবতারা ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেশপ্রীতির মন্ত্র পাইয়াছিলেন তাঁহার সাহিত্য ও সঙ্গীত হইতে। প্রথম জীবনে

'বন্দেমাতরমে'র স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা-গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার স্বাদেশিকতাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। সক্রিয় রাজনীতির সহিত সংযোগ না থাকিলেও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতা ও নিবন্ধাদি হইতে তাঁহার তীব্র স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তিনি মহাত্মা গান্ধীর 'কারাকাহিনী'র ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পল্লীজীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁহার সুগভীর আগ্রহ ছিল। তাঁহার স্বগৃহে সংরক্ষিত ধূলি মলিন পাণ্ডুলিপি সমূহের মধ্যে পল্লী উন্নয়নমূলক অজস্র কর্ম প্রয়াসের ইতিবৃত্ত মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। আপন জন্মপল্লী গোপীনাথপুরের উন্নতি কল্পে তাঁহার প্রয়াসের বহু স্বাক্ষর ও স্মৃতি পল্লী-বাসীরা আজও সগর্বে স্মরণ করেন। সে যুগের স্বাদেশিকতার অন্যতম লক্ষ্যণীয় দিক ছিল পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী সংগঠন। প্যারীমোহন পল্লীজাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ২৪ পরগনা জেলার ধান্যকুড়িয়া অঞ্চলের পল্লীউন্নয়নব্রতী সাধক ও পল্লী সংগঠক উপেন্দ্রনাথ সাউ তাঁহার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। "পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ" (১৩৪৭) গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন হইতে ৩০ এপ্রিল ১৯৪০ তারিখে একখানি পত্রে তিনি প্যারীমোহনকে লিখিয়াছিলেন, "পল্লীর উন্নতিসাধন উদ্দেশে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন পুণ্যস্মৃতি সেই উপেন্দ্রনাথ সাউর জীবন চরিত রচনার তোমার অধ্যবসায় পল্লীহিতৈষী মাত্রেরই আনন্দের বিষয়। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে আমি আমার আশীর্বাদ জানালেম।" প্যারীমোহনের রচনায় বৃহদংশ স্বাদেশিকতা ও দেশ গৌরবের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। শতকের চল্লিশের দশকের শেষ অঙ্কে প্যারীমোহন 'জয় সুভাষ' (কাব্য) 'বিপ্লবী সুভাষ' 'জয়হিন্দে অ. আ. ক. খ.' 'পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহযাত্রী হন।

বিয়োগব্যথা

অল্পবয়সে পিতৃহারা হইয়া প্যারীমোহন জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর ঐকান্তিক স্নেহ ও ভালবাসায় লালিত হইয়াছিলেন। প্যারীমোহন ছিলেন পরম মাতৃভক্ত। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ ভুবনেশ্বরী দেবী পরলোক গমন করেন। জীবনের সম্বল জননীকে হারাইয়া প্যারীমোহন মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছিলেন। জীবনের শেষলগ্নে প্যারীমোহন পর পর স্বজন বিয়োগ দুঃখ-শোক ও বেদনায় স্তব্ধ হইয়া যান। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে জ্যেষ্ঠা কন্যা বাণীদেবী অকালে ইহধাম ত্যাগ করেন। কিন্তু বৎসর কাটিতে না কাটিতেই কবি পত্নী উমাদেবী দীর্ঘ রোগভোগের পর ১২ বৈশাখ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন।

মৃত্যু

স্বজন বিয়োগের আঘাত সহ্য করা কবির পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কন্যা ও পত্নীশোকে দিবারাত্র মুহ্যমান হইয়া উদাসীনভাবে কোনপ্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন করিতেছিলেন। কবি প্যারীমোহনের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁহার পুত্র যাহা লিখিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, "আমার স্বর্গত পিতৃদেব কবি অধ্যাপক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত একটি পথ দুর্ঘটনায় মারা যান ২০শে মে ১৯৪৭ সাল। তিনি হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র ২০ দিন আগে তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে। সুতরাং মানসিক দিক থেকেও তিনি বিপর্যস্ত ছিলেন। তখন তাঁর গ্রীষ্মবকাশ যাচ্ছিল। পত্নীবিয়োগের পর সেই দিনই তিনি প্রথম বাড়ীর বাহিরে যান। লালদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে বা উঠতে গিয়ে, সঠিক কেউ বলতে পারেনি। লাইট পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, অচৈতন্য হয়ে যান এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।" [১]

১। কবি প্যারীমোহন। অরুনাভ সেনগুপ্ত। দেশ (চিঠিপত্র), ১১ই বৈশাখ ১৩৭৭

তাঁহার মৃত্যুতে তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র পত্রিকা গুলিতে শোকাঞ্জলি নিবেদিত হয়। প্যারীমোহনের মৃত্যুতে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত শোক সংবাদের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছেঃ "অধ্যাপক সেনগুপ্ত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক কাব্যগ্রন্থ 'অরুনিমা' এবং 'মেঘদূতে'র অনুবাদ একসময় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিল। তিনি কিছুকাল 'উদয়ন' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনাও করিয়াছিলেন। তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে লেখনীচালনা করিতেন। মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। সম্প্রতি তিনি শিশুদের পাঠ্য পুস্তক রচনায় বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন।"[১] তাঁহার সর্বশেষ কবিতাটি 'বঙ্গশ্রী' (আষাঢ় ১৩৫৪) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দেশাত্মবোধক এই কবিতাটির নাম "আমার দেশ"। এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত প্যারীমোহনের মৃত্যুসংবাদের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাঁহার কবিচরিত্রের একটি বিশেষ দিক প্রত্যক্ষ করা যাইবে। "তাঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হইয়া আছে। তন্মধ্যে 'মেঘদূতের' সরল বাংলা অনুবাদ সমধিক সুনাম অর্জন করিয়াছে। বঙ্গশ্রীর তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের নিরহংকারিতা, সারল্য ও স্বজনপ্রীতির দ্বারা তিনি মানুষকে অল্পতেই আপন করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার সর্বশেষ কবিতাটি আমাদের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। কবিতাটির মধ্যে তাঁহার স্বাদেশিক মনের কুসুমটিই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।" Hindusthan Standard এর ২২মে ১৯৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের কিয়দংশ এই সঙ্গে পাঠ করা যাইতে পারে, "Professor Sengupta was an erudite Scholar a distinguished educationist and a popular poet. Starting his career as a journalist he joined in

---

১। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

1928 the Bangabasi College as profesor of Bengali which post he held till his death. He welded a facile pen and his lyrics have earned him a permanent place is the Bengali literature."

গ্রন্থপঞ্জী

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত রচিত, অনূদিত, সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাদির মধ্যে যে গুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

কাব্য

১। **অরুনিমা**। (কবিতা পুস্তক)। ফাল্গুন, ১৩২৯। পৃ ১৩৯
নিজব্যয়ে মুদ্রিত। বৈদ্যবাটী-যুবক সমিতি হইতে ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত।

২। **বেদবাণী**। (অনুবাদ কবিতা)। আশ্বিন ১৩৩০। পৃঃ ৩৫৯
সহ-গ্রন্থকার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থখানির বিজ্ঞাপন (ভূমিকা), টীকা, ভাষ্য, প্রমাণপঞ্জী প্রভৃতি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। বেদের অনুবাদগুলি প্যারীমোহনের। বিজ্ঞাপনে চারুচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ "পদ্যগুলি সমস্তই আমার সহকারী স্নেহপ্রীতিভাজন বন্ধু প্রসিদ্ধ কবি শ্রীমান প্যারীমোহন সেনগুপ্তের রচনা।"
প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স।
৯০/২/এ, হ্যারিসন রোড। কলিকাতা

৩। **মেঘদূত** (প্রথম সংস্করণ)। ফাল্গুন ১৩৩৭।
প্রকাশক—শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।
২২/২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা
প্রণতি ঃ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত আট লাইনের একটি কবিতা।

উৎসর্গ : আমার কবিজীবনে প্রীতি ও উৎসাহদাতা বন্ধু—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সেন, লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা, নির্মলপদ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইদেব শর্মা, সুরেশচন্দ্র নন্দীকার করকমলেষু।

গ্রন্থকারের নিবেদন : পৃ. এক আনা হইতে দুই আনা।

মেঘদূতে পরিচয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পৃ. এক আনা হইতে চার আনা।

কালিদাস ও মেঘদূত। প্রবোধচন্দ্র সেন। পৃ. ১-৩৪

অনুবাদ। পূর্বমেঘ। শ্লোক সংখ্যা ৬৩। পৃ. ১-৬৫

ঐ উত্তরমেঘ। শ্লোক সংখ্যা ৫৪। পৃ. ৬৬-১২১

মেঘদূত প্রসঙ্গ। প্রবোধচন্দ্র সেন। পৃ. এক আনা হইতে সাত আনা

দেশ-পরিচয়। প্রবোধচন্দ্র সেন। পৃ. সাত আনা হইতে চৌদ্দ আনা।

৪। মেঘদূত (দ্বিতীয় সংস্করণ)। বৈশাখ ১৩৪৬ প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ২২/২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা।

উৎসর্গ : আমার কবিজীবনের প্রীতি ও উৎসাহদাতা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কথাশিল্পী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য স্রষ্টাদ্বয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন : গ্রন্থশেষে প্রবোধচন্দ্র সেন কৃত "মেঘদূতের পাঠ সংস্কার" নামক একটি নিবন্ধের সংযোজন। প্রবোধচন্দ্র সেনের, মেঘদূত প্রসঙ্গ ও দেশ পরিচয় আলোচনাটি পরিমার্জিত ও পরিবর্জিত আকারে প্রকাশিত।

৫। কোজাগরী (কাব্যগ্রন্থ)। বৈশাখ ১৩৪০। পৃ. ১০৯ নিউব্যাপে মুদ্রিত। প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী কার্যালয় ১২০/২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

৬। জয়সুভাষ (কাব্যগ্রন্থ)। অগ্রহায়ণ ১৩৫২। পৃ. ৩০ লেখক কর্তৃক। ৪২ বি, শশিভূষণ দে স্ট্রীট, বোবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

৭। পৃথিবীর জাতীয় সংগীত। ১৩৫৩। পৃ. ৩৪
[নানা দেশের জাতীয় সঙ্গীত অনুবাদ]

ছড়া ও পদ্য

১। হালুম বুড়ো (ছেলেদের মজার কবিতা)। প্রথম সং ১৩৩৪
[লেখক কর্তৃক নিজব্যয়ে মুদ্রিত]
ঐ দ্বিতীয় সংস্করণ। কার্তিক ১৩৩৭। পৃ. ৩৬
প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান প্রেস। এলাহাবাদ।

২। লক্ষ্মীছেলে (কবিতা)। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩, পৃ. ৪৩ / পুনর্মুদ্রণ ১৩৫২ / পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৮ পৃ. ৪৪। প্রকাশক : দেবসাহিত্য কুটীর ২২৫/বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

৩। মজার পদ্য (ছেলেমেয়েদের জন্য মজাদার কবিতার বই)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩। পৃ. এক আনা + ৫০ : প্রকাশক : যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস : শ্রীপতি প্রেস। ১৪, ডি. এল. রায় স্ট্রীট। কলিকাতা

৪। বেড়ালের ছড়া (ছড়া)। ১৩৫৩। প্রকাশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা

৫। জয়হিন্দ অ. আ. ক. খ. (শিশুদের জন্য স্বদেশীভাবের ও স্বদেশী নেতাদের জীবনের কথা নিয়ে পদ্যে প্রথম ভাগ)। প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৫৩। দ্বিতীয় সং, ফাল্গুন ১৩৫৩। প্রকাশক : ললিতমোহন সিংহ।

৬। কেবল মজা (ছেলেমেয়েদের হাসির ছড়ার সংকলন)। প্রথম সং ১৯৪৭। দ্বিতীয় সং ১৯৪৯। পৃ. ৪৮ / সচিত্র ; প্রকাশক : বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড। ৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ও ঢাকা।

কিশোর সাহিত্য

১। কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায় (অভিযান), অগ্রহায়ণ—১০২৯। পৃ. দুই আনা + ৭০। সচিত্র, William H. G. Kington-এর Adventure in Africa অবলম্বনে। প্রকাশক : অল ইণ্ডিয়া পাবলিশিং কোম্পানী ৩০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

২। বাঘ-সিংহের মুখে (গল্প) : প্রথম সং ১৯০২, দ্বিতীয় সং ১৯৫৬। পৃ. ৫৮। সচিত্র, প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। ভূতের লড়াই (গল্প)। ১৯০২। পৃ. ৫৭। সচিত্র, প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। বাংলা দেশের কবি। (ঈশ্বর গুপ্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বারোজন কবির জীবনী) আশ্বিন ১৩৩৯। পৃ. ৫৯. প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। কিশোর কবিতা (সংকলন)। আশ্বিন ১৩৪২। পৃ. পাঁচ আনা + ১১২। সচিত্র : প্রকাশক : কালীকিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২১/২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। অদ্ভুত জীবজন্তু (জীবজন্তুর কথা)। ১৯০৩। পৃ. ৬০। সচিত্র, দ্বিতীয় সং ১৩৪৩। প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

৭। ভূতে-রাক্ষসে (গল্প)। আশ্বিন, ১৩৪৩। পৃ. ৩৯। সচিত্র প্রকাশক : মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোং ৪৪/৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

৮। শালিকের গঙ্গাযাত্রা (গল্প)। ১৩৪৬। প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। শেয়াল কবিরাজ (গল্প)। ১৩৪৭ প্রকাশক: ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

ইংরেজী গ্রন্থ

১। Bhisma (Life of Bhisma for boys), October, 1928. Published by Indian Press, Allahabad.

বিবিধ গ্রন্থ

১। মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী। বৈশাখ ১৩৩০।

[মাদ্রাজের Tagore & Co. কর্তৃক প্রকাশিত Mahatma Gandhi's Jail Experience—Told by Himself পুস্তক থেকে সংকলিত ও অনূদিত

প্রকাশক: ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব: কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা।

২। পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ। জীবন চরিত)। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭।

প্রকাশক: নৃপেন্দ্রনাথ বসু ও হেমচন্দ্র সাউ। ২৩ গ্যালিফ স্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। বিপ্লবী সুভাষ। ১৩৫৩। পৃ. ৪৭। টাইটেল পেজে "বিপ্লবী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ" মুদ্রিত আছে। প্রকাশকের নাম নাই।

৪। Intermediate Bengali Selection. (?)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত এই গ্রন্থের অন্যতম সংকলক ও সম্পাদক ছিলেন প্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। কপালকুণ্ডলা। (সম্পাদনা ও আলোচনা)। আশ্বিন ১৩৫৩।

প্রকাশক: শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাত।

২। মেঘনাদ বধ কাব্য (সম্পাদনা ও আলোচনা)। ১৩৫৩।
প্রকাশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট। কলিকাতা।

৩। কবিতা সংগ্রহ (সংকলন ও সম্পাদনা)। প্রকাশকাল-?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহার একখানি কবিতার খাতায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

[ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত 'সবুজ সিরিজ' ও 'ফুলঝুরি সিরিজ' শিশু সাহিত্য রূপে ঘরে ঘরে সমাদৃত হইয়াছিল। প্যারীমোহন এই সিরিজ দুইটির সংগঠন ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করিতেন।]

বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক

১। শিশু সখা (তৃতীয় শ্রেণী)। বৈশাখ ১৩৩৭

২। সহজ পাঠ (চতুর্থ শ্রেণী)। বৈশাখ ১৩৩৭

৩। আহরণী (পঞ্চম শ্রেণী)। বৈশাখ ১৩৩৭

৪। বিচিত্র পাঠ (ষষ্ঠ শ্রেণী)। বৈশাখ ১৩৩৭

উপরোক্ত পুস্তক চতুষ্টয়ের প্রকাশক : ঘোষ অ্যান্ড কোং। কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা। Text Book রূপে অনুমোদিত দ্রষ্টব্য Calcutta Gazette, Nov. 13. 1930]

৫। পাঠ গুচ্ছ (পঞ্চম শ্রেণী)। বৈশাখ ১৩৩৭। প্রকাশক : শ্রী সুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত সুলেখা প্রেস। বৈঠকখানা রোড। কলিকাতা।

৬। সুন্দর পাঠ ১ম ভাগ (তৃতীয় শ্রেণীর জন্য), শ্রাবণ ১৩৪৫ জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস সহযোগে।

৭। সুন্দর পাঠ ২য় ভাগ (৪র্থ শ্রেণীর জন্য), শ্রাবণ ১৩৪৫ জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস সহযোগে।

৮। সুন্দর পাঠ ৩য় ভাগ (৫ম শ্রেণীর জন্য), শ্রাবণ ১৩৪৫ জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস সহযোগে।

৯। সুন্দর পাঠ ৪র্থ ভাগ (৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য), শ্রাবণ ১৩৪৫ জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস সহযোগে।

১০। নীতি পাঠ। ১৩৪৬। [উপরোক্ত পুস্তক পাঁচখানির প্রকাশক: ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা।]

১১। সাহিত্য সঞ্চয়। ১৩৫৩ [প্রকাশকের নাম নাই]

১২। শিশুর পড়া। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

১৩। পাঠ্য সাহিত্য পুস্তক। প্রকাশক: এন. কে. পালিত ? [পুস্তক-খানির সঠিক প্রকাশ সংবাদ পাই নাই]

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য

প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কবিতা, ছড়া-ছবি, ও গদ্য-পদ্যময় সরসস্নিগ্ধ রচনা রাজির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই বলিয়া এ যুগের রসিক সম্প্রদায় বাঙলা সাহিত্যে প্যারীমোহনের যোগ্য মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করিয়া থাকেন। প্যারীমোহন দীর্ঘায়ু ছিলেন না—তথাপি বাঙলা কাব্য সাহিত্যে এবং শিশু ও কিশোর সাহিত্যের পরিপুষ্টিবিধানে তাঁহার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা উপেক্ষার নহে। তাঁহার রসিক সহানুভূতিপরায়ণ চিত্তটির স্পর্শ আমরা তাঁহার নির্মল হাসি ও অক্রোধ পরিহাসপরায়ণতার মধ্য দিয়া সর্বত্র লাভ করি। শিশু ও কিশোর সমাজের সঙ্গে তাঁহার একাত্মবোধ ছিল—জীবনের শেষপর্বে তিনি নিয়ত লেখনী চালাইয়া সাহিত্যের এই বিভাগটি বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। তথাপি রবীন্দ্রযুগের বাঙলা সাহিত্যে কবি হিসাবেই প্যারীমোহনের প্রসিদ্ধি।

প্যারীমোহনের কবিজীবন ও কবিধর্মের বিশদ বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এ আলোচনার লক্ষ্য নয়। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত প্রসারিত বাঙলা কাব্যপ্রবাহে প্যারীমোহনের কাব্যানুশীলন ও কবিতাচর্চার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্তমান প্রসঙ্গে অনুল্লেখ্য নয়।

বিংশ শতকের নবীন বাঙালী কবিদের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাবের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ধ্রুব ঐতিহাসিক সত্যরূপে স্বীকার্য। এই প্রভাব বিকিরণ যে বিংশ শতাব্দীতেই শুরু হইয়াছিল তাহা নহে। শক্তিমান কবির অনুকরণ সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই বহু শ্রুত বহু পর্যালোচিত সত্য। বাঙলা কাব্যের প্রখর দীপ্তির মধ্যে এক কবিসমাজের আবির্ভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাব শুধুমাত্র এই যুগের কবিরাই নহেন — আধুনিক কবিরাও অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। স্বয়ং কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থের একটি নিবন্ধে লিখিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমুখ সাহিত্যিক, বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জন্মাননি। এবং পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোন না কেন, অনুভূতির রাজ্যে শুদ্ধতায় এমন কোন পথের সন্ধান পাননি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই। বস্তুতঃ তাঁর দিগ্বিজয়ের পরে বাংলা-সাহিত্যের যে অবস্থান্তর ঘটেছে তা এই: "তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের জমি জোতদারদের দখলে এসেছে; এবং তাদের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, তারা নিজের এলাকায় শস্যের পরিমান বাড়িয়েছে মাত্র। ফসলের জাত বদলাতে পারেনি।" একজন প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট আধুনিক কবির এই স্বীকারোক্তি বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সমকালীন এবং নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র প্রভাবিত কবি। বস্তুতঃ বাঙলাদেশের তৎকালীন সাহিত্যিক সমাজের মনের কথাটি উচ্চারিত হইয়াছিল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভ্র-আবীর' কাব্যের 'স্বাগত' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি কথায়—

'রবির রশ্মি তোমাদেরি হিয়া রসে লাবণ্যে দিতেছে ভরি।' রবীন্দ্রযুগের কবি বা রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিগোষ্ঠী কথাটি বাঙলাদেশের সংস্কারাচ্ছন্ন সাহিত্য পাঠকদের মনে বিভীষিকার জন্ম দেয়। এই যুগের কাব্য সম্পর্কে অনীহা-ঔদাসীন্য ও অবহেলা একটা প্রথায় পর্যবসিত হইয়াছে। এইরূপে বদ্ধমূল ধারণার পিছনে যুক্তি ও বিচার অপেক্ষা অন্ধসংস্কার ক্রীয়াশীল। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিগোষ্ঠীর সম্মিলিত সাধনায়, রবীন্দ্র অনুসরণে ও ব্যর্থতায়, নিত্যনব পরীক্ষায় ও সার্থকতায় বাঙলা কাব্যের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে—আধুনিক কাব্যমন্ত্রের দিগ্বিজয়কে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিয়াছে—একথা স্বীকার করিতে হইবে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এই যুগের কবিসমাজের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান রচনায় উক্ত আলোচনা পুস্তকখানির সহায়তা লইয়াছি।[১] কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত শুধুমাত্র রবীন্দ্র প্রভাবিতই নহেন—তিনি রবীন্দ্রভক্ত ও শিষ্য। রবীন্দ্র বন্দনামূলক একাধিক কবিতায় তাঁহার রবীন্দ্রানুগত্যের দিকটি প্রকটিত। রবিরশ্মির ব্যাপকতা ও সমারোহ সম্পর্কে প্যারীমোহন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লিখিয়াছেন—

> "গাহি তারি জয়গান, তারি জয় গাহে বঙ্গভূমি,
> আলাপে আনন্দে দুঃখে সে যে আছে সর্ব চিত্ত চুমি।
> লহ শ্রদ্ধা, লহ ভক্তি, লহ প্রীতি, লহ নমস্কার।
> হে কবি, তোমারি জয়ে সুখহর্ষে হৃদয় দুর্বার।"[২] [রবীন্দ্র-প্রশস্তি]

বস্তুতঃ বাঙলা কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিত্বই নহেন—রবীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট কাব্য পদ্ধতির প্রতীক; একটি নবীন কল্পনাভঙ্গির বিগ্রহ। ১৮৯০ হইতে ১৯৪০ অর্ধ শতাব্দীকাল বাঙলা কাব্য প্রবাহ রবীন্দ্রযুগ নামে চিহ্নিত। এই যুগে কবিমাত্রই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করাই স্বাভাবিক

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ (১৩৬৬)।
২। সন্ধ্যাতী উৎসর্গ (পৌষ ১৩০৮)।

ও অনিবার্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। রবীন্দ্র কবিমানসের জাগরণে প্রকৃতি ও জীবনের নবরূপান্তর ঘটিয়াছিল। 'জীবন স্মৃতিতে' সেই অনুভূতির অভিনব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কল্পনার অবাধ প্রসারে এবং আবশ্যকতার স্থূলভারকে মোচন করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্যচর্চার মগ্নতায় সাহিত্যের যে জন্মান্তর ঘটিয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই নতুন যুগের অধিনায়ক। রবীন্দ্রনাথের বিষয়-গৌরবহীন ভাবময়তা, নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যবিলাস, সর্বোপরি ছন্দের ধ্বনিতে পূর্ণ-অনুপম চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ-রমণীয় শ্রুতি মনোহর ভাষা—বাঙলা কাব্য সাহিত্যকে যৌব-শক্তিতে অভিষিক্ত করিয়াছিল। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন এই কাব্য পদ্ধতির মুগ্ধ উপাসক। রবীন্দ্রনাথের সেই সর্বগ্রাসী প্রতিভার কাছে তাঁহার অনুগামী কবিশিষ্যরা নিঃসন্দেহে অনুজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ প্রতিভাত হইবে। কবি প্যারীমোহন ব্যতিক্রম নহেন। তথাপি রবীন্দ্রানুগামী কবি সমাজে প্যারীমোহন নিছক প্রতিবিম্ব নন। সৎকবি বৈচিত্র্যের সমন্বিত-রূপ। আবার কবির অভিজ্ঞতাই কবিতা। এই দুইয়ের নিহিতার্থ প্যারীমোহনের কবিজীবনে ভাস্বর। তাঁহার কবিতাবলীতে রবীন্দ্রযুগের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পরন্তু প্যারীমোহনের কাব্যে যে অন্তরঙ্গ সহৃদয় সুরটি অভ্রান্তভাবে বাজিয়াছে—তাহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব। তাঁহার কবিতায় ভাবের আধিপত্য। দেশ-কাল পরিবেশকে অতিক্রম করিয়া নয়—অঙ্গীকার করিয়াই তাঁহার কবিমানসের অভিসার যাত্রা। বাঙলাদেশ, শ্যামল স্নিগ্ধপল্লী, বাঙলার নিসর্গ দেশঐতিহ্য, প্রেম-ভালবাসা, পুরাণ প্রোক্ত কাহিনী সমুজ্জ্বল ভারতীয় উপাখ্যান তাঁহার কবিতার প্রসঙ্গ। প্রকারণ রবীন্দ্রঐতিহ্যানুগ। কবিত্বে প্যারীমোহনের প্রতিভা স্নিগ্ধ— তাহা প্রখর বা দীপ্ত নহে।

৩

রবীন্দ্র-বর্জিত এই পাঠে প্যারীমোহন সেনগুপ্ত কাব্য ও ছড়ায় অন্ততঃ ১০ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। সেগুলির আনুপূর্বিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ

আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে প্যারী-মোহনের কবি চরিত্রধর্মী কাব্য গ্রন্থ 'অরুণিমা' ও 'কোজাগরী' প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি পুস্তকের দ্বারা তাঁহার কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা, নীল ক্ষেত, রমণা হইতে লিখিত মোহিতলাল মজুমদার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"একটা সুর খুব ভাল লাগল—সেটা হচ্ছে আপনার প্রকৃত কবিপ্রাণের স্বচ্ছতা ও সরলতা। এমন সরলতা আজকের দিনে বড় একটা দেখিনে। প্রাণের অকৃত্রিম অথচ সহজ উচ্ছ্বাস অতি সহজ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কোনরূপ বক্রতা বা কুটিলতা কোনখানে নেই—এজন্য পাঠকের মনকে আঘাত করে না, অতি মৃদুভাবে স্পর্শ করে। এইটিই আপনার বৈশিষ্ট্য।"[১] 'কোজাগরী' পাঠে মোহিতলালের এই পত্রখানির মধ্যে প্যারীমোহনের কবিধর্মের স্বকীয়তার দিকটি আভাষিত। কবিপ্রাণের স্বচ্ছতা-সরলতা ও অকৃত্রিমতা তাঁহার কাব্যের স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। প্যারীমোহন আমৃত্যু কবিতা রচনা করিয়াছেন। সেকালের সাময়িক পত্রগুলিতে বিক্ষিপ্ত তাঁহার বহু উল্লেখযোগ্য কবিতা আজও গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই।

তাঁহার কবিতাবলীতে রবীন্দ্রযুগের কাব্যশিল্পের অনবদ্য চারুতা, সূক্ষ্ম মণ্ডনচাতুর্যও প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু কোন গূঢ় কাব্যমন্ত্র, দুরারোহ বা দিগন্তচারী ভাবকল্পনা তাঁহার কবিতায় অনুপস্থিত। সচেতনতায় ভরপুর রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের প্রথম হোতা মোহিতলালের মত তিনি নবযুগের দামামা বাজান নাই। তাঁহার সমকালে স্বাজাত্য-সংস্কৃতির প্রতি সমগ্র দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে আগ্রহ সূচিত হইয়াছিল—অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রাম জনগণ চিত্তে যে প্লাবন আনিয়াছিল—প্যারীমোহনের কবিতায় সেই স্বদেশ প্রেমের আগ্নেয় উত্তাপ অনুভব করা যায়। যদিচ কবি তাঁহার কাব্যমন্ত্র সম্পর্কে

১। প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্র। (১৪।৭।১৯৩৩ খ্রীঃ)

নিজেই বলিয়াছেন—"কাব্যরচনা কবির নিকট আনন্দবিলাস। কোজাগরী পূর্ণিমার অমল স্নিগ্ধ আলোক—যেমন বিশ্বভুবনকে স্বপ্নসুখে বিভোর করিয়া তুলে, কাব্যলোকের বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি তেমনি কবিচিত্তকে আনন্দময় স্বপ্নের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কাব্য সৃষ্টি কবির নিকট স্বপ্নলোকে বিচরণ।"[১] আনন্দ ও স্বপ্নালোকে বিচরণ এই কবির কাব্যমন্ত্র হইলেও ঐতিহ্য ও দেশ-কালকে কবি একেবারে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। কারণ ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা গোটা জাতির নিঃশব্দ জীবনচর্যা, আশা ও নিরাশার ইতিহাস জড়ানো। তাঁহার কবিতায় দেশ জাতি ও নর বন্দনার স্তোত্রগুলিতে যে অনুভূতি বিকীর্ণ হইয়াছে স্বতঃস্ফূর্ততা তাহার প্রধান লক্ষণ। কয়েকটি নিদর্শন—

মর্মদহে অশ্রুবহে আজকে ভারত লাঞ্ছিত,
মুক্তভারত দৃপ্তভারত আজকে শাসক শঙ্কিত!
মুক্তি ব্যাকুল পরাণ আকুল এই ভারতে তৃপ্ত নয়,
যায় সে ভেসে মুক্তদেশে লুপ্ত ভারত বক্ষময়। [অতীত ভারত—অরুণিমা]

× × × ×

এস তব সৌম্য শৌর্যে, দীপ্ত বীর্যে, উদ্দাম উল্লাসে
উড়ে যাক্ মুছে যাক্ ত্রাস দ্বিধা তোমারি নিশ্বাসে;
তব তীব্র আঁখিতলে ভস্ম হোক ভ্রূকুটি নয়ন
নম্র হোক্ অন্যায়ের উত্তোলিত বাহুর নর্তন। [ছত্রপতি শিবাজী—কোজাগরী]

প্রণাম প্রণাম তোমারে মহান্ বুদ্ধি তুমি যে শিবাজী তুমি;
তোমারে প্রসবি ধন্য হয়েছে পেষণ পীড়িত ভারতভূমি। [গান্ধী-বন্দনা—কোজাগরী]

১। কোজাগরী (১৩৪০), নিবেদন।

ছন্দে তব চিত্ত নাচে, বেণুবীণা কুহুবাজে যাদুকর মোহে যেন মন—
কভু লঘু, কভু গুরু, ঝঙ্কুবাজে দুরু দুরু মাদল মৃদঙ্গ অগনণ।
অক্ষয় অক্ষয়-কীর্তি নীতি তুমি শক্তি-মূর্তি আজি তোমা করি হে
বন্দন,
হে বাংলার ভক্ত ছেলে স্বর্গ হতে হস্তমেলে ক্ষুদ্র পূজো কর হে গ্রহণ।
[সত্যেন্দ্রতর্পণ— অরণিমা]

কারাগার জয়ী বন্ধনজয়ী পেষণ বিজয়ী বীর!
শৃঙ্খলজয়ী সিংহশাবক দৃপ্ত, শান্ত, ধীর।
শোভনা বঙ্গ তোমার অঙ্গ রচেছে সুষমাধার:
কোমলা বঙ্গ চিত্ত তোমার রচেছে করুণাগার।
বাঙ্গলার কালবৈশাখী তোমা দিয়াছে বজ্রহাস,
মধুর নাদিনী বঙ্গতটিনী দিয়াছে মধুর ভাস। [সুভাষ প্রশস্তি—
জয় সুভাষ]

প্রেম-আনন্দ-ভালবাসার স্বপ্নলোকে বিচরণ প্যারীমোহনের কবিতার বৃহদংশের উপজীব্য। শান্ত সৌন্দর্যের সন্ধানে তিনি ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় পল্লীজীবনেকেই নির্ভর করিয়াছেন। প্যারীমোহনের প্রকৃতি-চেতনায় পল্লী প্রকৃতি সুগভীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য তাঁহার কবিতায় রূঢ় বাস্তবের অস্বীকৃতি। দুইটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের রুধির স্রোত, নৈরাশ্য, হতাশা এবং ক্ষত বিক্ষত মানবাত্মার আর্তবিলাপ তাঁহার স্বস্তিময় আস্তিক্যের দুর্গে অনুপ্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি এই বিপুল ভুবনের আনন্দসাগরে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন—

কক্ষে কক্ষে এ বিশ্বের কত কলরব;
আলোকের আঁধারের কত বিচিত্র বিভব

দোলাইছে প্রাণ,

গুপ্ত বিশ্বগান

শ্রবণের দ্বারে এসে হৃদে ডাক দেয়

আমারে মাতায়। [বিশ্বমিলন—অরুণিমা]

অনুজ্জ্বলতা ও কঠোরতা বিংশ শতকের জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনালব্ধ ফল তথাপি জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির মুগ্ধ আত্মরতি তাঁহার কাব্যতায় অনায়াসলভ্য। সে জন্যই তাঁহার কবিতায় জীবনের বদ্ধাঙ্কুব্ধ পরিবেশ হইতে পরিত্রান লাভের আকুতি গভরীভাবে বাজিয়াছে :

আর না আসা দুঃখশোকের ঘূর্ণিপাকে বিষম খেতে ;

আর না আসা কোলাহলের আঘাত নিতে বক্ষ পেতে ;

আর না আসা চোখের জলে করতে বরণ ভাগ্যরূঢ় ;

আর চাহিনা জানতে দুখের অন্তরেরি তত্ত্বগূঢ়। [কোজাগরী]

স্বপ্নচারী রোমান্টিক কবি প্যারীমোহন রূপতৃষ্ণায় বৈদগ্ধ্যের মানস লক্ষণ প্রস্ফুট নয়। তাহা ঐতিহ্যজর্জর ক্লান্ত রবীন্দ্র পথিক কবির নিরাপদ প্রথানুগামিতায় নিঃশেষ—

রূপের নেশায় করলে পাগল, এ নেশা-মোর ভেঙো নাকো

এই নেশাতেই নিবুক জীবন, এই স্বপ্নেই রাখো ঢাকো।

[কোজাগরী]

পুরাতনের কঙ্কালে কাব্যশ্রী আবিষ্কার প্যারীমোহনের কাব্যপ্রতিভার স্মরণীয় দিক। এই সূত্রেই ভারতসংস্কৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং ইতিহাস প্রবণতা প্যারীমোহনের কবিতাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়াছে। নিপুণ শব্দবিন্যাসে ও চতুর ভাস্কর্য কর্মে অতীত গৌরব প্রতিমাকে তিনি জীবন্ত করিয়াছেন। তাঁহার 'রামায়ণ ও মহাভারত' কর্ণ, কৈকেয়ী, গৌতমের গৃহত্যাগ, নূরজাহান প্রভৃতি কবিতাবলী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এইরূপ কবিতায় তাঁহার নাট্যধর্মী সচেতনতা ও ব্যালাডের মনোহারিত্ব ও দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়াছে। প্যারী-

মোহনের কবিজীবনের জীবন-মৃত্যু অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ভাবনা তাঁহার রস-চেতনাকে মথিত করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই বেদনা ও দুঃখও যেন রোমান্টিকতায় মণ্ডিত—

আমার বেদনা যার গর্ভে মধু দেওয়া ;
গরলে অমৃত রচে, কাঁটা ঘেরা কেয়া !
দৈন্য-দুঃখে জাগা মোর যত অশ্রুজল
অন্তরে সিঞ্চিয়া ঢালে নির্মল-শীতল। [দুঃখানন্দ—কোজাগরী]

রূঢ় বাস্তব জীবনে হতাশা-নৈরাশ্য পীড়িত কবি ঈশ্বর বিশ্বাসে বিনিঃশেষ আত্ম সমর্পণ করিয়া শান্তির প্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

হে অন্ধকার, হে পারাবার, জীবন-কাণ্ডারী,
নাও টেনে নাও, নাও গো বুকে ; সহিতে নারি পারি
এই ধরণীর কঠোর মধুর দুঃখ পেষণ কারা ;
ক্ষতের পরে দাও গো প্রলেপ, শান্তি-সুধার ধারা।
সে শান্তি দাও, মৃত্যু যদি হয় গো তাহার রূপ,
তবুও তাকে করব বরণ, সে মোর জীবন ভূপ। [অন্ধকারে—কোজাগরী]

আত্মচেতনায় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল প্যারীমোহন তাঁহার স্বপ্নে গড়া ভুবনে মৃত্যুর কঠোর সত্যকে অঙ্গীকার করিয়া নশ্বর জীবনের দীর্ঘশ্বাসে হাহাকার করিয়াছেন—

এ সুন্দর ধরা খানি, এ সুন্দর নয়।
প্রফুল্ল এ শিশুদল, পুষ্প-মনোহর,—
কেউ নয়, কিছু নয়, কেহ না আপন,
সবারে ছাড়িয়া যাব, সমস্ত বন্ধন
ছিন্ন হবে, চূর্ণ হবে, আমি নাই নাই,—
প্রীতি অনুভূতিহীন হব ধূলি ছাই। [মরিতে হবে—কোজাগরী]

প্যারীমোহন যে যুগের কবি, সেই যুগের অনিত্যতা বহু পূর্বেই সূচিত হইয়াছিল। পরিবর্তন ইতিহাসের ধর্ম, নিয়ত প্রবহমান কালের এক অমোঘ সত্য। প্যারীমোহনের জীবৎ কালেই—নবযুগের উত্তরীয় উড়াইয়া অগ্নির অমৃত-সত্তা জ্ঞানদাতা মোহিতলালের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পরিণত নজরুল, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবিবৃন্দ বাঙলা কাব্যে পালাবদলের শঙ্খ নিনাদ করিলেন। অজানা সমুদ্রে আর পাড়ি দেওয়া হইল না। প্যারীমোহনও রবীন্দ্র কাব্য কুঞ্জ হইতে বিদায় চাহিলেন—

প্রীতির শ্যাম রাখিয়া গেনু লয়ো গো লয়ো তুলি :

বিদায় নিল পাগল কবি চপল লীলাভূমি। [বিদায়—কোজাগরী]

রবীন্দ্র যুগের বহু প্রতিনিধি স্থানীয় কবির মত প্যারীমোহনের নামও একই সঙ্গে উচ্চারিত হইবার যোগ্য। তাঁহারা বাঙলাকাব্যে রূপ ও সৌন্দর্যের যে স্বপ্নময় বর্ণাঢ্য জগৎ সৃজন করিয়াছেন তাহা বাঙলা কাব্য সাহিত্যের এক প্রদীপ্ত অধ্যায়। আনন্দ কালজয়ী—ভালবাসা চিরন্তন। প্যারীমোহনের কাব্যপাঠের পরমাপ্রাপ্তি এই আনন্দ—এই ভালবাসা

৪

প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে তিনখানি অনুবাদ। তাঁহার অপর অনুবাদ গ্রন্থ 'কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়' এবং 'মহাত্মা গান্ধীর কারা কাহিনী'। বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কাব্যানুবাদে প্যারীমোহনের যথেষ্ট সুনাম আছে। এক কালে 'ঋগ্বেদ' ও 'মেঘদূতে'র অনুবাদক রূপে তাঁহার যশ ও খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম কাব্যানুবাদ 'বেদবাণী'। এই গ্রন্থেই সর্ব প্রথম তাঁহার অনুবাদ শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানির আলোচনা, টীকা, ভাষ্য প্রভৃতি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। গ্রন্থের অন্তর্গত বেদ সূক্ত সমূহের কাব্যানুবাদ প্যারীমোহনের। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল পূর্বে রচিত এই অপূর্ব গ্রন্থখানি বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের

একটি বড় অভাব পূরণ করিয়াছিল। গ্রন্থখানি ঋগ্বেদ বিষয়ক। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়—বৈদিক সাহিত্যে তাহাই দেবতা। ইন্দ্র-অগ্নি-বরুণ-অরণ্য-প্রস্তর-অশ্ব-শ্রদ্ধা-স্বপ্ন সকলই বৈদিক দেবতা। 'বেদবাণী' গ্রন্থে প্রায় প্রত্যেক দেবতার বিষয়ে অন্ততঃ একটি সূক্ত অনূদিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে একাধিক সূক্ত দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা ১০২৮ টি। এই সূক্ত সমূহের মধ্য হইতে প্যারীমোহন ৮৯ টি সূক্ত নির্বাচন করিয়া কাব্যানুবাদ করিয়াছেন। সূক্ত নির্বাচনে কবির বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা প্রশংসার্হ। সৃষ্টিতত্ত্ব, অগ্নি, ওষধি, ইন্দ্র, নদী, অরণ্যানী, গো, অশ্ব, মায়া, মন্যু, মন, দুঃস্বপ্ন, স্বপত্নি, দান, দক্ষিণা, দ্যূত, মৃত্যু, বিবাহ, পিতৃলোক, যম প্রভৃতি বিষয়ক সূক্তের সংকলন এই গ্রন্থ। তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যে এই ধরনের কোন পুস্তক ছিল না বলিলেই চলে। সাধারণ পাঠক ঋগ্বেদ পাঠ করিয়া যে সকল বিষয় জানিতে চাহেন—এ গ্রন্থে তাহা বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ হইতে চাহেন না—সমগ্র ঋগ্বেদ পাঠ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। বেদবাণী গ্রন্থে বিবৃত অনুবাদ-প্রাসঙ্গিক আলোচনা টীকা, ভাষ্য পাঠ করিলে বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে সাধারণ পাঠকের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইবে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থখানির প্রবেশক অংশে ঋগ্বেদের কাল, ঋগ্বেদের ঋষি, সূক্ত দেবতা, আর্যগণের আদি নিবাস, বৈদিক সমাজ-সভ্যতা প্রভৃতি দুরূহ ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়গুলি সরল ও মনোগ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বেদ বিবরণ টীকা ও ভাষ্য সমূহে চারুচন্দ্রের মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎ বিষয়ক প্রমাণ-পঞ্জী অনুসন্ধিৎসুগণের কাছে মূল্যবান। বৈদিক সাহিত্যের সূক্তগুলির অনুবাদে প্যারীমোহনের কবিত্ব শক্তির সহিত বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার অনায়াস অধিকারের দিকটি প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার এই অনুবাদ মূলানুগ-স্বচ্ছন্দ ও সরল। সাবলীলতা প্যারীমোহনের অনুবাদের অন্যতম প্রসাদগুণ। এই অনুবাদ সম্পর্কে ১৩৩০

বঙ্গাব্দে ২২ শে অগ্রহায়ণ তারিখে সিলেট হইতে প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—"...অনুবাদে মূলের ভাব এমনি অক্ষুণ্ণ আছে যে আমি অনেক সময়ে খুবই বিস্ময় এবং আপনার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা বোধ করেছি। সত্যেন্দ্রবাবু ছাড়া আর কেউ কাব্য অনুবাদে এমন দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। অনুবাদ যে ঠিক হয়েছে এইটিই আপনার সবচেয়ে বড় নৈপুণ্য। অনুবাদে নিজের কবিত্ব প্রকাশের ত অবকাশই নেই। তবু তাকে সুন্দর করে প্রকাশ করা সুন্দর শব্দ, ও ভাষার সুপ্রয়োগে ও ছন্দের ব্যবহার করে আপনি অনুবাদকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।"[১] 'বেদবাণী' প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিমতটিও স্মরণ যোগ্য। "নিজের বেদ নাই, বাঁকুড়া শহরেও নাই। কি করি ভাবছি। এমন সময় 'বেদবাণী' দেখলাম। দেখলাম চারুবাবু কি আশ্চর্য সংগ্রহ করেছেন। আপনার পদ্য অনুবাদও চমৎকার হয়েছে। এই দুটি জড়িয়ে বেদ ঘাঁটার ফল দিয়েছে। আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে আপনাদের দুজনের পরিশ্রম ও বিবেচনার প্রশংসা করতে এই পত্র। বোধ হয় লোকে জানে না 'বেদবাণী' ছোট খাট বেদই বটে।"[২] এখানে প্যারীমোহনের যুক্ত অনুবাদের একটি আদর্শ উপস্থিত করা হইতেছে।

কোন সে দেবতা

[ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল ১২১ সূক্ত ঃ প্রজাপতির পুত্র হিরণ্যগর্ভ ঋষি]

ছিলেন স্বর্ণগর্ভ সেজন সৃষ্টিমূলে
সকল সৃষ্টভূতের অধীন বিশ্বকুলে।
দ্যুলোক ভূলোক আপনার স্থানে স্থাপিল সবি
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি ? ১॥

১। প্রবোধচন্দ্র সেনের অপ্রকাশিত পত্র। (২২।৮।১৩৩০ বঙ্গাব্দ)।
২। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির অপ্রকাশিত পত্র। ২০।১।১৩৩০ বঙ্গাব্দ)।

আত্মা যে দেয়, শক্তি যে দেয়—বিশ্বধোয় ?
সকল দেবতা যে করে শাসন সবার শ্রেয়।
অমৃত মৃত্যু যাহার দুইটি ছায়াছবি
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি ? ২॥
কম্প্রসজীব জংগমাস্থির যেজন পতি
স্বীয় মহিমায় অদ্বিতীয় যে মহান অতি
যে জন পালেন দ্বিপদ চতুষ্পদ ও গবী
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি ? ৩॥
দ্যুলোকে, ঊর্ধ্বে তুলিল, ধরায় করিল স্থির,
স্বর্গ আকাশ যেজন করিল স্তব্ধ ধীর
অন্তরীক্ষে দীপ্ত বিমান সম যে কবি
কোন সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি ? ৫॥
ওহে প্রজাপতি বিশ্বের জাত বস্তু যত
তুমি ছাড়া কেবা ধরিবে, করিবে নিয়মগত ?
যে কামনা মোরা নিবেদি তোমায় এ হবি দিয়া
পূর্ণ কর তা, ধনপতি কর পুরায়ে হিয়া। ১০॥

৫

'মেঘদূত' তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কাব্যানুবাদ। 'মেঘদূতের কবি'—এককালে ইহাই ছিল তাঁহার পরিচিতি। সংস্কৃতের কাব্যানুবাদে প্যারীমোহনের দক্ষতা ও কৃতিত্বের দিকগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতে পারে। কালিদাস সংস্কৃত-সাহিত্যের অমর কবি। কল্পনার মহিমা, ভাষার ছটা। শিল্পের নৈপুণ্য, বাঁধুনির কারিগরীতে তাঁহার তুলনা নাই। 'মেঘদূত'

মহিমাময় ও রমণীয় কাব্য। এ-পর্যন্ত 'মেঘদূতে'র প্রায় পঞ্চাশখানি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন টীকার পাঠ বৈলক্ষণ্য ও শ্লোকসংখ্যার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সর্বাধিক প্রচারিত ও প্রচলিত মল্লিনাথের (চতুর্দশ শতক) সঞ্জীবনী টীকা। এই টীকায় ১২১টি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। কাশ্মীরবাসী বল্লভদেব (দশম শতক) এবং দাক্ষিণাত্যবাসী দক্ষিণাবর্তনাথ (দ্বাদশ শতক) 'মেঘদূতে'র বিশিষ্ট টীকাকার। জৈনকবি জিনসেনের (৭৮৩ খ্রীঃ) মেঘদূতের টীকাও প্রসিদ্ধ। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত E. Hultzsch মূলসহ বল্লভদেবের টীকা সম্পাদনা করিয়া লণ্ডন হইতে প্রকাশ করে। ইহাতে ১১১টি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ত্রিবান্দ্রাম হইতে মূলসহ দক্ষিণাবর্তনাথের ১১০টি টীকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত টীকা প্রচারিত হইবার অনেক পূর্বে কেবলমাত্র শ্লোকের পাঠ বিচার করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নাগরী হরফে 'মেঘদূতের' এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে ১১৫টি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে Horace Hayman Wilson কলিকাতা হইতে 'মেঘদূত' কাব্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাই য়ুরোপীয় ভাষায় 'মেঘদূতে'র প্রথম অনুবাদ। ইহাতে ১১৬টি শ্লোক ছিল। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙলা ছন্দে 'মেঘদূতে'র অনুবাদ প্রকাশ করেন। বহু পূর্বে সিংহলী ও তিব্বতী ভাষায় 'মেঘদূতে'র অনুবাদ হইয়াছিল। বাঙলা কাব্যছন্দে এ পর্যন্ত 'মেঘদূতে'র বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

বাঙলা দেশে 'মেঘদূতে'র প্রচলিত পাঠকে প্যারীমোহন নির্বিচারে গ্রহণ করেন নাই। মল্লিনাথের 'সঞ্জীবনী' ধৃত পাঠই এদেশে বহুল প্রচলিত। প্যারীমোহন পাঠ সংস্কার কার্যে প্রধানত বল্লভদেব ও জিনসেন ধৃত পাঠকেই

গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার উপরে মল্লিনাথ ধৃত পাঠগুলির ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। 'মেঘদূতে'র পাঠ সংস্কার এবং অনুবাদের সৌকর্য সাধনে প্যারীমোহন ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের অকৃপণ সহায়তা পাইয়াছিলেন। এ দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'মেঘদূতে'র অনুবাদ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 'মেঘদূতে'র ধ্বনি রূপকে যথাযথ প্রতিফলিত করা সম্ভব নয়। ধ্বনি গাম্ভীর্য ও যতি মন্থরতাই মন্দাক্রান্তার মর্মস্বরূপ। স্বরবৃত্ত ছন্দেও মন্দাক্রান্তার ছন্দ সঙ্গীত রক্ষিত হয় না। মাত্রাবৃত্তই মন্দাক্রান্তার উপযুক্ত বাহন। 'মেঘদূতে'র মুখবন্ধ 'কালিদাস ও মেঘদূত' শীর্ষক নিবন্ধটিতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙলা কবিতার ছন্দে সংস্কৃত কাব্যানুবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাঁহার মতে কাব্য ধ্বনিময় গদ্য ছন্দ ব্যতীত সংস্কৃত-কাব্যের গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে অর্থকে প্রাঞ্জল করা যাইতে পারে—কিন্তু ধ্বনি সংগীত রক্ষা করা যায় না। অথচ সংস্কৃত কাব্যে ধ্বনিসংগীত, অর্থসঙ্গীত অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নয়। মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আট-সাত-সাত-চার মাত্রার নির্দেশ দিয়াছিলেন। সংস্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুবর্তনের কথাও বলিয়াছিলেন।[১] প্যারীমোহন 'মেঘদূতে'র অনুবাদকালে ত্রিসপ্ত-পঞ্চমাত্রিক ছন্দের আশ্রয় লইয়া ছন্দ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। মন্দাক্রান্তার গতি ভঙ্গি ও ধ্বনি সংগীত অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে। প্যারীমোহনের পূর্বে এদেশে প্রচলিত 'মেঘদূতে'র অনুবাদগুলিতে অনুবাদকেরা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে সংযোজন ও সংকোচন করিয়াছেন। এইরূপ সংযোগ-বিয়োগে অনুবাদের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এক জিনিস নয়। এদেশে 'মেঘদূতে'র অনুবাদরূপে প্রচলিত কোন পুস্তকই আদর্শ অনুবাদ নয়। কবির বক্তব্য

১। রবীন্দ্রনাথ। ছন্দ (পরিবর্ধিত সং, ১৯৬২) প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র (১৩ মার্চ ১৯৩১

বিষয়কে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ধন ও সংকোচন করাকে অনুবাদ বলা যায় না। এই দিক হইতে প্যারীমোহন সেনগুপ্ত কালিদাসের মূল কথাকে সুন্দররূপে বাঙলায় ফুটাইয়াছেন। মূলের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে অনুবাদেরও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙলায় 'মেঘদূতে'র সমালোচক-পদ্যানুবাদক ও ভাষ্যকারদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম চিরস্মরণীয়। তিনি বহুপূর্বে 'মেঘদূতে'র সমালোচনা করিয়াছিলেন।[১] তাঁহার অনুবাদও ব্যাখ্যা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ।[২] প্যারীমোহন 'মেঘদূতে'র যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার দুই একটি শ্লোক উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বেণীভূতপতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥ ২৯॥ পূর্ব মেঘ

সিন্ধু তটিনীর সলিল-ধারা যেন বেণীর সম ক্রমে হ'য়েছে ক্ষীণ;
তটের তরু হতে জীর্ণ পাতা ঝরি' হয়েছে দেহ তার অতি মলিন।
তোমারি বিরহেতে মলিনা সে তটিনী, তুমি যে পতি তার ভাগ্যবান;
'বপুল বরিষণে কৃশতা নাশি' তার করিও তারে তুমি কান্তিদান ২৯'পূর্ব মেঘ

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১॥ উত্তর মেঘ

সেথা যেই তরুণী কৃশ-তনু তরুণী হরিনাভা দশনগুলি যেন মুকুতা-সার,
বিম্বাধরা যেবা, বিরাজে মাঝ'টি অতি ক্ষীণ, চকিত হরিণীর নয়ন যার,

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মেঘদূত, বঙ্গদর্শন, কার্তিক ও পৌষ ১২৯৩
২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মেঘদূত ব্যাখ্যা (১৩০৯)

গভীর নাভী, তনু স্তনেতে কিছু নত, শোণীর ভারে ধীরে অলস যায়,
ধাতার গড়া যেন প্রথম যুবতী সে আমার প্রিয়তমা অতুলা ভায়।

২১।উত্তর মেঘ

তাঁহার 'মেঘদূতে'র শ্লোক সংখ্যা ১১৭। অনুবাদে মূলের ধ্বনি বজায় রাখিবার জন্য কবির প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য। তিনি এক একটি শ্লোককে সুবিধা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের আশ্রয়ে গ্রহণ করেন নাই। ফলে অনুবাদ বিকলাঙ্গ হয় নাই। এই অনুবাদ সম্পর্কে ছন্দ শাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"প্যারী বাবু প্রত্যেকটি শ্লোকের এই অনুবাদকেও চারিটি চরণেই সমাপ্ত করিয়াছেন। তাতে অনুবাদ ভাষ্যভাবাপন্ন হইয়া উঠে নাই এবং কালিদাসের ভাবটি অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া চার চরণের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সংহত হওয়ায় মূলের মতই গাঢ়তা পাইয়াছে ; আর অনুবাদক ও মূলের কথার সঙ্গে নিজের কথা যোগ করা অপ্রীতিকর দায় হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।"[১]

ঢাকা, রমণায় সুশীলকুমার দে-র বাসভবনে এক সাহিত্য মজলিসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য, প্রমুখ বিদগ্ধজনেরা প্যারীমোহনের 'মেঘদূতে'র ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই মজলিসে কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার প্যারীমোহনের অনুবাদের সফলতা সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন এই অনুবাদ মূল মন্দাক্রান্তার খুব কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে।[২] প্যারীমোহনের জীবৎকালেই 'মেঘদূতে'র দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে। এই সংস্করণে অনুবাদের সংস্কার ও সৌকর্য সাধনের প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। প্যারীমোহনের 'মেঘদূত' সম্পর্কে তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাময়িক

১। প্রবোধচন্দ্র সেন : কালিদাস ও মেঘদূত (প্যারীমোহন কৃত মেঘদূতের মুখবন্ধ রচনা) পৃ ৩৩

২। প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পত্র। (তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৯৩১)

পত্রগুলিতে বহু সমালোচনা নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'পত্র পুষ্প' (বৈশাখ ১৩৩৮) এবং 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় প্যারীমোহনের 'মেঘদূতে'র মনোজ্ঞ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। সুনীতিকুমারের সমালোচনার কিয়দংশ বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য: Mr. Sengupta's rendering of the whole is faithful and reads smooth and clear in the Bengali: and frequently the words of the original are retained, giving some illusion of the original. I am inclined to think that this is quite a good translation in Bengali verse of the original and am tempted to say that so far it seems to me to be the best"[১]

৬

প্যারীমোহনের কবি-প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যের আর একটি শাখাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। শিশু ও কিশোর সাহিত্যের কথা বলিতেছি। শিশুদের হাতে তিনি তুলিয়া দিয়াছেন রাশি রাশি ছবি-ছড়া ও গল্প। শিশুসাহিত্যে তাঁহার দানের অজস্রতা উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁহার বিদ্যালয় পাঠ্য শিশু পাঠ্য পুস্তকগুলির কথা বাদ দিলেও শিশু সাহিত্য পর্যায়ের অনেকগুলি পুস্তকের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই শ্রেণীর পুস্তকগুলির মধ্যে খাঁটি বাঙলা বুলিতে—ছড়ার ভঙ্গিতে এবং সরল পদ্যে রচিত পুস্তকগুলি সবিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। William H. G. Kingstone-এর Adventure in Africa অবলম্বনে লিখিত 'কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়' পুস্তকখানি কিশোর সাহিত্যের আনন্দভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। বাঘসিংহের মুখে, অদ্ভুত জীবজন্তু, ভূতে রাক্ষসে, শালিকের গঙ্গাযাত্রা, শেয়াল কবিরাজ, ভূতের লড়াই,

১। 'Modern Review' August. 1931.

ভীষ্ম প্রভৃতি কিশোর পাঠ্য পুস্তকগুলি সম্ভব অসম্ভব, আশা কল্পনার রঙিন গল্পে উদ্বেল শিশু-কিশোর হৃদয়ে অনুপম মায়াজাল এবং রহস্যের ঐকতান সৃষ্টি করে। হালুম বুড়ো, লক্ষ্মীছেলে, মজার পদ্য, বেড়ালের ছড়া, কেবল মজা, জয়হিন্দের অ-আ-ক-খ—ছড়াধর্মী এই পুস্তকগুলি বাঙলা শিশু সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শিশুর মনের গোপন কোণে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমা থাকে—তাহার চিত্তাকাশে যে কুহেলিকা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে অন্ধকার তারার মত নানা বর্ণের আকাশকুসুম ফুটিয়া থাকে—শিশু সাহিত্যিকের কাজ সেই দিগন্তবিস্তৃত বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাঁহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করা। প্যারীমোহন তাঁহার কবিদৃষ্টি ও স্বচ্ছন্দ লিখনশৈলীকে আশ্রয় করিয়া, কল্পনা শক্তিকে উন্মেষিত করিয়া শিশুচিত্তের বিশালতর রাজ্যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের সুখ অনুভব করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার সৃষ্ট এই মায়াময় জগৎ বাঙলা শিশু সাহিত্যে কল্পনার বিদ্যুৎ বিলাস স্ফুরিত করিয়াছে। এখানে উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনার অবকাশ কম। কেবলমাত্র ছড়াধর্মী সরল পদ্যগুলি হইতে দুইএক ছত্র উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ঘুমোয় ঘুমোয়, লক্ষ্মী ঘুমোয় এই।
লক্ষ্মী ছেলে কয়না কথা, কোন বালাই নেই
নেইক বালাই, নেইক জ্বালাই, লক্ষ্মী ছেলেটি।
চিংড়ি মাছের ঝোল খেয়েছে আর খেয়েছে কি?

[দুষ্টু ঘুমোয়/হালুমবুড়ো]

গাছে গাছে নাহি সাড়্
গুঁড়ি মারে ঝোপ ঝাড়্
ধরা ভাবে নাহি আর
ভরসা।

চারিদিক থম্ থম্
জল পড়ে ঝম্ ঝম্
ধরা খানি গম্ গম্
সরসা। (ঝুপ্ ঝুপ্ বরষা/হালুম বুড়ো)

সকাল বেলা ছাতের ওপর এসে করলেন—কা!
গুপ্‌সে কার্ণিশেতে নেমে বললেন—বা।
এধার ওধার ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে ট্যারা চোখ
দেখে নিলেন আছে কিনা গোলমেলে কোন লোক।
(কলকাতার কাক/লক্ষ্মীছেলে)

মোটেই তা নয় মোটেই তা নয়,
তোমরা হবে বড়।
তোমরা হবে শক্ত মানুষ
সকল কাজে দড়।
এমনি মজায় কাটবে না দিন;
এমনি হেসে নয়।
তোমরা হবে যুবক নারী
প্রবল শক্তিময়। (মানুষ হবে/কেবল মজা)

বাঙলা শিশু সাহিত্য বিষয়ে ইদানিং বিস্তর গবেষণা হইতেছে। নানা ধরণের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বলা প্রয়োজন এইরূপ শিশু সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস বা গবেষণা পুস্তকে বহু কৃতবিদ্য লেখকের যথাযোগ্য স্থান নিরূপিত হয় নাই। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও আশা দেবীর মূল্যবান গ্রন্থ দুইখানির কথা মনে পড়িতেছে। এই দুইখানি গ্রন্থের ইতিহাস আলোচনায় প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কোন উল্লেখ নাই। তৎসত্ত্বেও বাঙলা শিশু সাহিত্যে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের-মায়াময় স্পর্শটি বিস্মৃতি যোগ্য নয়।

৭

রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্যে কবি হিসাবে প্যারীমোহনের প্রসিদ্ধি থাকিলেও সাহিত্যের বহুধা ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করিয়াছেন। জীবনী, নিবন্ধ সমালোচনা, সরস রচনা, গল্প এবং সংবাদপত্রাশ্রয়ী নানা ধরণের রচনা কার্যের সহিত তিনি আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে প্যারীমোহনের অবদান নির্ণয় কালে ঐ শ্রেণীর রচনাসমূহের কথাও স্মর্তব্য। সাধারণভাবে প্যারীমোহন সমকালীন বাঙালী পাঠক সমাজে যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিহিসাবে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের শক্তির অভাব ছিল না। রবীন্দ্রানুগামী বাঙলাকাব্যের ধারাকে যাঁহারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন নিঃসন্দেহে প্যারীমোহন তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু দীর্ঘায়ু না হওয়ায় তাঁহার সৃষ্টির পরিণত ফসল হইতে বঙ্গসাহিত্য বঞ্চিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত প্রায় সারা জীবন জীবিকান্বেষণে সাময়িক পত্রে সাহিত্যের কর্মে এবং অধ্যাপনায় বহু সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। স্থায়ী সৃজনাত্মক সাহিত্যে তাঁহার অবদান তাঁহার প্রতিভার তুলনায় স্বল্পতর হইয়াছে। প্যারীমোহনের জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে এতাবৎ কোথাও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। তাঁহার রচিত পুস্তক সমূহ এই স্বল্পকাল মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্যারীমোহনের মত প্রায়-বিস্মৃত সাহিত্য সেবকদের স্থান নির্দেশ সাহিত্য ইতিহাসের দিক হইতেও প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা ঃ

প্যারীমোহন সেনগুপ্তের রচিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও তাঁহার বিপুল সংখ্যক কবিতা, নিবন্ধ সমালোচনা, রস রচনা প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত

তাঁহার সম্পূর্ণ রচনার তালিকা প্রণয়ণ করা সুসাধ্য নহে। প্যারীমোহন 'সত্যানন্দ' ছদ্মনামে প্রবাসীতে এবং 'কমলাকান্ত' ছদ্মনামে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে কিছুকাল গ্রন্থ সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ বহু রচনার মধ্যে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ তালিকার আকারে নিম্নে প্রদত্ত হইল। তালিকার অধিকাংশই কবিতা, অন্য রচনা সমূহের পাশে 'প্রবন্ধ', 'রসরচনা', 'গল্প' প্রভৃতি লিখিত থাকিবে।

প্রবাসী

মিলন	শ্রাবণ ১৩২৬
বিলাতে যুদ্ধকার্যে ভারতবাসী। (প্রবন্ধ)	অগ্রহায়ণ ১৩২৬
বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা (প্রবন্ধ)	ফাল্গুন ১৩২৬
বিলাতে শিশু বিদ্যালয় (প্রবন্ধ)	চৈত্র ১৩২৬
জীবন রহস্য	চৈত্র ১৩২৬
দুখের সুর	আশ্বিন ১৩২৭
বিশ্ব ও মানুষ	মাঘ ১৩২৭
জীবন লীলা	ফাল্গুন ১৩২৭
মেঘের পাশে রোদ	বৈশাখ ১৩২৮
কলিকাতার দুপুর	বৈশাখ ১৩২৮
খোকার হাটিন	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮
মুক্ত জ্যোৎস্নায়	আষাঢ় ১৩২৮
বর্ষার চড়ুই	শ্রাবণ ১৩২৮
দুর্দম জীবন	মাঘ ১৩২৮
মেঘলা সকাল	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০
বিদ্রোহী কবি মধুসূদন	ফাল্গুন ১৩৩০

নীল আকাশ	আশ্বিন ১৩৩৩
দীনবন্ধু এনড্রুজ	বৈশাখ ১৩৪৭
গ্রামের ডাক	আষাঢ় ১৩৪৮
আলোর আভাস	আশ্বিন ১৩৪৮
পাতা ও ঝড়	আষাঢ় ১৩৪৯
কঠোর করুণ	আষাঢ় ১৩৪৯
রামানন্দ বন্দনা	পৌষ ১৩৫০

মানসী ও মর্ম্মবাণী

রবীন্দ্রনাথের উর্বশী (প্রবন্ধ)	বৈশাখ ১৩২৬

নারায়ণ

স্বদেশ বোধন	মাঘ ১৩২৮

পার্বণী

বাদলা	১৩২৮

ভারতী

বুদ্ধ	ভাদ্র ১৩৩১
গান্ধী	আশ্বিন ১৩৩১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	মাঘ ১৩৩২
শক্তিভিক্ষা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

বাঁশরী

ভারতবর্ষ	আশ্বিন ১৩৩০
শহরের গাছ	অগ্রহায়ণ ১৩৩০

উদ্বোধন

শক্তিক্ষণ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

শক্তি

প্রভাতবরণ	২৬শে শ্রাবণ ১৩৩২
চিঠি	৮ই ভাদ্র ১৩৩২
শক্তি	৫ই আশ্বিন ১৩৩২
জননী ভারত	মাঘ ১৩৩২
মধুসূদন	ভাদ্র ১৩৩৪

পল্লীবাসী

বঙ্কিমচন্দ্র	২৪শে ভাদ্র ১৩৩২
চৈতন্য	মাঘ ১৩৩২

প্রবর্তক

যৌবনে	ভাদ্র ১৩৩২
শক্তিমন্ত	ভাদ্র ১৩৩৩
স্বাধীন	কার্তিক ১৩৩৮
শক্তিমান	ভাদ্র ১৩৪১
তাকিয়া জয়ন্তী	আশ্বিন ১৩৪২
সকালে	বৈশাখ ১৩৪৩
বিশ্ববিলীন	আষাঢ় ১৩৪৩
কাকের ডাক	ভাদ্র ১৩৪৩
গ্রামের বুকে	শ্রাবণ ১৩৪৫
ঘনবর্ষা	অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
ছিন্নমুকুল	জ্যেষ্ঠ ১৩৪৭
আশুতোষ স্মৃতি	আষাঢ় ১৩৪৭
আহত ইউরোপ	আশ্বিন ১৩৪৭
জলপথিক	বৈশাখ ১৩৪৮

কালিদাস	ভাদ্র ১৩৪৮
প্রকৃতির ঘরে	বৈশাখ ১৩৫২

কুশদহ

সাহিত্য ও জীবন (প্রবন্ধ)	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮
বিশ্ববিলীন	শ্রাবণ ১৩২৮

বিজলী

মহাভারত	বৈশাখ ১৩২৯

যুগান্তর

যুগান্তরে	বৈশাখ ১৩৩০

পঞ্চপ্রদীপ

ভারত গৌরব	শ্রাবণ ১৩৩২

বাসন্তিকা (ঢাকা)

শ্রীকৃষ্ণ	১৩৩৩

কেতকী

কেতকী	আশ্বিন ১৩৩৪

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা

বাঙালীবীর রমেশচন্দ্র	১৩৩৪
গড়াই ও পদ্মা	১৩৫৩

বঙ্গলক্ষ্মী

প্রেমের আলো	অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
বাদলে	অগ্রহায়ণ ১৩৪০
কঠোর জগৎ	চৈত্র ১৩৪১

মৌচাক

আকাশে	শ্রাবণ/ভাদ্র ১৩৩৬
ভাই কোথায় ?	আশ্বিন ১৩৪৭

আজকাল

ব্যথিত	বৈশাখ ১৩৩৯
গিরিশ প্রশস্তি	আষাঢ় ১৩৪০

দীপিকা (কুষ্ঠিয়া)

প্রাণ যায়	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯
বরষায়	শ্রাবণ ১৩৩৯

বিচিত্রা

শরৎচন্দ্র	চৈত্র ১৩৩৮
ব্যথাতুর	বৈশাখ ১৩৩৯
ঝড়-বাদলে	মাঘ ১৩৩৯
বর্ষামেঘ	শ্রাবণ ১৩৪০
বিচিত্রজীবন	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১
পল্লী ও নগর	অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
রৌদ্র সমুদ্র	আশ্বিন ১৩৪৩
দুইটি শালিক	কার্তিক ১৩৪৪

ভারতবর্ষ

প্রভাতে	ফাল্গুন ১৩৩৮
বর্ষাসমাগমে	আষাঢ় ১৩৩৯
বর্ষাতৃপ্ত	ভাদ্র ১৩৩৯
প্রেমের রহস্য	অগ্রহায়ণ ১৩৪০
মা	বৈশাখ ১৩৪১
বর্ষামুক্তা	আষাঢ় ১৩৪১
সার্থক প্রেম	ভাদ্র ১৩৪১

ভারতবর্ষ

বিচিত্রা ধরণী	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২
রবীন্দ্রমঙ্গল	আশ্বিন ১৩৪৮
সূর্য-স্তুতি	চৈত্র ১৩৪৮
ব্যর্থ জীবন	বৈশাখ ১৩৫০
নদীতীরে প্রভাত	ভাদ্র ১৩৫০
দুখের গান	১৩৫১
ঝড় আর জলে	আষাঢ় ১৩৫২
রণতাণ্ডব	ভাদ্র ১৩৫২
এস সুভাষ	বৈশাখ ১৩৫৩

দেশবন্ধু

বঙ্কিমচন্দ্র	ভাদ্র ১৩৩৮

পঞ্চপুষ্প

বঙ্গভারতী	শ্রাবণ ১৩৩৮
জ্ঞানসিন্ধু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	কার্তিক ১৩৩৮
রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ)	মাঘ ১৩৩৮
ঝড়-বৃষ্টি	আষাঢ় ১৩৩৯

মাসিক বসুমতী

দিগ্বিজয়ী	শ্রাবণ ১৩৩৯
চণ্ডীদাস	পৌষ ১৩৩৯
রামকৃষ্ণ পরমহংস	ফাল্গুন ১৩৪১
শীতের দুপুর	মাঘ ১৩৪৩

নারী	পৌষ, ১৩৪৪
দুঃখী	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫
পল্লী জ্যোৎস্না	ফাল্গুন, ১৩৪৫
ভিখারিনী	মাঘ, ১৩৪৬
জাগ্রত ভারত	ভাদ্র, ১৩৫৩

অভ্যুদয়

প্রেমের জাগরণ	ভাদ্র, ১৩৪০

নবারুণ

স্বর্গস্মৃতি	ভাদ্র. ১৩৪০

প্রবুদ্ধ ভারত

পথে পথে মরনু ঘুরে	বৈশাখ, ১৩৪১

উদয়ন

মানসী ও প্রেয়সী	বৈশাখ, ১৩৪০
আকাশে ও ধরায়	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০
প্রেমকম্পন	ভাদ্র, ১৩৪১

রিক্তা

বঙ্গজননী	পৌষ, ১৩৪১

বঙ্গশ্রী

বঙ্কিমচন্দ্র	মাঘ, ১৩৪১	
চাঁদের গান	অগ্রহায়ণ, ১৩৫০	
পঞ্চাশের মন্বন্তর	মাঘ, ১৩৫০	
দুঃসময়	১৩৫১	মাস পাওয়া যায়নি
বর্ষাসন্ধ্যা	১৩৫১	
আমার দেশ	আষাঢ়, ১৩৫৪	

শ্রীহর্ষ

বরষায় আশ্বিন, ১৩৪৩

তপোবন

বনের বুকে ফাল্গুন, ১৩৪৩

সংহতি

বাহিরের ডাক আশ্বিন, ১৩৪৪
গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও কর্তব্য (প্রবন্ধ) মাঘ, ১৩৪৫
জগতের ছবি কার্তিক, ১৩৪৬
অকূলের পানে ফাল্গুন, ১৩৪৭

উত্তরায়ণ

চারুবন্দনা মাঘ, ১৩৪৫

সচিত্রভারত

নমস্কার মহিমা (রসরচনা) ১২ চৈত্র, ১৩৪৪
নারীমঙ্গল (রসরচনা) ৩১ শে বৈশাখ, ১৩৪৫

'বঙ্গবাসী কলেজ' ম্যাগাজিন

পাত্রবন্দনা (রসরচনা) ১৯৪৪-৪৫
বর্ষামুখ আশ্বিন, ১৩৪৭

ছন্দা

চাঁদের আলো অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

Oriental Illustrated weekly

The tailess giant (story) Nov. 6, 1938

বৈজয়ন্তী

কে এনেছে ? মাঘ, ১৩৪৬

মঞ্জুশ্রী

কে জাগিবে	কার্তিক, ১৩৪৬

শ্রীরামপুর সমাচার

তোমার দান	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

মৌচাক

ভাই কোথায়	আশ্বিন, ১৩৪৭

কৈশোরক

সুন্দর গ্রাম	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
ক্ষুধিত শিশু	বৈশাখ, ১৩৫১

শাশ্বত (পাটনা)

বর্ষার ছবি	শ্রাবণ, ১৩৪৭

বিশ্ববাণী

বঙ্গগঠক বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)	মাঘ ১৩৪৭

দেশ

দানব ও দেবতা	২, কার্তিক, ১৩৪৭	
নদী ও চাঁদ	১৯, মাঘ, ১৩৪৭	
শিখা স্মৃতি	আষাঢ়, ১৩৪৬	তারিখ পাওয়া যায় নি
আর্তনাদ	শ্রাবণ ১৩৫১	

রূপ ও রীতি

সাগরে ও গঙ্গায়	আশ্বিন, ১৩৪৮

দৈনিক বসুমতী

বাবু ব্যারাম (রস রচনা)	১২, কার্তিক, ১৩৪৯
বন্ধ মঙ্গল (রস রচনা)	২৯, কার্তিক,১৩৪৯

স্বদেশ

ক্ষুধিত বাঙালী	চৈত্র ১৩৫১

শারদীয়া যুগান্তর

ধরনীর জাগরন	১৩৫৩

হিন্দুস্থান (দৈনিক)

স্বাধীন ভারত	শারদীয়া ১৩৫৩
হেমচন্দ্রের প্রতিভা (প্রবন্ধ)	১লা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

শিশু সাথী

কার্মাটারের চিঠি	বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৫৪

রাঙা রাখী

দুষ্টু হবে	বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৫৪

আর্য

অতৃপ্ত বাসনা	পূজা বার্ষিকী, ১৩৫৬
জীবন সখা	পূজাবার্ষিকী, ১৩৫৬

দৈনিক কৃষক

কাগজ বন্দনা

রচনার নিদর্শন

প্যারীমোহনের রচনার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার লিখিত কয়েকটি কবিতা, প্রবন্ধ ও রস রচনা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল। নিম্নোদ্ধৃত প্রথম কবিতাটি সম্পূর্ণ। তাঁহার বহু সুরচিত কবিতা নিবন্ধ-রচনা অধুনালুপ্ত সাময়িক পত্রের ধুলিধূসর পৃষ্ঠার মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। স্বল্পসান অধ্যায়ে তাহার সম্যক আস্বাদ এক প্রকার সুদূর পরাহত।

বঙ্গ ভারতী

বঙ্গ ভারতী করিছে আরতি আজিকে তোমারে দীনের দল,
লহগো প্রণতি, শ্রদ্ধা ভকতি, লহগো হর্ষ, অশ্রুজল।

তোমারি পূণ্য দেউল ধন্য, তারি বেদীতলে তুলিয়া তান
গাহিব-জয়তু ভারতী মহতী, তুমিই দেবতা তুমিই প্রাণ।
আশা উল্লাস, প্রীতি উচ্ছ্বাস, বাসনা বেদনা তোমাতে লীন ;
তুমি গো ধন্য, জানিনা অন্য দেবতা আমরা তোমা বিহীন।
অম্লান তুমি, তব পীঠভূমি হোক অম্লান সর্ব্বকাল ;
সেবক চিত্তে ভকতি বিত্তে করুক দেউলে আরো বিশাল।
বঙ্গ ভারতী, লহগো আরতি, শ্রদ্ধা, হর্ষ, অশ্রুজল ;
এসেছে বিনত শতেকভক্ত চরনাসক্ত সেবক দল।
শৈশবকালে জননীর কোলে করেছি আমরা স্তন্য পান ;
জননীর স্নেহে পরানু এ দেহে যবে অসহায় স্বল্পপ্রাণ,
এল যৌবন, সকল ভুবন বিভবে বিলাসে মোহনভায়,
চিত্ত আকুল ছাপিয়া দুকূল চলে বাধাহীন যে দিকে চায়।
ঐশ্বর্য্য-বিহীন চিত্তে সেদিন তব পদতলে করিলে বশ ;
হে বাণী অতুলা, কি জ্যোতি বিপুলা দেখালে, দানিলে কি সুধারস !
যবে অসহায় ছিনু ক্ষীণকায় বাঁচাল জননী স্তন্যাধার ;
যুবক চিত্ত যখন মত্ত দেখালে তোমার স্বর্ণদ্বার।
আজিকে সভার চরণ আগারে এসেছি তোমার বেদীর তল ;
বঙ্গ ভারতী, লহগো প্রণতি, করিছে আরতি সেবক দল।
সেবক পূজিছে, সেবক গাহিছে-জয় শুধু তব, তোমারি জয়।
সকলি বিলোপ হউক-কি ক্ষোভ ? তোমারি সেবায়
দেহেরি লয়।

হে দেবী তোমার গড়েছে আগার যারা তারা নহে অর্থবান।
বিভব বিহীন দীনতমদীন গড়েছে দেউলে সঁপি পরাণ।

মানব ইন্দ্র দীন রামেন্দ্র, দীন ব্যোমকেশ অস্থি দ্যায় ;
তাদেরি শোণিতে রচি, চারিভিতে বাণীমন্দির আজি দাঁড়ায়।
জননী ভারতী, তব প্রেম প্রীতি দীন সন্তানে নিয়ত দাও ;
যাহারা রিক্ত তাদের চিত্ত সুষমা সুবাসে তুমি পুরাও।
বঙ্গ ভারতী তোমারি আরতি তাইত করিছে দীনের দল
লহগো প্রণতি; শ্রদ্ধা, ভকতি, লহগো হর্ষ অশ্রুজল।
হে বাণী দেউল, পুণ্যে অতুল, ওহে পরিষৎ নমস্কার।
তিমির নাশন বিদ্যা-আসন ভাবের জ্ঞানের শুদ্ধাগার।
বঙ্গ হৃদয় সরসে উদয় হয়েছ তুমি যে কমল প্রায়,
কমল উপরে ভারতী আদরে চরণ রাখিয়া অতুলভায় ;
চরণ ঘেরিয়া ঘুরে যে হাসিয়া মধু. বঙ্কিম, চণ্ডীদাস,
ঘুরে কাশীদাস, মুকুন্দরাম, গুপ্ত, গিরিশ, কৃত্তিবাস।
তব বেদীতলে আসে দলে দলে বিগত সেবক আত্মা-চয় ;
শুনি যেন সবে গাহিছে নীরবে-জয় পরিষৎ, বাণীর জয়।
নম পরিষৎ, উদার মহৎ, হে ভাষা সেবীর সেবার ঠাঁই !
নম পবিত্র মিলনতীর্থ; তুমি অক্ষয়, বিনাশ নাই।
পূজিতে ভারতী তোমারে আরতি করি গো আজিকে, হে বেদীতল।
লহগো প্রণতি, শ্রদ্ধা. ভকতি লহগো হর্ষ, অশ্রুজল।

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঊণচত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা দিবসে পঠিত]

—পঞ্চপুষ্প। শ্রাবণ ১৩৩৮

জ্ঞানসিন্ধু-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রণাম তোমারে হে কবি কোবিদ
হে কালিদাসের ভাবের জ্ঞাতা.

কালিদাস রস রসিক মহান,
কালিদাস রূপ চিত্রদাতা।
সিন্ধু তোমার বেলায় দাঁড়ায়ে
হেরেছি ভারত বিশাল কত।
হেরেছি আর্য কীর্তি-কাহিনী
কিবা সীমাহীন, কি উন্নত
তোমারি মাঝারে মণি খুঁজিবারে
ছুটেছি আমরা ক্ষুদ্রদীন,
হে সাগর তুমি ছিলে অধৃষ্য
অভিগম্যও, ছিলে না হীন।

—পঞ্চপুষ্প। কার্তিক ১৩৩৮

রামানন্দ বন্দনা

রঘুবংশের জ্যোতি, নির্মল রাম।
কান্তি-কোমল আর বলে উদ্দাম
গুহকের বন্ধু সে, রাবণের ত্রাস
শিষ্টে সে মিষ্টতা, দুষ্টে বিনাশ।
ত্যাগে সে মহীয়ান, ভোগে উদাসীন,
জন মন রঞ্জিতে নিজে সুখহীন
ধৈর্যে সে হিমালয়, মানে পারাবার
শক্তিতে বজ্র সে, প্রেমিক উদার।
সুন্দর সুকঠোর সেই রাম আজ
রামানন্দের রূপে করেছে বিরাজ।
সন্তানে রচেছিনু আনন্দমঠ—

দেশপ্রেম ছায়া ভরা অক্ষয় বট।
ত্যাগী দুর্ব্বার যত সন্তানদল
সেবিল স্বদেশমাতা হর্ষে উজল
সে মঠের নিরমল আনন্দভার
রামানন্দের রূপে মূর্ত্ত অপার।
সেবায় সে ভয়হীন আনন্দময়
তাহারে প্রণাম করি, গাহি তার জয়।
প্রবাসী, পৌষ-১৩৫০

প্রেম কম্পন

এস এস অয়ি বিনত নয়না।
মঞ্জু স্বপ্ন ভাষিনী।
পূর্ণ হৃদয়া, জলভরা মেঘ,
অয়ি ধীর থির হাসিনী।
চূর্ণ অলক শোভিত কপোলা,
নয়নে স্বপন জড়িমা।
দুটি গণ্ডের কোমল শয়নে
শোভে অনুরাগ ঘনিমা।
গ্রীবাখানি যেন প্রেমের স্বরগ,
যেন মদনের সুখ ঠাঁই:
গ্রীবা গরিমায় ডুবে যেতে চাই;
গ্রীবা ধরে যেন মরে যাই।
দুটি কর, যেন হৃদয়ের প্রেম
উচ্ছ্বাসিয়া আসি' বাহিরে,

ধরেছে পেলব লতিকা মূরতি
বাঁধিবারে কারে চাহিরে।
বসনে গোপন বক্ষ কমল-
কুয়াশায় ঢাকা নলিনী ;
তারও আহবানে কেঁপে ওঠে বুক।
সে যে সুনয়ন মোহিনী।
এই এই মোর অতুলা প্রেয়সী,
এযে দিল আজি কম্পন,
প্রেম কম্পনে জেগে উঠি আজ,
জেগে ওঠে সারা প্রাণ মন।
উদয়ন, ভাদ্র-১৩৪১

ব্যথাতুর

কোন পারে উজ্জ্বল সুন্দর দিন
চলে চলে শ্রান্ততে মৃত্যুবিলীন ?
সেই পারে ক্লান্তির, শ্রান্তির দেশ ;

× × ×

তরী হবে সুস্থির যাত্রার শেষ।
নিশ্চুপ নির্জন সেই পরপার
সেই মোর বাঞ্ছিত সুন্দরাগার।
কে গো আছ, কোথা আছ, আছ ঈশ্বর ?
তুমি না কি দুঃখীর চির নির্ভর ?
এস তবে, লহ তরী, ধর তুমি হাল,

ডোবে না কো তরী যেন ঢেউ-এ উত্তাল।

বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৯

সৃষ্টি বন্দনা

[ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১২৯ সূক্ত। ভাবকৃত দেবতা। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী দেবতা]

না ছিল সত্তা, নাহি অসত্তা,
না ছিল পবন আকাশ-তল
কিবা ছিল ঢাকা? কোথা? কে ধর্ত্তা?
গহন গভীর ছিল কি জল? ১॥
না ছিল মৃত্যু অ-মৃত নেই.

না ছিল রাত্রি অথবা দিন।
বায়ুহীন শ্বাস, টানি এক সেই
ছিল জাগ্রত সকল হীন। ২॥
প্রথমে জাগিল কামনা তাঁহার
সে কাম মনের নবাঙ্কুর
জাগিল কবির মনীষা বিভায়
অস্তি নাস্তি মিলন সুর। ৪॥
কে জানে সে কথা আদিম বারতা?
কি রূপে জন্ম সৃষ্টি সব?
বিশ্ব প্রথমে পরে তো দেবতা,
কে তবে জানিবে সে উদ্ভব? ৬॥

'বেদবাণী' গ্রন্থ হইতে।

অগ্নি বন্দনা

[ঋগ্‌বেদ ১০ম মণ্ডল ১৯১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। সংবনন ঋষি]

হে অগ্নি! তুমি যুবা, তুমি প্রভু, অভীষ্ট ফলকর।
বিশ্ব প্রাণেতে ব্যাপ্ত হইয়া রয়েছে বৈশ্বানর
উত্তর বেদী ব্যাপিয়া তুমি যে নিত্য দীপ্তি দাও,
আমাদের তরে ধন ও রত্ন আহরণ করি দাও! ১॥
সমান সমিতি ইহাদের আর সমান মন্ত্রচয়
সমান মানস চিত্ত সমান হয় ইহাদের হয়
সমান অস্ত্রে তোমাদের আজ করিহে আমন্ত্রণ
সমান হবিতে তোমাদের তরে করি হোম নিবেদন। ৩॥
তোমাদের হোক সমান আকুতি সমান সে অভিলাষ,
হৃদয় হউক সমান যতেক বিরোধ হউক নাশ।
সমান হউক সমান হউক তোমাদের সব মন,
কর লাভ শুভ সাহিত্যভাব তোমরা সর্বজন। ৪॥

'বেদবাণী' গ্রন্থ হইতে

বিদ্রোহী কবি মধুসূদন

আজ ভাবি সেই ভালো, বৈরাগ্যে নৈরাশ্যে বল লভি'
ব্যগ্র আশে পূরিয়াছ আমাদের আশা তুমি, কবি!
যে তৃপ্তি খুঁজেছ নিতি পেলে তাহা হয়ে যেত শেষ,
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত সুখের উদ্দেশ?
তুমি রচি গেছ পথ বনদল উপাড়িয়া বলে,—
আজি যে পথের পরে রবির অমল জ্যোতি জ্বলে।

দেবত্রাস মধুদৈত্য নাশে যেই সে মধুসূদন—
বাংলার কাব্যের কক্ষে তুমি কবি জড়তা-দলন।

—কোজাগরী

বঙ্কিমচন্দ্র

ধূলিধূম—সমাকীর্ণ ক্লিন্ন আজ সাহিত্য গগন ;
এল দীপ্ত করোজ্জ্বল গ্লানিহর্তা মধ্যাহ্ন তপন !
কুহেলি-কুজ্ঝটি-জাল রশ্মিদর্পে কর পরিষ্কার,
সুনীল নির্মলরূপে মুক্ত ব্যোম জাগুক আবার।
প্রোজ্জ্বল প্রাসাদে তব, হে সম্রাট, ঘোরে ফেরুপাল ;
তব শুভ্র রাজধানী ঘেরে আজ তৃণের জঞ্জাল।

—কোজাগরী

গৌতমের গৃহত্যাগ

এই তো রাতি, এই অবসর, তারায় চাঁদে বলছে মোরে—
বেরিয়ে পড়ো বেরিয়ে পড়ো, আর কি সুযোগ পাবি ওরে ?
হয় মিশে যাক মিথ্যা মায়ায়, প্রিয়ার প্রেমে থাকরে মিশি,
নয় চলে আয় জগৎ বুকে এইতো সুযোগ নীরব নিশি !
হেথায় মুকুট স্বর্ণ-আসন-হেথায় ধূলি কাঁকর ভরা
হেথায় বিলাস, নর্তকী গান-হেথায় রোদে পুড়ছে ধরা

* * *

ঘর হতে সে বেরিয়ে এল, চাইল আবার আকাশ পানে ;
জগৎ তারে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে প্রেমের টানে।

—কোজাগরী

শ্রাবণ বরণ

শ্রাবণের
প্লাবনের
মাতামাতি আয় আজ।
বনে বনে
আলাপনে
ঘোর ঘটা করে বাজ।
ঘিরে ঘিরে
ধরণীরে
বলে নাও, আর চাই?
চাই চাই,
ডুবে যাই
ধরা মাঝে কিছু নাই। অরুণিমা

ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি

ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি
মেঘ কড়্ কড়্।
চিক্ মিক্ বিদ্যুৎ
প্রাণ থর্ থর্
চুপ্ চাপ্ সববাই
জল কল্ কল্।
তর তর নদী যায়
জোর ছল্ ছল্

ঝুপ্ ঝুপ্ গাছময়

চালে চড়্ বড়

টুপ টাপ্ কচুপাতে

জল ঝর্ ঝর্

বৃষ্টির কিবা নাচ

তাক্ তিন্ তিন

তার সাথে নেচে উঠি

ধিন্ তা তা ধিন্ ।

আয় সব মণ্টু ও

বুলকির দল,

তোল পাড় করি আজ

ছেঁচে জল। — কৈশোরক, শ্রাবণ, ১৩৪৮

× ×

পর্বতকন্দরে সঞ্চিত জলরাশি আপনার আবেগ পরিচালিত করিবার উপযোগী একটি পথ যদি অকস্মাৎ লাভ করে তবে যেমন সে আপনার উচ্ছ্বাসে ধরণী ভাসাইয়া ছুটিয়া যায়, তেমনি সঞ্চিত শক্তি বঙ্কিম আলালী ভাষা পথে আপনার আবেগ প্রধাবিত করিবার আকস্মিক সুযোগ লাভ করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তখনকার প্রচলিত ও তাঁহার দ্বারা আহৃত যে রচনারীতি তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে যেন এক যাদুস্পর্শ লাগিল। সুষুপ্ত ভাষারাণী যেন জাগরণের আনন্দে ও হাস্যে উজ্জ্বল ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতরীতির গুরুত্বের সঙ্গে লোকরীতির লঘুত্বের সংমিশ্রণ ঘটাইলেন। ভাষাকে ধর্মকথা ও বীরত্বকথার সঙ্গে গল্পকথা ও ব্যঙ্গ কথারও বাহন করিয়া তুলিলেন। একটা জাগ্রত ও আশাচপল জাতির পক্ষে তাঁহার বহুবিধ

মনোভাব বিকাশের যে ভাষার প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে তাহাই দান করিলেন।

—বঙ্গগঠক বঙ্কিমচন্দ্র। বিশ্ববাণী, মাঘ-১৩৪৭

দেশ হইতে দেশান্তরে যুগ হইতে যুগান্তরে সাহিত্য মানুষের মনের দ্বারে বহন করিয়া আনিতেছে দুইটি জিনিস প্রথম আনন্দ. দ্বিতীয় কল্যাণ। কত শতযুগের রচিত সাহিত্য মানুষকে তার দুঃখে বেদনায় বিষাদে নিরাশায় নিরন্তর দান করিতেছে সজীব আনন্দ আর সেই আনন্দেরই গর্ভে লুক্কায়িত মধুময় কল্যাণ। কবির কাব্য পাঠ করিয়া আমরা পুলকে আত্মহারা হইয়া উঠি, ক্ষুদ্র হাসি কান্নার মহত্ব বুঝিতে পারি। দুঃখ দৈন্য দাসত্বের প্রবল পেষণের মধ্যে ও সংযম ও আত্ম নির্ভরতার যষ্টিতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিব।···সেক্সপীয়র যখন জগতের মানুষের দুঃখ, সুখ, পাপ, তাপ, লোভ, লালসা, আশা, নিরাশা, শক্তি দুর্বলতার বিচিত্র ছবি আঁকিলেন তখন তাঁর মনে কল্যাণের অনুপ্রেরণা হয়তো ছিল না। বাহির্জগতের আন্দোলন তাঁহাকে যেরূপ আনন্দে মাতাইয়া তুলিয়াছে তিনি সেইরূপ আনন্দেই আপনার কাব্য রচনাকে মূর্তি দিয়েছেন। পিছনে পিছনে ছিল কল্যাণের ছদ্মবেশী অভিযান।···সাহিত্যের চরমদান আনন্দ ও কল্যাণ কতদিন হইতে মানুষকে ক্ষুদ্রতা হইতে পূর্ণতার দিকে উন্নীত করিয়া চলিয়াছে এবং এখনও কত শত যুগ চলিবে তার ইয়ত্তা নাই। মানুষ তার আনন্দের ভাণ্ডার এই সাহিত্যকে গড়িয়া না রাখিলে তার কি বিষাদে, কী নৈরাশ্যেই না জীবন কাটিত।

—সাহিত্য ও জীবন। কুশদহ জ্যৈষ্ঠ-১৩২৮

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষেও লাইব্রেরীর অভাব ছিল না। তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি প্রাচীন বড় বড় বিদ্যানিকেতনের সহিত বড় বড় পুঁথিশালা সংযুক্ত ছিল। জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিগণ তাহা হইতে আপনাদের রুচি

অনুসারে জ্ঞান বস্তু আহরণ করিতে পারিতেন। জ্ঞানের চর্চা ও পূজা অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগ হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। আর্যেরা বাহুবলে যেমন সমস্ত ভারত ভূমিকে আর্যাবর্তে পরিণত করিয়াছিলেন, তেমনি জ্ঞানানুশীলনে তাঁহারা প্রাচীন মানব সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। জ্ঞানের আলোকে তাঁহারা কেবল ভারতভূমিকেই উদ্ভাসিত করেন নাই, এশিয়া মহাদেশের বহু স্থান তাঁহাদের জ্ঞানজ্যোতিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। এই যে জ্ঞানের কিরণ তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিয়া আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছিলেন সেই কিরণের কিরণ যিনি, সেই জ্ঞানের পরম জ্ঞান যিনি, তাঁহাকে বৈদিক ঋষিগণ একটি জ্যোতিরূপে কল্পনা করিয়াছেন – সরস্ শব্দের অর্থ জ্যোতি ; সরস্ + বতী, অর্থাৎ সরস্বতী হইতেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবতা। ইহার অপর নাম বাগ্‌দেবী অর্থাৎ বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞের উপকরণ সাজাইয়া লইয়া বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছেন—

পাবকা নঃ সরস্বতী
বাজেভির্ বাজিনীবতী
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥
চোদয়িত্রী সুনৃতানাম্
চেতন্তী-সুমতীনাম্
যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥
প্র চেতয়তী কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥

(ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, ৩ সূক্ত)

[যিনি মানুষের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্মল করেন, যিনি যজ্ঞশালিনী ও অন্নদাত্রী, সেই সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন। তিনি সুন্দর ও সত্যবাক্যের প্রেরণকর্ত্রী, সুবুদ্ধির উদ্বোধনকারিণী, তিনি যজ্ঞের ধারণকর্ত্রী।]

তিনি মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম পরমাত্মার চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করেন। তিনি সমুদয় নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন।]

······বর্তমানকালে বঙ্গদেশে বাঙলা পুস্তকের বিরাট ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে কলিকাতার সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার। হাজার বৎসর পূর্বেকার কালি অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যের প্রারম্ভের কাল হইতে আধুনিক কাল অবধি বিভিন্ন যুগের পরিচায়ক পুস্তকরাজি এখানে সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে। ইহাকে সাহিত্য সেবা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান বলা যাইতে পারে। বাঙালী মস্তিষ্কের বহুমুখী চিন্তার নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য গ্রন্থসমূহ এখানে বিষয় অনুসারে নিপুণভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। এখানকার প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহশালা এক বিপুল দর্শনীয় বস্তু। বাংলাদেশের ছোট বড় সমস্ত পাঠাগারেরই উচিত এই সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের সহিত যোগ রাখিয়া চলা। তাহা হইলে এখানকার গঠনপ্রণালী অন্যান্য পাঠাগারকেও সুগঠিত করিতে পারিবে।

—গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও কর্তব্য। সংহতি। মাঘ—১৩৪৫

হে বাংলার সাহিত্য গুরু, আজ বৎসরের প্রথম দিনে সাহিত্য পথে আমাদের এই প্রথম যাত্রায় আমাদের হর্ষ-আশঙ্কা-উদ্বেল হৃদয়ে তোমার চির জয়ী শক্তিময় মূর্তি ফুটিয়া উঠুক। বঙ্গ ভারতীর পবিত্র পূজাকার্যের গুরুভার শ্রদ্ধাবনত আমাদের মস্তকে তোমার আশীর্বাদ পুষ্পের মত ঝরিয়া পড়ুক।

হে নির্ভীক জাতি গঠক, যে অপার শক্তি ও মনীষার বলে তুমি বাঙালীর পূর্ণ অভ্যুদয়ের সকল পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলে। সেই শক্তি ও মনীষার আবেগ আমাদের চিত্তকে উৎসাহিত করুক।

হে প্রবল কালবৈশাখীর প্রতিভূ, তুমি সঙ্গে আনিয়াছিলে প্রভঞ্জন ও প্লাবন—প্রভঞ্জনের দ্বারা তুমি বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রের বহু গুল্মদল ও কলুষ জঞ্জাল উড়াইয়া দিয়াছ এবং প্লাবনের দ্বারা সেই ক্ষেত্রকে নবীন জীবনে নব সম্ভারে সুশ্যামল করিয়া তুলিয়াছ। তোমার সেই সংহার ও সৃজনের লীলা আজ আমাদিগকে যথার্থ পথের সন্ধান দিক।

হে সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তোমারই নয়নে প্রথম অপরূপ গৌরবে সেই দেশ জননী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যিনি একইকালে 'স্নহাসিনী' এবং 'বহুবলধারিণী'। তাঁহারই হাস্যে ও বলে আজ অদম্য বঙ্গরবি জগতের আকাশে সমুজ্জ্বল। তোমাকে প্রণাম।

হে মহান, তুমি আমাদিগকে সেই সাহস দাও যাহাতে আমরা অন্যায়কে অন্যায় বলিতে পারি। সেই শক্তি দাও যাহাতে আমরা কলুষকে অতিক্রম করিতে পারি। সেই প্রেরণা দাও যাহাতে আমরা আনন্দ উৎসারিত সৌন্দর্য ও কল্যাণকে জীবনের সাধনা করিয়া তুলিতে পারি।'

—সূচনা প্রথম সম্পাদকীয়।। উদ্বোধন। বৈশাখ ১৩৪১

হে পাত্র, হে ভাবী বর, হে কন্যা-উদ্ধারকারী মহীয়ান। তুমি বড়ই দুর্লভ। পথে, ঘাটে, দোকানে, অফিসে কত লোকই তো দেখি—কেহ লম্বা কেহ বেঁটে, কেহ রোগা, কেহ নাদুস নুদুস, কাহারও গোঁফ ছাঁটা, কাহারও কাহারও চাঁচা, কাহারও মাথার পিছন দিক শ্বেত প্রস্তরের মতো, কাহারও বা কদমফুলী। তুমি কি তাহাদের মধ্যে আছ? কই না তো। থাকিলে নিধুমামার এত দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? তিনি আজ পাক্কা সাড়ে চার বৎসর তাঁহার বড় মেয়েটির জন্য তোমার সন্ধান করিতেছেন; কিন্তু তোমাকে তো পাইলেন না। হে মহান, তুমি কি ডুমুরের ফুল যে খুঁজিয়া পাওয়া ভার? তুমি কি বর্তমানের খাদ্যপ্রাণ কয়লা যে তোমাকে দেখিতে পাওয়া যায় না? তুমি কি দাড়ি কামান ব্লেড যে বাজার হইতে উড়িয়া গেলে? হে দুর্লভ, হে কাম্য, দেখা দাও, দেখা দাও। নিধুমামাকে আর ঘুরাইও না।

হে পাত্র, হে কন্যাবান্ধব, তুমি কি এই, ঐ যে যাঁহার ফিনফিনে পাতলা কাপড় কাবলী ফ্যাশানে নামিয়া আসিয়া শ্রীচরণ দুইটির চটির উপর ঘোমটার মতো লুটাইয়া পড়িতেছে, পাঞ্জাবী যাঁহার আজানুলম্বিত বা আডিমলম্বী, যাঁহার ক্ষীণদেহ গলা খোলা উন্মুক্ত থাকায় সুপ্রকাশিত, যাঁহার মুখে সুলম্বা ও

সুমোটা একটি ধূমায়িত চুরুট, যাঁহার চুলগুলি নির্লাজ পবন কেবলি দোলা দেওয়ায় অঙ্গুলি সঞ্চালনে ক্ষণে ক্ষণে জব্দিত বা চাপিত হইতেছে? তুমিই কি সেই? বা সে-ই কি তুমি? বল, বল, নিধুমামাকে আর দুঃখ দিও না।

হে পাত্র, তুমি শিশুকালে পিতৃভক্ত, কৈশোরে মাতৃভক্ত কিন্তু কিছুটা উস্‌খুস্‌, যৌবনে কলেজে বক্তৃতা ভক্ত। সে বক্তৃতায় তুমি কুসংস্কার দলন কর। পণ প্রথা ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দাও, গুরুজনদের শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন কর। বিবাহের কালে কিন্তু, আহা কি সৌভাগ্য, পিতার বা ঠাকুরমার ভক্ত হইয়া বল—আমার ত হাত নেই। আমি তো টাকাকড়ি নিতে চাই না, কিন্তু বাবা-ঠাকুমা বলছেন, আমি কী করব? হে পিতৃভক্ত, হে ঠাকুরমা-নিষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার।

হে সমাজ হিতৈষী, তোমার গুণপনায় ও মহিমায় আমি মুগ্ধ। তুমি একটি পাশের কাছাকাছি আসিয়া যখন অধ্যয়ন সমাপ্ত কর তখন কন্যাদের মঙ্গল সাধনের জন্য তোমার মূল্য হয় দেড় হাজার টাকা। আর পাশটি যদি সমাপ্ত কর, তোমার মূল্য দুই হাজার। যদি দুইটি পাশ কর তবে তোমার দাম তিন হাজার। আর তিনটি পাশ করিলে তোমার চার হাজার টাকা বাজার দর। আর চারটি পাশ যদি করো, ওহো, তাহা হইলে তো কথাই নাই। তুমি তখন দশ হাজারী ধুরন্ধর। এত তোমার নগদ মূল্য। আবার ফাউ আছে। ধুসঘাস আছে। দাও খাট, দাও টেবিল, দাও চেয়ার আলমারী। একটি বাড়ী কিংবা অধিকতর মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য বিলাত-গমন বাবদ আরও হাজার পাঁচেক টাকা। হে পাত্র, হে মহিমময়, হে স্বর্ণ অপেক্ষা মহার্ঘ, হে রেডিয়াম বিশেষ, হে মহামূল্য, তোমাকে দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করি।

হে পাত্র, হে পাত্রগণ, তোমাদের বন্ধুগণের ও আত্মীয়গণের বহুরূপ দেখিয়া নিধুমামার সহিত আমরাও বিমুগ্ধ। নিধুমামার কন্যাকে সেদিন দেখিতে আসিলেন আলমবাজারের পাত্র বন্ধু যুবকদল। প্রথমেই তাঁহারা কন্যাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—নাচ-গান জানেন তো? কন্যা বলিল—গান জানি, নাচ জানিনা। জিজ্ঞাসা হইল—কোন্ কোন্ বাদ্যযন্ত্র জানা আছে? কন্যার উত্তর—কেবল হারমোনিয়াম্ কিছুটা। কন্যা বাতিল হইল।

আর একদিন আসিলেন তালতলার পাল্‌ধি মহাশয়। তিনি কন্যাকে দাঁড় করাইলেন, হাঁটাইলেন। চুল খুলিয়া পিছন ফিরাইলেন, গান গাওয়াইলেন। অবশেষে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। পরের রবিবারে আসিলেন একদল মাসিমা-পিসিমা তাঁহারা কন্যার পায়ের গোছ ও ঘাড়ের পিছনে বসিয়া গায়ের রঙ দেখিলেন, কন্যাকে হাসাইলেন ও কাসাইলেন। শেষে জলযোগান্তে শীঘ্রই খবর দিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। আজ পর্যন্ত কিন্তু নিধুসোমা খবর পান নাই। হে হিতৈষী আত্মীয় বন্ধু পরিবৃত সুপাত্র, তুমি অদৃশ্য থাকিয়া বাহন যোগে কতই না লীলা দেখাইতেছ। হে লীলাময়, তোমাকে নমস্কার না করিয়া যে পারি না।

হে লীলাময়, তোমার চলন লীলা যদি বেখাপ্পা হয়, অর্থাৎ তুমি যদি একটু খোঁড়া হও, তবে পুরুষ মানুষে সে দোষ অর্শায় না। তুমি যদি খাদ্য প্রাণ কয়লার মতো কৃষ্ণ হও। তবে তাহাতেও কোনো ক্ষতি হইতেই পারে না। তুমি যদি বাহিরগামী হও, তবে সেজন্য বিবাহে বাধা নাই, এবং বিবাহ দিলেই তুমি নির্মল হইয়া যাইবে। তুমি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তবে বিবাহেই তোমার রোগের উপশম ঘটিবে।

অতএব হে সর্বদোষ হর, হে পূত ও পাবন, হে নায়সুন্দর, হে কলিযুগে আরাধ্য দুষ্প্রাপ্য দেব বিশেষ। তোমাকে নমস্কার।

—পাত্র বন্দনা। বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিন ১৯৪৪-৪৫

'প্রবাসী'তে যোগদান করিয়া প্রথমেই আমার বিস্ময়ের কারণ হইল 'প্রবাসী' কার্যালয়ের ক্ষুদ্রতা বা স্বল্প পরিসর। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পিছন দিকে সরুগলির ভিতর ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে একটি মাঝারি গোছের বাড়ি

উপরে সপরিবারে রামানন্দবাবু বাস করেন এবং নীচের দেড় খানি ঘরে 'প্রবাসী' ও Modern Review এর অফিস। বড় ঘরটিতে অফিসের কাজকর্ম হয় এবং ছোট ঘরটিতে সম্পাদকীয় বিভাগ চলে। প্রবাসী বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে সমাদৃত আর Modern Review জগতের মনীষী সমাজে সমাদৃত। এমন দুইখানি কাগজের অফিস দেড় খানি ঘরে। এতটুকু স্থান হইতে উৎসারিত সাহিত্যের সাগ্নিকবাণী কত না বৃহৎ দেশে, কত না অসংখ্য মনে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রবাসীতে অত্যধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে রবীন্দ্র রচনা সম্পর্কে রামানন্দবাবু বিচারহীন ছিলেন। একটি ঘটনা পুরোপুরি আমার মনে না থাকিলেও তাহার সামান্য স্মৃতি আমার আছে। তাহা এই যে রবীন্দ্রনাথের একটি রজনীতিক প্রবন্ধের অল্প কিছু পরিবর্তন করিয়া রামানন্দবাবু প্রকাশ করেন। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ উষ্মা প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দবাবু ও যটল উক্ত জবাবে কবিকে পরিবর্তনের কারণ জানাইয়া দেন। সে সময়ে তাঁহার মুখভাবে এমন লক্ষণ ছিল যাহাতে কবির সহিত বিচ্ছেদের আশঙ্কা আমরা করিয়াছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন পরেই কবি সম্পাদকের নীতির প্রতি সম্মান দেখাইয়া পত্র লেখেন এবং ব্যাপারটি অংকুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর একটি ঘটনা, আমেরিকা প্রবাসী এক অতিবিখ্যাত বাঙালী লেখকের Modern Review তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সম্পাদকীয় প্রয়োজন বোধে রামানন্দবাবু কিছু পরিবর্তন করেন। লেখক তাহা দেখিয়া খুবই গরম হইয়া এক পত্র লেখেন। পত্রখানি যেদিন পৌঁছায় সেদিন Modern Review প্রকাশের শেষ তারিখ ছিল বলিয়া আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসে ছিলাম। পত্রখানি লইয়া গম্ভীর হইয়া রামানন্দবাবু উপরে গেলেন। ঘণ্টা খানেক পরে সেইভাবেই নামিয়া আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন—"এই লেখকের কতগুলি লেখা আমাদের

হাতে আছে? সবগুলি বার করুণ তো!" লেখাগুলি সব বাহির করা হইল। বলিলেন—"লেখক যদি মনে করেন যে কর্তব্যবোধে তাঁর লেখা অদল বদল করবার অধিকার সম্পাদকের নেই। তবে তাঁর লেখা সবই ফেরৎ দেবো, আর ছাপব না।" সম্পাদকের একখানি কড়া পত্রের সহিত লেখাগুলি সব ফেরত গেল। মাস দুইপরে দেখা গেল, লেখক সম্পাদকের মার্জনা চাহিয়া পত্র দিয়াছেন এবং লেখাগুলি পুনরায় পাঠাইয়াছেন।

বিলাতের House of Commons এর দুই একজন সভ্য Modern Review এর লেখক ছিলেন। উঁহাদের লেখার পরিবর্তনও সম্পাদক করিতেন এবং নির্ভয়ে করিতেন। স্বাধীন দেশের এই লেখকদের নিকট হইতে এ কারণে প্রতিবাদ পত্র কখনও আসিতে দেখি নাই। সম্পাদকীয় নৈতিক মর্যাদা দিতে তাঁহারা জানেন। এই প্রসঙ্গে J. T. Sunderland এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার বহু বহু রচনার ও India in Bondage নামক পুস্তকের বহু বহু অংশ রামানন্দবাবু পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন।

—'প্রবাসী'র তেজস্বী সম্পাদক (২২)

উপসংহার

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত রবীন্দ্রযুগের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবক। অধুনা প্রায় বিস্মৃত, সাহিত্যের বহু ক্ষেত্রে ছিল তাঁহার অনায়াস পদসঞ্চারণ। কবি ও শিশুসাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার শক্তির অভাব ছিল না। তাঁহার রচিত নিবন্ধ-সমালোচনা-রসরচনা-অনুবাদ এবং সংবাদ পত্রাশ্রয়ী সাময়িক রচনার সংখ্যা নগণ্য নহে। তাঁহার এই শ্রেণীর বিপুল রচনার প্রতিচ্ছবি এই চরিত মালায় সুদুর্লভ। তাঁহার অকাল প্রয়াণে এই শ্রেণীর রচনার সংকলন বা গ্রন্থরূপে প্রকাশ ঘটে নাই। অধুনালুপ্ত বহু খ্যাত-অখ্যাত এবং দুষ্প্রাপ্য সাময়িক

পত্রিকাসমূহের ধূলিধূসর পত্ররাজির মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়া আছে। তাহার অনুসন্ধান-সংকলন ও পঞ্জী প্রণয়ন আয়াস সাধ্য সারস্বত কর্ম। কবি ও সাহিত্যকার হিসাবে পাঠকচিত্তে যে স্থায়িত্ব প্যারীমোহন দাবি করিতে পারিতেন —সেই তুলনায় তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি সুদূর প্রসারী হইতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াও স্বীয় অধ্যবসায় একাগ্রতায় অনুশীলনে কেবল কবি প্রতিভার প্রতিষ্ঠাতেই নয় জ্ঞানান্বেষণেও যে সার্থকতা লাভ করা দুঃসাধ্য নহে প্যারীমোহনের সাহি ত্য সেবক জীবন তাহার নিদেশক। তাঁহার তিরোধানের কয়েক দশকের মধ্যেই তাঁহার অবদানের স্বীকৃতি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রযুগের বহু বিস্মৃত বাণীসেবক গণের সঙ্গে প্যারীমোহনের সাহিত্যিক অবদানের মূল্যায়ন বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের আশু স্মরণীয় দিক। যে শুচিতা ও সংযম ছিল প্যারীমোহনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাহা তাঁহার সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই নিষ্ঠাবান বাণীসেবক বঙ্গভারতীর চরণে যে স্রকচন্দন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পবিত্র সুরভি দেবীর পুণ্য পাদপীঠকে দীর্ঘকাল আমোদিত করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই।

সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—১২০

যদুনাথ সরকার

যদুনাথ সরকার

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৮৯

মূল্য : আট টাকা

[আরতি মল্লিক স্মৃতি-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত]

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিণ্টার্স
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

যদুনাথ সরকার

১৮৭০-১৯৫৮

প্রারম্ভিক কথন

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে কতিপয় মনীষী বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গ তথা ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যদুনাথ সরকার অন্যতম। বঙ্গসংস্কৃতি ও বিশেষভাবে ভারতীয় ইতিহাস-সাধনার ক্ষেত্রে তিনি যে বিরল পাণ্ডিত্য ও মনীষার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বহুকাল ভবিষ্যৎ গবেষকদিগকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিবে। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ধী-শক্তিতে গবেষণা-লব্ধ গ্রন্থগুলি দুর্লভ জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেগুলি স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে দেশবাসীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি বর্ধনে সহায়তা করে। ঐতিহাসিক রূপে তাঁহার খ্যাতি ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই সুদূর পাশ্চাত্য জগতেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

তাঁহার কোন আত্মচরিত নাই। তিনি নিজের সম্বন্ধে কখনও বিশেষ কিছু বলিতেন না। একবারমাত্র আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে 'আমার জীবনদর্শন' শীর্ষক ভাষণে তিনি নিজের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন। ('আমার জীবনদর্শন', বেতার জগৎ, ১৯ খণ্ড, ২৩ সংখ্যা, ১২৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা)। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২-রা নভেম্বর তিনি Indian Educational Service-এর জন্য যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা হইতেও তাঁহার জীবনের খুব সংক্ষিপ্ত অথচ কতকগুলি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ইহা 'Bengal Past and Present'-এর ১৯৭০-এর জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। ইতিহাসের গবেষণা-

পদ্ধতি, তাঁহার নিজস্ব ইতিহাসচর্চার প্রণালী, গবেষকদের কর্তব্য, তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাগার কিভাবে গড়িয়া উঠিল, ইত্যাদি বিষয়ে আমরা তাঁহার ইংরাজী ও বাঙলায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারি। (এই গ্রন্থের শেষে রচনাপঞ্জী দ্রষ্টব্য)। তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সব মূল্যবান অভিমত ও মন্তব্য আছে তাহাদের মধ্যেও তাঁহার ইতিহাসবিষয়ক ধ্যান-ধারণার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Sir Jadunath Sarkar Commemoration Volume I খুবই তথ্যবহুল এবং অত্যাবশ্যক।

যদুনাথের লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাতটি উপন্যাসের ভূমিকা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণে প্রকাশিত) এবং রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত অন্যান্য প্রবন্ধ হইতে তাঁহার বাংলা সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। (রচনাপঞ্জী দ্রষ্টব্য)।

যখন যে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ হইতে এই পুস্তকের জন্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করা হইয়াছে।

এই পুস্তকের জন্য যদুনাথের রচনাপঞ্জী প্রণয়নে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও ক্যালকাটা হিস্টরিকাল সোসাইটি সংকলিত এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় Commemoration Volume এর অন্তর্ভুক্ত যদুনাথের সমগ্র রচনার তিনটি তালিকা বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এই জন্য ঐ সব তালিকা-প্রণয়নকারীদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

যদুনাথের বংশ পরিচয়

এই পরিবারের সর্বপ্রথম যাঁহার নাম জানিতে পারা যায় তিনি শান্তিরাম সরকার। (Sir Jadunath Sarkar—A Centenary Tribute) তাঁহার পুত্রের নাম মাণিকচন্দ্র সরকার।

এই সরকার পরিবারের আদি নিবাস উত্তরবঙ্গের করচমাড়িয়া গ্রামের প্রায় এক মাইল উত্তরে নাগর নদীর, তীরে ছাত্রদীঘিতে ছিল, (বর্তমান বাংলা দেশে)। বন্ধকী কারবারের সূত্রে এই পরিবার কিছু লাখেরাজ জমি লাভ করেন। একবার মাণিকচন্দ্রের গৃহে ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা তাঁহার শিশুপুত্র ও বয়স্ক ভ্রাতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং তিনি নিজেও খুব আহত অবস্থায় নৌকায় গোদাগাড়ি কানসাটে নীত হইবার পরে দেহত্যাগ করেন।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমাইচন্দ্র সরকার তিনজন ছোট ভাইকে ছাত্রদীঘির সম্পত্তি দিয়া তাঁহার "পত্নী বা পত্নীদের" এবং পুত্র রামকুমারের সহিত "করচমাড়িয়া গ্রামে বসতি ও সরকার পরিবারের বাড়ির পত্তন করান।" এই বাড়ির চারিদিকে পরিখা খনন করাইয়া দুর্গের মত সুরক্ষিত করা হয়।

করচমাড়িয়া নাটোররাজবংশের আত্মীয় কাশিমনগরের রায় পরিবারের সম্পত্তি ছিল। ডাকাতের ভয়ে এই পরিবারের লোকেরা তাঁহাদের জমিদারি ও অন্যান্য সম্পদ বিক্রয় করিলে নিমাইচন্দ্র এ সমস্ত ক্রয় করেন। ক্রমে তিনি খুব প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র রামকুমার এই সম্পত্তির আরও উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা; ইঁহাদের মধ্যে রাজকুমার ও হরকুমারের যথাক্রমে ১৮৩৯ ও ১৮৪৫ এ জন্ম হয়; অপর পুত্র নবকুমার অতি শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করেন এবং ১৮৪২ এ কন্যা বরদাসুন্দরীর জন্ম হয়। ('স্যার যদুনাথের পূর্ব-পুরুষগণ ও আদি নিবাস', বিভা সরকার, 'ইতিহাস', ১৩৭৭ পৌষ-চৈত্র, পৃ ২০৫-৮)।

যদুনাথের পিতা রাজকুমার সরকার

১৮৩৯-১৯১৪

বিভা সরকার রাজকুমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যদুনাথের পূর্বপুরুষদের জীবন আলোচনায় আমরা যে মানুষটিকে ব্যক্তিত্বে ও মহানুভবতায় প্রোজ্জ্বল দেখি তিনি ছিলেন তাঁর পিতা স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার।"

ছাত্রহিসাবে তিনি বেশ মেধাবী ছিলেন এবং পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ফার্স্ট্ আর্টস অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগে (১৮৫৭) তাঁহার বহরমপুর ত্যাগ করিয়া করচমাড়িয়ার পৈতৃক জমিদারি তত্ত্বাবধানে মন দিতে হয়। সেই সময়ে তিনি নিজের গ্রামের অনেক উন্নতি সাধন করেন; সেখানে একটি ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রাইমারি বিদ্যালয়ের পত্তন করান। তাঁহার উদারতা, স্বাধীনচিত্ততা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা সকলকেই মুগ্ধ করে। ঐ সময়ে তিনি আরও যে সমস্ত কল্যাণমূলক কার্য করিয়াছিলেন সেইগুলির মধ্যে ছিল 'রাজসাহীবার্তা' নামে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদন, দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়ের সাহায্যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন, সম্পাদকরূপে ইহার সুযোগ্য পরিচালন এবং দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৪ সালের মধ্যেই রাজশাহী কলেজে বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন। ('ইতিহাস', ১৩৭৭, পৌষ-চৈত্র, পৃ. ২০৯)

তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানস্পৃহা ছিল এবং আজীবন তিনি অত্যন্ত উৎসাহী অধ্যয়নশীল পাঠকরূপে পরিচিত ছিলেন। ইতিহাস পড়িতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। সেকালে অনেক সময় উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণ স্বদেশে যাইবার পূর্বে তাঁহাদের পুস্তকগুলি বিক্রয় করিতেন। সংবাদ ও

সুযোগ পাইলেই রাজকুমার সেইগুলি ক্রয় করিতেন। এইভাবে তিনি অনেক অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বহু নূতন পুস্তকও তিনি ক্রয় করেন। তাঁহার গ্রন্থাগারটি এইভাবে ইংরাজী, বাঙলা ও সংস্কৃত গ্রন্থে সমৃদ্ধ হয় এবং ইহা পরবর্তীকালে যদুনাথের বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল।

পিতার সম্বন্ধে যদুনাথ বলিয়াছেন, "ধনী, জমিদার সন্তান এবং ইংরাজী শিক্ষিত হলেও তিনি কখন ভোগসুখ বা আড়ম্বর চাহেন নাই; চিরদিন সরল সংযত জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, আমাদের রাজশাহী জেলার সব রকম লোকহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োগ করা। বাঙলার প্রথম যুগের ইংরাজী শিক্ষার সমস্ত সুফলগুলিই তিনি পেয়েছিলেন। অথচ তাঁর চিত্ত শান্তি পেত, বল পেত, বৈষ্ণব ধর্মের এক সরল উদার রূপ হৃদয়ে মেনে নিয়ে, এতে কোন বাইরের ভঙ্গী বা বদ্ধ কুসংস্কার ছিল না। অথচ তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন, কলিকাতায় আসলে দর্শন করতেন।[১] মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা দিয়াচড়ে তাঁহার এক কাঠা জমি ও সম্পত্তি ছিল না, অথচ সেখানকার মুসলমান প্রজাদের নীল কুঠিওয়ালা সাহেবদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি অনেক বৎসর ধরে নিজের খরচে যুদ্ধ করেন, জেলা আদালতে ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা করে, গভর্ণমেন্টের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে, হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে আন্দোলন করে, এমন কি এই সংক্রান্ত দলিল-পত্র ও সরকারী রিপোর্ট ছাপিয়ে তাহা পার্লামেন্টের উদারনৈতিক সদস্যদের জন্য বিলাতে পাঠাতেন।......

...স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য যে ব্যবহার করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য

১. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে রাজকুমার রাজশাহী ব্রাহ্মসমাজের একজন ট্রাষ্টিও হইয়াছিলেন।

তো তিনি পরবর্তীকালে পার্টিশন আন্দোলনের যুগে নিজ বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় গিয়ে নির্ভয়ে বলেছিলেন।" ('আমার জীবন দর্শন,' বেতার জগৎ, ১৯ খণ্ড, ২৩ সংখ্যা, ১৩৭৩ সাল।)

১৮৫৭সালে পাবনার মালঞ্চী গ্রামের (বর্তমান বাংলা দেশে) শ্যামচন্দ্র রায়ের কন্যা হরিসুন্দরী দেবীর (১৮৪৭-১৯০৯) সহিত রাজকুমারের বিবাহ হয়। পত্নী স্বামীর মত আড়ম্বরবিহীন জীবন যাপনে অভ্যস্তা এবং ধর্মপরায়ণা ও পরোপকারিণী ছিলেন।

তাঁহাদের সাত পুত্র তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা, কুমুদনাথ (১৮৬০-১৯৩০), শশিশেখর (১৮৬২-১৯৫১), যদুনাথ (১৮৭০-১৯৫৮), বিজয়নাথ (১৮৭৩-১৯৬৭), অনাদিনাথ (১৮৮০-১৯৫৫), বীরেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯৫৪), অখিলনাথ (১৮৮৫-১৯৫১) সুশীলা সুন্দরী (১৮৬৪-১৯২০), কুন্দমারী (১৮৬৮-১৯৩৮), এবং সুরবালা (১৮৭৬-১৯৬০)।

যদুনাথের জন্ম তারিখ এবং বাল্যে ও যৌবনে শিক্ষা

উপরের তালিকায় দেখা যায় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথের জন্ম হয়। ঐ বৎসর ১০ই ডিসেম্বর (বাংলা ১২৭৭এর ২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার, রাজশাহী জেলার করচমাড়িয়া গ্রামে (বর্তমান বাংলা দেশে) তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মাতাপিতার পঞ্চম সন্তান এবং পুত্রদের মধ্যে তৃতীয়।

তাঁহার শিক্ষা স্বগ্রাম করচমাড়িয়া প্রাইমারি বিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়। সেখানে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর সাত বৎসর বয়সে তাঁহাকে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করা হয়। ঐ স্কুলে প্রায় একবৎসর অধ্যয়নের পর তিনি কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ও তৎপর সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে তিনি

অনেকদিন কেশবচন্দ্রকে দেখিয়াছেন ও অন্যান্য বালকদের সহিত একত্র বসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সংস্কৃত-যন্ত্র-প্রেস-পুস্তকালয়ে তিনি একবার দেখিয়াছিলেন। যদুনাথ বৃদ্ধবয়সেও এইসব কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন।

কলিকাতা হইতে আনিয়া তাঁহাকে আবার রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৭ সন পর্যন্ত ঐ স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া শেষোক্ত বৎসর তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীর সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তৎপর তিনি রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৯ এ তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট স্কলারশিপ মাসিক পঁচিশ টাকা প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষার কিছুদিন আগে জ্বর হওয়াতে তাঁহার ফল আশানুরূপ হয় নাই। পরীক্ষার মাত্র তিনদিন পূর্বে তাঁহার জ্বর ছাড়ে এবং তখন তিনি এত দুর্বল ছিলেন যে, তাঁহাকে পালকিতে করিয়া পরীক্ষার ঘরে লইয়া যাইতে হইয়াছিল।

এইবার তিনি ইংরাজীতে ও ইতিহাসে অনার্সসহ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন এবং ইডেন হিন্দু হস্টেলে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। এখানে অধ্যয়ন ব্যতীত স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রতিও তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী হইলেন। তিনি ফুটবল খেলিতে আরম্ভ করিলেন এবং ইহাতে তিনি প্রভূত সুফলও পাইলেন। ক্রীড়ায় তাঁহার আগ্রহ ও সংগঠনশক্তির জন্য তিনি ইডেন হিন্দু হস্টেলের ফুটবল দলের সেক্রেটারি হইয়াছিলেন। তখন ঐ হস্টেলের সহকারী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন কেশবচন্দ্র রায়। ইনি পরে সাংবাদিকতায় বিশেষ

খ্যাতিলাভ করেন এবং সরকার হইতে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যদুনাথের বন্ধুত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

যদুনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে টনি, পার্সিভাল এবং রো,—এই তিনজন সুযোগ্য অধ্যাপকের নিকট ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি পার্সিভাল ও রো সাহেবের অতিশয় প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৮৯১ এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইংরাজী ও ইতিহাসে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে গুণানুসারে তাঁহার স্থান দ্বিতীয় ছিল। এই কৃতিত্বের দরুন তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

পরবর্তী বৎসর (নভেম্বর ১৮৯২) তিনি ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন। শতকরা নব্বইয়ের উপরে নম্বর পাইয়া এই পরীক্ষায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং একটি স্বর্ণ পদক ও একশত টাকার পুরস্কার লাভ করেন।

ইহার পর তদানীন্তন সরকার আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে যদুনাথ ইহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন এবং স্বদেশে থাকিয়া সেকালের অতি কঠিন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিবার সংকল্প করেন।

অধ্যাপনা, বিবাহ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য প্রস্তুতি ও সাফল্য এবং গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি মাসিক ১৩০ টাকা বেতনে রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরাজীর অধ্যাপকরূপে

যোগদান করেন। প্রথম দিন, যখন তিনি তাঁহার নির্ধারিত ক্লাশে প্রবেশ করিবার পূর্বে বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন তখন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে তাহাদের সহপাঠী মনে করিয়াছিল। প্রথমেই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠনের ভার তাঁহার উপরে অর্পিত হয় এবং এত যোগ্যতার সহিত তিনি এ কর্তব্য সম্পন্ন করেন যে, তাহাতে কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহার উপরে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ঐ বৎসর (১৮৯৩) ১০ই সেপ্টেম্বর (রবিবার), ২৫শে ভাদ্র, যদুনাথের সহিত নাটোরের মধুসূদন চৌধুরীর কন্যা কাদম্বিনী চৌধুরীর বিবাহ হয়। তখন কাদম্বিনী দেবীর বয়স তের বৎসরের কয়েক মাস বেশী ছিল, কারণ তাঁহার জন্ম ১৮৮০-র জুন মাসে (আষাঢ় মাসে) হইয়াছিল। (Making of a Princely Historian)

১৮৯৫ পর্যন্ত যদুনাথ রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং ১৮৯৬-এর জুন মাসে তিনি মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ইংরাজীর অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। ১৮৯৮-এর জুন পর্যন্ত তিনি ঐ কলেজে ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মাসিক বেতন ২০০ টাকা ছিল।

ইতিমধ্যে, তিনি তাঁহার অভীপ্সিত প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তখন এই পরীক্ষা খুবই কঠিন ছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় ঔরঙ্গজেবের আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফার্সী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কারণ ঐ সময়ের আকর উপাদানগুলির প্রায় সমস্ত উক্ত ভাষায় রচিত। এখানে আমাদের দুইটি বিষয় জানিতে বিশেষ কৌতূহল হয়। প্রথমতঃ,—তিনি কেন ইংরাজী সাহিত্যে গবেষণা না করিয়া ইতিহাসে গবেষণা করার জন্য স্থির করিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ,—তিনি কেন

ঔরঙ্গজেবের আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহী হইলেন। প্রথমটি সম্বন্ধে যদুনাথ নিজেই বলিয়াছেন, "আমরা সকলেই নিজ জীবনের আদর্শ বেছে নিই চোখের সামনে যাঁদের দেখেছি, তাঁদের কাজগুলির ভিতরকার মূলমন্ত্র বুঝে, অথবা বই পড়ে অতীতের মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী ভেবে ভেবে।...

"যাঁকে দেখে আমি নিজে জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা ; ...

"ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনিই আমার বালক চিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথম প্লুটার্ক রচিত প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষগণের জীবনী পড়ান। সে বই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল ; আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হ'ল—কি করলে কোনো জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্য সত্যই সার্থক করা যায়।" ('আমার জীবনদর্শন।')

যদুনাথের উপরের কথাগুলি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পিতার প্রভাব ও পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠ করিয়া তাঁহার ইতিহাসের প্রতি অতিশয় আকর্ষণ হয়। এম্. এ. তে ইংরাজী সাহিত্য ভালভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার ইউরোপীয় ইতিহাস পড়িতে হইত, আবার বি. এ. অনার্স পাঠ্যের মধ্যেও এই ইতিহাস তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছে। এইভাবে ইতিহাস বিষয়ক গবেষণার প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

ভারতের ইতিহাস রচনা-প্রণালী তখন অত্যন্ত পশ্চাদবর্তী অবস্থায় ছিল কিন্তু ইউরোপে বহুকাল পূর্বেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। বার্থল্ড্ জর্জ নাইবুর (১৭৭৬-১৮৩১), লিওপল্ড্ ভন্ র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬), থিওডর মম্‌সেন (১৮১৭-১৯০৩) এবং লর্ড একটন (১৮৩৪-১৯০২) বর্তমান যুগে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক

একজন দিকপাল। ইঁহারা প্রত্যেকেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচনার জন্য খ্যাত। নাইবুরই ইতিহাসকে অপ্রধান স্থান হইতে এক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। তথ্যানুসন্ধান, মূল তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ, এবং সত্য প্রতিষ্ঠাই হইল ঐতিহাসিকের কর্তব্য, —এই আদর্শসমূহ তিনি নিজে পালন করিয়াছেন এবং অপরকেও এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন রাঙ্কে, মম্‌সেন্ প্রভৃতিও এইরূপ বৈজ্ঞানিক পন্থা দ্বারা সত্য নির্ধারণের অনুগামী ছিলেন। যদুনাথও ইঁহাদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকরূপে মেকলের উপরে তাঁহার তেমন আস্থা না থাকিলেও মেকলের রচনা-শৈলী তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। এইরূপে যদুনাথ সেই সময়ের উন্নত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের আমলের ইতিহাসকে তাঁহার গবেষণার বিষয় স্থির করিবার কারণও আমরা তাঁহার কথা হইতেই জানিতে পারি। সর্ব-প্রথম তিনি ভারতের মুঘল-রাজত্বের প্রথম যুগকে তাঁহার গবেষণার ক্ষেত্ররূপে স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং বেভারিজ প্রভৃতি পূর্ব হইতে ইহাতে গবেষণা করিতেছেন, কাজেই তিনি ইহার পরিবর্তে ঔরঙ্গজেবের আমল সম্বন্ধে গবেষণা করিতে সঙ্কল্প করেন। ঐ যুগ নানা বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং তাঁহার পূর্বে কেহ এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন নাই।

প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষাতে তাঁহার লিখিতব্য বিষয় ছিল ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, অর্থনীতি ও ইতিহাস। ১৮৯৭ নভেম্বরে তিনি এই পরীক্ষায় সফলকাম হন। ইহার পুরস্কার ছিল একটি স্বর্ণপদক ও সাত হাজার টাকা, পাঁচ বৎসরে প্রাপ্য। এই অর্থের প্রথম দুই কিস্তি পাইবার পর পরীক্ষার্থীকে অপর একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত এবং ইহার জন্য

একটি গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধ দিতে হইত। তাঁহার প্রবন্ধ—'India of Aurangzib: Statistics, Topography and Roads'—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ১৯০১ সালে তিনি উহা সেখানে পেশ করেন; তৎপর তিনি অবশিষ্ট কিস্তিগুলির টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

যে তিনটি আকর গ্রন্থের সাহায্যে তিনি 'India of Aurangzib রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "The book is an attempt to present the topography and statistics of Mughal India, as far as we learn them from the Persian works, Khulasatu-t-Tawarikh,···Dastur-al Amal·· ···and Chahar Gulshan······all three of which are in manuscript." (p. 1.) এই গ্রন্থগুলির প্রথমটি সপ্তদশ শতাব্দীতে, তৃতীয়টি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয় এবং দ্বিতীয়টি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সরকারি রাজস্ব বিবরণ ও ঐ আমলে রচিত।

যদুনাথ তাঁহার পুস্তকে প্রধানতঃ মুঘল আমলের, বিশেষভাবে আকবর ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালীন বিভিন্ন অঞ্চলের পথঘাট, নানা বিবরণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে মুঘল শাসন সংক্রান্ত অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিরও সমাবেশ করা হইয়াছে। 'খুলাসাতু-ৎ-তাওয়ারিখ' ও 'চাহার গুলসানের' কিছু কিছু অংশের ইংরাজী অনুবাদও তাঁহার গ্রন্থে সংযোজন করা হইয়াছে।

এই পুস্তকটি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। তাঁহার চমৎকার লিখন-ভঙ্গী ও গবেষণায় উচ্চমানের পরিচয় প্রথম ইহাতেই পাওয়া যায়।

প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের পরে তিনি ঔরঙ্গজেবের সম্বন্ধে পূর্ণোদ্যমে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার লিখিত ঔরঙ্গজেবের ইতিহাসের কয়েকটি

অধ্যায় তিনি গ্রিফিথ্ পুরস্কারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করিয়া ঐ পুরস্কার [চারিশত পঞ্চাশ টাকা] লাভ করেন। ঐ অধ্যায়গুলি ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা সুজার মুঘল সিংহাসনের নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বিষয়ক।

পরবর্তী অধ্যাপনা-কাল

প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষায় সাফল্যের পরে ১৮৯৮ এর জুন মাসে যদুনাথ কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। তখন তাঁহার মাসিক বেতন দুইশত পঞ্চাশ টাকা হইল। ১৮৯৯-এর জুন মাস পর্যন্ত তিনি এই কলেজে ছিলেন এবং তখন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় [পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল] তাঁহার ছাত্র ছিলেন। শেষোক্ত মাসে বদলি হইয়া তিনি পাটনা কলেজে ঐ একই পদে যোগ দেন। এই কলেজে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় (পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ১৯০১ সনের জুন হইতে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি আবার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বদলি হইয়া পাটনা কলেজে যান এবং ১৯১৭ সনের আগষ্ট পর্যন্ত তিনি ঐখানে থাকেন। যদুনাথের লিখিত চাকরি জীবনের ইতিহাসে তিনি ১৯০১ সনের জুন হইতে নভেম্বর কলিকাতায় বদলির বিষয় লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা ডঃ সরদেশাই উল্লেখ করিয়াছেন। (Jadunath Sarkar Con memoration Vol. I. p. 29.)

১৯০৮ হইতে যদুনাথ পাটনাতে শুধু ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহার বেতনের হার ছিল দুইশত পঞ্চাশ টাকা হইতে ছয়শত টাকা পর্যন্ত। পাঠন ব্যতীত তিনি এখানে ছাত্রদের সহিত খেলাতেও যোগ দিতেন এবং এক বৎসর তিনি এই কলেজের ক্রীড়াদলের সভাপতি ও তিন বৎসর উপ-সভাপতি ছিলেন।

১৯১৭ সনের আগষ্ট মাসে নব প্রতিষ্ঠিত বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে

তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হইয়া যোগদান করেন। সেখানকার উপাচার্য স্যার সুন্দরলালের অনুরোধেই বিহার সরকার তাঁহাকে সেখানে পাঠান। অধ্যাপনা ছাড়া ইতিহাসের নূতন বিভাগটি ও গ্রন্থাগার সাধারণ ছাত্রদের ও গবেষকদের জন্য সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে এখানে যদুনাথ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন।

১৯১৮-তে তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সারভিস-এ উন্নীত হইয়া ১৯১৯ সনের জুলাই মাসে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে কটকের রেভেনশ কলেজে যোগদান করেন। ইংরাজী ও ইতিহাস ব্যতীত তিনি এখানে স্বেচ্ছায় বাঙলাও পড়াইতেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় উড়িষ্যার ইতিহাসে গবেষণার নব উদ্যম ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। তাঁহার পাঠনরীতি, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য এখানেও তিনি ছাত্রদের খুব প্রিয় হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো তখন কটকে ছিলেন, তিনি যদুনাথের পাঠনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Whatever he spoke appeared to be a finished work of art to intellectuals coming out in graceful flow and with the vision of a seer. (Commemoration Vol. I. p. 47.)

১৯২৩ সনের অক্টোবর মাসে যদুনাথ পুনরায় পাটনাতে বদলি হইয়া যান এবং ১৯২৬ এর আগষ্ট মাসে তিনি অধ্যাপনা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা এত অবিচলিত ছিল যে, অবসর গ্রহণের দিনও তিনি নির্ধারিত প্রত্যেক শ্রেণীতে পূর্বের ন্যায় নিয়মিত পাঠনে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই।

পড়াইবার সময়ে তিনি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার উদ্রেকের উপরে বিশেষ জোর দিতেন, কারণ তাহা না হইলে স্ব স্ব ভাব বিকাশ ও সমুচিত বুদ্ধির স্ফুরণ হয় না। বিদ্যার্থিগণের চরিত্র গঠনের উপরেও তিনি যথাযথ মনোযোগ

দিতেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চরিত্রের ও মানসিক শক্তির বিকাশ দেখিয়াই সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর সমালোচনা করিতে হইবে।"

ইংরাজীতে রচিত ইতিহাস পড়িতে ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা বুঝিতে ছাত্রদের যে কত অসুবিধা হয়, তাহা তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করিতেন এবং সেইজন্য তিনি পাটনাতে প্রয়োজনমত হিন্দিতেও বক্তৃতা দিতেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হউক, ইহাই তাঁহার কাম্য ছিল। (Modern Review 1916, p. 562).

শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য ব্যায়াম ও খেলাধূলা যে অপরিহার্য সেই দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল এবং তিনি যখন যেখানেই থাকিতেন ছাত্রদের সহিত খেলায় যোগ দিতেন ও তাহাদের এই বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার মতে ক্রীড়া নির্দোষ আনন্দের মাধ্যমে মনের শূন্যতা দূরীকরণ ও শারীরিক উন্নতি বিধানের সহায়ক এবং ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও ও নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করিবারও এক উত্তম উপায়। সর্বোপরি, তিনি মনে করিতেন, খেলার মাঠে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অবাধ ও অসঙ্কোচ মেলামেশার ফলে একে অপরকে ভালভাবে জানিবার সুযোগও পায় এবং ইহাতে তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক নিকটতর হয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তিনি নিজেও ছাত্রদের সঙ্গী হইয়া এইরূপ ভ্রমণে সময়ে সময়ে নেতৃত্ব করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক স্থানগুলির বর্ণনা এত সুন্দর হইত যে, ঐগুলি যেন ছাত্রদের মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যাইত।

বাহিরের কোন প্রভাব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে ব্যাঘাত জন্মাইলে তিনি খুব রুষ্ট হইতেন। সাধারণতঃ ছাত্রদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার ছিল স্নেহ ও মমতায় ভরা।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর যদুনাথ ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সারভিসের জন্য সরকারের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন সেই আবেদনপত্রটির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা হইতে সংগৃহীত হইয়া ইহা ১৯৭০ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যার বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে যদুনাথের নিজের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

Bengal Past and Present

July—December 1970.

65.

Educational Appointments in India

1. Name in full—Jadunath Sarkar
2. Address—C. Hindu College, Benares City P. o.
3. Age last birthday, with date and place of birth—Age 46 years. Born 10th December 1870, in Rajshahi District, North Bengal.
4. Married or Single (Number and ages of Children, if any)—Married Has 7 children aged 21, 15, 13, 12, 6, 5, years and 11 months respectively.
5. Health (past and present) good (Never took Medical leave.)
6. Father's name, nationality, and occupation (State whether living or dead) Rajkumar Sarkar, Bengali

Jamindar, awarded a certificate of honour at the Delhi Durbar. Now dead.

7. Post and approximate salary desired—Specialist for a research chair.
8. Duration of visits or residence abroad. Has visited all the provinces of India, but never been to Europe.
9. Names of districts abroad of which the applicant has special Knowledge.
10. Particulars and dates of any important appointments: e. g., Head Masterships, or Principalships, Administrative posts, University Professorships, Lectureships, or the like, for which the applicant has stood or is standing. University Lecturer in History under the Calcutta University, 1910—1917.

    University Professor of History and Head of the Department of History at the Hindu University of Benares from August 1917.
11. Athletics (a) Experience in organizing games; (b) proficiency in Athletics.

    (b) President, Patna College Athletic club for one year; Vice-President, Patna College Athletic club for three years. As secretary, Inglis Football Shield Committee, organized games among the Hi h Schools of S. Bihar for six years.
12. Date of application—2nd November 1917.

18. References :—

1. Name—Mr. H. R. James, M. A.

Address—C/o. India office, London.

Occupation or position—Late Principal, Presidency College, Calcutta

2. Name—Mr. C. Little, M. A.

Address—C/o. India Office, London.

Occupation or position—Late Principal, Patna College.

(These should be persons resident in the United Kingdom, who have known the applicant intimately, and are in a position to answer any enquiries that may be made of them. They should not be relations, and should be holders of responsible positions, who are acquainted with the applicant's character and work in recent year. The names of officers of the Board of Education should not be given.)

19. Copies of testimonials from—

Original testimonials may be required, should the applicant be selected for interview. Copies of testimonials should be submitted in-duplieate.

20. Observations :—Can teach English, Political Economy, or History. Languages known—Sanskrit, Persian and

Marathi, besides Bengali, Urdu and Hindi. Literary work—Vide annexure. (Not available.) Subjects the applicant is prepared to teach ; any special qualifications or experience (e. g., in music and singing, commercial subjects, languages, literary work, organization or inspection) not mentioned under heads 13—17 above, should be given.

21. "Declaration by candidate."

I Jadunath Sarkar (Name in full), a candidate for employment in the Department of the Government of Bihar and Orissa, do hereby declare that I have not at any time been pronounced unfit for Government employment by the Medical Board at the India office in England.

Dated 2nd November 1917. — (Sd./-) Jadunath Sarkar, Signature of Candidate

From National Archives of India.

'Making of a Princely Historian' পুস্তকে (৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠার মধ্যে) যদুনাথের নিজের লেখা হইতে জানা যায় যে, বাঙলা সাল অনুযায়ী তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ২৬ অগ্রহায়ণ, ১২৭৭ (১০ ডিসেম্বর, ১৮৭০)।

শিক্ষাবিদ্ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

স্বদেশের শিক্ষার উন্নতির প্রতি যদুনাথের চিরকাল গভীর আগ্রহ ছিল। ১৯২২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাহার একটি চিঠি হইতে ইহা খুব ভালভাবে বুঝা যায়; তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি উনত্রিশ বৎসর কলেজে পড়াইয়াছি, এবং আমার মৌলিক গবেষণা ছাড়িয়া দিন, —আমি শিক্ষার পদ্ধতি ও দেশের অবস্থার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছি।" অপর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি পেশাদার গুরুমহাশয়, মস্তিষ্কের (হৃদয়ের নহে) পণ্ডিত তৈয়ারি করিবার চেষ্টা করি। যেখানে এই ব্যবসায়ের ওস্তাদের আবির্ভাব বা নূতন আদর্শ প্রণালীর কথা শুনি, সেখানেই দেখিতে যাই। সতীশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ন্যাশন্যাল কলেজ দুবার, বোলপুর তিনবার এবং গুরুকুল একবার পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু কাহারই আদর্শ ও প্রণালী সর্বাঙ্গীণ গ্রহণ করিতে পারি নাই।" "আমি এখনও মানিতে প্রস্তুত নই যে বর্তমান ভারত জগৎকে দিতে পারে শুধু সেই খ্রীষ্টপূর্ব যুগের বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য, তন্ত্র ভাষ্য, নব্যন্যায়ের কচকচি,…আলিপনার নক্‌সা; অথবা মুঘল চিত্রের সাত নকলের খাস্তা। ভারতবর্ষ যে বিংশ শতাব্দীতেও জগৎকে exact knowledge দিতে পারে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের scientific ইতিহাস রচনা করিতে পারে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি rechauffe বা অনুকরণ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া 'জগৎসভার মাঝে' গ্রহণীয় নূতন জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে পারে—এ-বিশ্বাসটাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ছাড়িতে চাহি না।" (প্রবাসী, ১৩৫২, ৪৮৬, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আমাদের দেশ স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হউক, তাহা তিনি

মনেপ্রাণে কামনা করিতেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি-কলেজ-শত-বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষার উচ্চমান ইংরাজ শাসনকাল অপেক্ষা বর্তমানে আরও বেশী প্রয়োজন। জাতীয় প্রতিরক্ষা বিধান স্বাধীন দেশের সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু ইহার পরেই এই দেশকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা, কারণ, ইহা চিরকাল অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে পারে না: "India cannot afford to remain for ever an intellectual pariah, a beggar for crumbs at the doors of Oxford or Cambridge, Paris or Vienna. She must create within herself a source of the highest original research and assume her rightful place as the School of Asia, even as Pericleian Athens made herself the School of Hellas." (Calcutta Presidency College Centenary Volume, 1955, p. 324.)

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য কি রকম অধ্যাপক ও ছাত্র চাই সেই বিষয়ে তাঁহার সুনিশ্চিত অভিমত ছিল,—"(১) প্রতি বিভাগে সর্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং সেই প্রণালীতে কাজ করিবার উপযোগী শিক্ষা (অর্থাৎ intellectual discipline and exact knowledge) পূর্বেই পাইয়াছে এমন ছাত্রমণ্ডলী, (৩) শিক্ষায় পরিপক্ক সচ্চরিত্র একনিষ্ঠ প্রধান নেতা।" (প্রবাসী, ১৩৫২, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি অনেক বাস্তব-সম্মত মতামত প্রকাশ করিতেন। ১৯২২ সালে "An Educational Programme for Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে কলেজের শিক্ষা

পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "The most crying need of Bengal to-day is the improvement of secondary education. It is the keystone of our educational arch, and the entire system, primary and university, depends upon it." যদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি প্রকৃতই ভাল হয় তাহা হইলে ইহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক অপরদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশ্বস্ত কর্মী পাঠাইতে পারিবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী কিছু সংখ্যক ছাত্রও তৈয়ার করিতে পারিবে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদ্বারা সত্য সত্যই উপকৃত হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা এত পুঁথিগত ও সঙ্কীর্ণ যে, ইহাতে ছাত্ররা ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগ্য অথবা কলেজের শিক্ষার প্রকৃত উপযোগী কোনটাই হইতে পারে না। এই শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্তনের বাস্তব সম্মত পথের সন্ধানও তিনি দিয়াছিলেন। (Modern Review. July, 1922) বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের প্রতি তিনি চিরকাল সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধির কথা তিনি অত্যন্ত জোরের সহিত মাঝে মাঝেই ব্যক্ত করিতেন। শিক্ষার প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি তাঁহার যে শুধু সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তাহাই নহে, স্বদেশের কল্যাণের দিকে তাকাইয়াই তিনি তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিতেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা দোষ-ত্রুটি তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই এবং সেইগুলি সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে ১৯২২ হইতে ১৯২৫-এর মধ্যে মডার্ণ রিভিউতে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ছিল প্রশাসন, পরীক্ষা-পরিচালন ও শিক্ষার মান প্রভৃতি সংক্রান্ত।

১৯২৬-এ অবসরগ্রহণের পূর্বে যদুনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্যের পদে নিয়োগের আদেশ প্রাপ্ত হন। এই পদ তখন অবৈতনিক ছিল। এই বিষয়ে ২০-এ জুন তিনি তাঁহার বন্ধু সরদেশাইকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন উহা হইতে এই পদ প্রাপ্তিতে তাঁহার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "But all my plans have been upset by the Bengal Government appointing me Vice-Chancellor of the Calcutta University for two years from 24th August 1926. It is a purely honorary post, and I shall lose Rs. 6,000 in the course of the next five months, by having to go to Calcutta in August next. In addition, life at Calcutta will cost me an additional expenditure of Rs. 12,000. during the two years of my term as V. C. And I shall have to bid good bye to historical research during that period instead of being able to devote all my time, as a pensioner, to my literary work. But I have accepted the post in the sole hope of serving my countrymen by reforming the Calcutta University. God only knows whether I shall succeed .." (Commemoration Vol. I. p. 3, foot note.)

উপাচার্যের পদে যোগ দেওয়ার পরে যদুনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেন। ফাঁকি দেওয়া তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল এবং তিনি প্রতিদিন বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন দূরীকরনার্থ অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করা, ও ছাত্রদের মাসের পর মাস অনাদায়ী মাহিনা

আদায় করিবার ব্যবস্থা করান এবং বিভিন্ন বিভাগে বিশৃঙ্খলা, কাজে অবহেলা প্রভৃতি, দূর করিবার জন্যও তিনি বিশেষ নজর দেন। শিক্ষা ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত কার্যের উন্নতি বিধানের দিকেও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু যে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তাঁহাকে কার্য করিতে হইয়াছিল তাহাতে দুই বৎসরের মধ্যে সংস্কারের কাজে তেমন অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই। ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগলের সহিত যদুনাথের বিশেষ পরিচয় ছিল। যদুনাথ তাঁহাকে বলিয়াছেন, "আমি দু'বছর ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলাম। এড্মিনিষ্ট্রেশানের দিকে কিছু কিছু সংস্কার করতে পেরেছি। শিক্ষার সংস্কার কিছুই করতে পারিনি। ৩৭.ন আমার কাজে খুব বাধা পেয়েছি। ...আমি যখন সরকারি চাকরি থেকে অবসর নি, তখন দু'বছরের জন্য নূতন একটি সরকারি কাজের প্রস্তাব আসে। আমি তা গ্রহণ না করে কিছু ভাল কাজ করতে পারব বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সে-লারের পদ গ্রহণ করি। ঐ সরকারি পদের বেতন ছিল মাসে বার-তের শ' টাকা। এই দু'বছরে আমি ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি স্বীকার করেছি। তবে কি জান, দেশের কাজ কিছু করতে হলে ত্যাগ স্বীকার চাই। এই মনোবৃত্তি আমাদের ভেতর বাড়াতে হবে।" (বরণীয়, ১৬৮ পৃষ্ঠা)। কলিকাতায় দুই বৎসর অবস্থান ও অত্যধিক কাজের চাপে যদুনাথের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। সুতরাং দ্বিতীয়বার তাঁহাকে ঐ পদে নিয়োগের প্রস্তাব হইলে তিনি ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। এই বিষয়ে তিনি ১৯২৮-এর ৪ঠা আগষ্ট সরদেশাইকে লিখিয়াছিলেন, "Hurrah! I am a freeman again, and feel cheerful like a bird escaped from its cage. My term expires on the 7th instant and I have declined, on grounds of health, to accept another term. My successor (Dr. W. S. Urquhart, Principal of the scottish

Mission college) has been appointed." (Commemoration Vol. I. p 3 foot note.)

ঐতিহাসিক যদুনাথ

অসামান্য কৃতী ঐতিহাসিকরূপেই যদুনাথ সর্বজন-পরিচিত। সাহিত্যিক-রূপেও তিনি তাঁহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মুখ্যতঃ ইতিহাসই তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল এবং তাঁহার ঐতিহাসিক রচনা দ্বারাই তিনি বঙ্গসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভারত-ইতিহাসে তাঁহার প্রথম রচনা 'Fall of Tipu Sultan'; এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "My first 'baptism of ink' in the field of Indian history was a study of the Fall of Tipu Sultan ; which I printed in my College Magazine just after graduation (1891). It was based entirely on English books and despatches, all available in print." (A Chapter of My Life, Modern Review, 1958, P. 22.) ইহা যে গবেষণামূলক রচনা নয় তাহা তিনি নিজে স্বীকারও করিয়াছেন। ১৮৯৭ এর পরে তিনি প্রকৃত মৌলিক গবেষণা-কার্যে মনোনিবেশ করেন।

তাঁহার অপর একটি রচনাতে ঐ সময়ে আমাদের এখানে প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণার অভাব এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের অপ্রতুলতার বিষয়ে উল্লেখ করিতে গিয়া ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচিত সিরাজ উদ্-দৌলার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, অক্ষয়কুমার পুরাতন রীতির পরিবর্তে সমালোচনামূলক নূতন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার তথ্যের একমাত্র উৎস ছিল ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকসমূহ, এমন

কি ফার্সীতে লিখিত 'সিয়ার-উল্-মুতাখেরিণ'ও নয় কারণ তিনি ঐ ভাষা জানিতেন না। হিলের এর **Bengal in 1756-7** আরও দশ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়এবং চন্দননগর-ফরাসী ফ্যাক্টরির চিঠি পত্র ইহারও পরে বাহির হয়। (**'A Word to Research workers in Indian History 'Bengal past and Present', 1957, Part 1. p. 1.**)

যদুনাথের **'India of Aurangzib : Statistics, Topography and Roads'**, এর বিষয়ে আগেই বলা হইয়াছে।

তাঁহার ঐতিহাসিক রচনা সমূহের আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহার ইতিহাস-রচনা-পদ্ধতিব বিষয়ে আমাদের পবিচিত হওয়া দরকার। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন, "যদুনাথ বর্তমান ভারতের বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস রচনা-প্রণালীর জনক আখ্যা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে যথার্থভাবেই রাঙ্কে, নাইবুর ও মম্‌সেনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতে ইতিহাস রচনা-প্রণালীকে উন্নত করিবার কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই।" (**Historiography in Modern India, R. C. Majumdar, p. 28**) যদুনাথ যে বৈজ্ঞানিক পন্থাকেই ইতিহাস চর্চার শ্রেষ্ঠ পন্থারূপেগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মতেও "অতীতকাল সম্বন্ধে অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ সত্য উপলব্ধি করাই ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য।" "সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকে।" সত্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সকল অনুরাগ, বিরাগ, লাভের আশা ও সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করিয়া তিনি সব সময়ে নিরপেক্ষভাবে কার্য করিয়া যাইতেন। তাই তিনি বলিতেন, "সত্য প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক, আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। ...সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়,

সহিব ; কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব।" (ইতিহাস, ১৩৭৭, পৃ. ২৩০) ১৯৪৩ সনের ২৫এ আগষ্ট তিনি সরদেশাইকে লিখিয়াছিলেন, 'My sole interest is the discovery of truth from unassailable sources, and I am not so vain as to feel hurt if any statement in a book of mine is contradicted by later discovered (or published) Sources. For, unless such continual supercession is welcomed progress in human knowledge would be inpossible." [Commemoration Vol. I p. 239.) সত্য নির্ধারণের জন্য যদুনাথ প্রয়োজনীয় সকল পন্থা অবলম্বন করিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রামণিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। ...প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা।" তাঁহার অভিমত সুস্পষ্ট—"No document, no history" (Commemoration Vol. I., p. 248.) অপর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "The first and most indispensable condition of historical research is access to original documents." (House of Shivaji, p. 273.) রাঙ্কে যেমন মৌলিক তথ্যের সন্ধানে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন যদুনাথও তেমনিই একই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া অনেক মৌলিক মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে রামপুর (রোহিলখণ্ড), হায়দরাবাদ ও (পাটনার) খুদাবক্স-গ্রন্থাগারগুলি তিনি পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ও বারাণসী প্রভৃতি স্থান হইতেও তিনি অতি প্রয়োজনীয় বহু উপাদান পাইয়াছেন। তিনি কখনও ভারতবর্ষের বাহিরে যান নাই, কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের তালিকা পাঠ করিয়া সেই স্থান হইতে পুঁথি ও দলিলের ফটো-

গ্রাফ বা অন্য উপায়ে তাহাদের নকল করাইয়া আনিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "After 1897 when I set myself to making truly original researches in Indo-Muslim history, I devoted my-resources mainly to acquiring Persian, Marathi and French manuscripts and printed volumes of state-papers (despa tches). The result is that ..it has brought together in one place the necessary works which were scattered in many towns of India and the famous public libraries of Europe (India Office, British Museum, the Bodleian, the Bibliotheque Nationale of Paris, and the then Royal Library of Berlin, besides Kazvini's metrical history of Nadir Shah of which there is only one MS. in the world, in Leningrad.) Of these last I have secured photographs. (A Chapter of my Life, Modern Review, 1958, p. 22.)

বিভিন্ন ভাষায় রচিত মৌলিক উপাদান ব্যবহারের জন্য তাঁহার বহু ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। ইংরাজী, বাঙলা, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দুতে তিনি পূর্বেই পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। পরে তিনি শিখিলেন ফার্সী, মারাঠী, পর্তুগীজ, ফরাসী, অসমীয়া ও রাজস্থানী (ডিঙ্গল) ভাষা।

মৌলিক উপাদানের সঠিক মূল্য নিরূপণের ঐকান্তিকতায় তাঁহার এই সমস্ত উপাদানের বিশ্লেষণ ও বিচারের মানদণ্ড সব সময়ে অতি উচ্চ থাকিত। লেখকের ব্যক্তিত্ব, তাঁহার সংবাদের উৎস, তাঁহার মানসিকতা এবং কোন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তিনি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন কিনা প্রভৃতি; যদুনাথ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিতেন। তিনি বর্তমান

ঐতিহাসিকদের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতেও তাঁহার বিচারের মাপকাঠি বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন, 'ইতিহাস লেখক ব্যক্তিগত ভ্রম সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। একই ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রুপক্ষ ইহা বলিয়াছে, মিত্র-পক্ষ উহা বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী কবি ওরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন সাক্ষীটি বিশ্বাসযোগ্য এবং কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে তবে অতীত ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়।" (ইতিহাস, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৭, পৃ. ২৩৬)।

তাঁহার রচনা যাহাতে সুন্দর ও সুখপাঠ্য হয় সেইদিকেও যদুনাথের মনোযোগ ছিল। তিনি ১৯৪৩-এর ২৯ জানুয়ারী সরদেশাইকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "Please remember that the elements of a good prose style include not merely the choice of apt phrases, but also the judicious and most effective marshalling of the facts, the order of development of the parts of theme or proposition you intend to prove, and the proper proportion in the length of the different parts." (Commemoraion Vol. I. p. 233.) ঐতিহাসিক দিলীপকুমার বিশ্বাস যথার্থই বলিয়াছেন, "সারবত্তা ও প্রাণবত্তার এখন মণিকাঞ্চন সংযোগ এ যুগে অন্য কোনও ভারতীয় ঐতিহাসিকের লিখনশৈলিতে দেখা যায় না। ......প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্বহেতু তাঁর রচিত ইতিহাস, স্বরূপ অবিকৃত রেখেও সাহিত্য হয়ে উঠেছে।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৬৩ পৃষ্ঠা)। তাঁহার পুস্তকে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পঞ্জীর-উল্লেখ করিতে তিনি কখনও ভুলিতেন না। কারণ এইগুলি দেখিয়া পাঠকেরা

তাঁহার রচনার প্রামাণিকতা বুঝিতে পারিবে এবং যদি কেহ কোন বিষয়ে আরও বেশী জানিতে আগ্রহী হয় তাহা হইলে এইরূপ প্রমাণপঞ্জী তাহার সহায় হইবে।

মুঘল যুগ সম্বন্ধে যদুনাথের জীবন-ব্যাপী গবেষণার বিস্তৃতি কতদূর হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত **Fall of the Moghal Empire**-এর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছেন, **"The study of the Mughal Empire which I began with my India of Aurangzib : Statistics, Topography and Roads (printed in 1901), has come to its end with the extinction of that empire which is the subject-matter of the present volume. The events of nearly half the reign of Shah Jahan and the whole of Aurangzib's are covered in my History of Aurangzib in five volumes, with a supplementary work Shivaji and his Times. Then follows M Irvine's Later Mughals (1707-1738) in two volumes and edited and continued by me, and lastly this Fall of the Mughal Empire (1738-1803) in four volumes." (Fall of the Mughal Empire, Vol. Iv, 1972 edition, p. III.)** ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ History of Aurangzib পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে (শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র) ঔরঙ্গজেবের জন্ম হইতে ১৬৫৮-র এপ্রিলের ১৪ তারিখ পর্যন্ত, প্রধানতঃ তাঁহার জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলী-সংক্রান্ত ইতিহাস, যেমন তাঁহার

শিক্ষা, সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজ্যপালরূপে কার্য, কান্দাহার দুর্গ অবরোধ, ১৬৫৭-তে শাহজাহানের গুরুতর পীড়ায় চারি ভ্রাতার (দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের) মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের উদ্যোগ-পর্ব এবং সর্বশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার বিরুদ্ধে উজ্জয়িনীর ১৪ মাইল দূরে ধর্মটে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনীর উপস্থিতি (১৪ই এপ্রিল, ১৬৫৮)। দ্বিতীয় খণ্ডে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের বিস্তৃত ও নিপুণ বর্ণনা আছে। ১৬৫৮-র ১৫ই এপ্রিল ও ২৯ মে যথাক্রমে ধর্মট ও শামুগড়ের যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করিয়া ঔরঙ্গজেব পিতাকে আগ্রা দুর্গে কার্যতঃ বন্দী করিলেন এবং ২১-এ জুলাই তিনি দিল্লীতে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তখনও সুজা অপরাজিত ছিলেন। তাঁহাকে এবং পুনরায় দারাকে পরাজিত করিয়া ১৬৫৯-এর ৫ই জুন অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত ঔরঙ্গজেব দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ বছর আগষ্ট মাসে দারাকে এবং ১৬৬১-সালের ডিসেম্বরে মুরাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সুজা আরাকানে পলায়নের পরে সেখানে নিহত হইলেন। এই সবই দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়-বস্তু। যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করা সাধারণতঃ একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। কিন্তু যদুনাথের লিখন-শৈলির অদ্ভুত ক্ষমতায় এই বর্ণনাগুলি খুবই সজীব ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল (১৬৫৮-১৭০৭) পরবর্তী তিনখণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। ১৯১৬ তে তৃতীয় খণ্ড ১৯১৯-এ চতুর্থ খণ্ড এবং ১৯২৪-এ পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালকে স্বাভাবিক কারণে প্রায় সমান দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ১৬৫৮ হইতে ১৬৮১ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব উত্তর ভারতে অবস্থান করিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছেন এবং সেই সময়ে তাঁহার কর্মকাণ্ড প্রধানতঃ উত্তর ভারত-কেন্দ্রিক ছিল, দক্ষিণ ভারত তেমন গুরুত্ব পায় নাই। ইহাই তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু।

হিন্দুদের প্রতি তাঁহার বৈষম্যমূলক কার্যাদি ও সেগুলির প্রতিক্রিয়া এই খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিকের কর্তব্যরূপে যদুনাথ ঔরঙ্গজেবকে সঠিকভাবে বুঝিবার জন্য ভারতের বাহিরে মুসলমান-ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস কয়েক বৎসর যাবৎ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৬৮২ হইতে ১৭০৭ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে ছিলেন এবং সেই সময়ে সাম্রাজ্যের যাবতীয় কার্য ঐ স্থান হইতেই পরিচালনা করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্বহেতুই তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী ও সম্ভবমত সমস্ত রকম সহায় সম্বল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যেই পরলোক গমন করেন। যদুনাথ চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডেও দাক্ষিণাত্য-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ডের বিষয়-বস্তু ১৬৪৫ হইতে ১৬৮৯ পর্যন্ত ঐ স্থানের ইতিহাস—মারাঠা শক্তি ও শিবাজীর উত্থান, তাঁহার কার্যাবলী ও কৃতিত্ব, তাঁহার পুত্র শম্ভুজীর রাজত্ব ও মৃত্যু (১৬৮৯) এবং ঔরঙ্গজেবের বিজাপুর (১৬৮৬) ও গোলকোণ্ডা (১৬৮৭) বিজয়কাহিনী প্রভৃতি, এই খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু তৎপর তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয় আরম্ভ হয়। এইজন্য যদুনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, "All seemed to have been gained by Aurangzib now; but in reality all was lost. It was the beginning of his end. The saddest and most hopeless chapter of his life now opened." তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মুঘল সাম্রাজ্য এত বিরাট হইয়া পড়িল যে, ইহা একজন মানুষের পক্ষে বা একই কেন্দ্র হইতে শাসন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। শত্রুরা সর্বত্র বিদ্রোহী হইল। উত্তর ও মধ্য ভারতের অনেকাংশে

অরাজকতা চলিতে লাগিল। প্রশাসনকার্য শিথিল ও দুর্নীতিগ্রস্ত হইল এবং দাক্ষিণাত্যের অফুরন্ত যুদ্ধে রাজকোষ নিঃশেষিত হইল। প্রথম নেপোলিয়ন বলিতেন "স্পেনীয় ক্ষতই আমাকে ধ্বংস করিয়াছে।" দাক্ষিণাত্য-ক্ষত ঔরঙ্গজেবকে ধ্বংস করিল। (Vol. IV. ch. 48.)

পঞ্চম খণ্ডে শম্ভুজীর মৃত্যুর পরে মারাঠাদের সহিত ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধের বিবরণ ও আলোচনা ছাড়া ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালীন বঙ্গদেশ, মালব, গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড ও কাশ্মীর প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আলোচনা, দাক্ষিণাত্যে ক্রমাগত যুদ্ধের জন্য সাম্রাজ্যের, বিশেষভাবে সেখানকার কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির দুরবস্থা এবং সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রভৃতিও আলোচনা করা হইয়াছে। সর্বশেষ অধ্যায়ের শেষ অংশে যদুনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ : "The failure of an ideal Muslim king like Aurangzib with all the advantages he possessed at his accession and his high moral character and training,– is, therefore, the clearest proof the world can afford of the eternal truth that there cannot be a great or lasting empire without a great people, that no people can be great unless it learns to form a compact nation with equal rights and opportunities for all,······a nation whose administration is solely bent upon promoting national,as opposed to provincial or sectarian interests,– and a society which pursues knowledge whithout fear, without cessation, without bounds. It is only in that full light of goodness and truth that an Indian nationality can grow to the full height of its being." (Vol. V. ch. 63.)

ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস প্রণয়নে যদুনাথ ফার্সী ভাষায় রচিত সমসাময়িক অনেক মৌলিক পুঁথি, দলিল, মুঘল সরকারের কাগজ-পত্র মুঘল দরবারের দৈনিক ইশ্‌তিহার (bulletin), সরকারি আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ, বে-সরকারি ইতিহাস, ঔরঙ্গজেব, তাঁহার পিতা, ভ্রাতৃগণ পুত্রপৌত্রগণ এবং রাজকর্মচারী প্রভৃতি অন্যান্য অনেক সমকালীন ব্যক্তির চিঠিপত্র ব্যবহার করিয়াছেন। ঔরঙ্গজেব ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের পাঁচ হাজারের বেশী চিঠিপত্র যদুনাথের নিজের নিকটেই সংগৃহীত ছিল। তিনি মারাঠী ভাষায় রক্ষিত তথ্যাদি, অসমীয়া বুরঞ্জী ও সমসাময়িক ফরাসী, পর্তুগীজ ও ইংরাজী দলিলপত্র এবং বিদেশীদের প্রদত্ত বিবরণও ব্যবহার করিয়াছেন।

হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস সম্বন্ধে যদুনাথ তৃতীয় খণ্ডে আখ্‌বরাৎ ও সমসাময়িক বিশ্বস্ত মুসলমানগণের রচিত ইতিহাস হইতে উদ্ধৃতি দিয়া সন্দেহাতীতভাবে নিজ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত উপরি উক্ত পাঁচ খণ্ড পড়িলে ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। একদিকে যদুনাথ যেমন এই সম্রাটের গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তেমন তাঁহার দোষ ত্রুটিও দেখাইয়াছেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্ত তথ্য যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ঔরঙ্গজেবকে বিচার করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বেভারিজ সমালোচনায় লিখিয়াছেন, "Jadunath Sarkar may be called Primus in India as the user of Persian authorities for the history of India. He might also be styled the Bengali Gibbon······The account of Aurangzib in the 3rd and 4th volumes is exceptionally good."

বহু জনের অনুরোধে ১৯৩০-এ যদুনাথ পাঁচ খণ্ডের ঔরঙ্গজেবের

ইতিহাসের একটি এক-খণ্ডের সংক্ষেপসার 'A Short History of Aurangzib' প্রকাশ করেন। হিন্দীতেও ঔরঙ্গজেবের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করা হয়।

১৯১২-তে তিনি হামিদ্-উদ্-দীন্ খান্ বাহাদুর আরোপিত Ahkam--i-Alamgiri-র ইংরাজী অনুবাদ, ঔরঙ্গজেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দশটি প্রবন্ধ সহ 'Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। উপরি উক্ত অনুবাদ, ঔরঙ্গজেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং Ahkam-i-Alamgiri-র মূল ফার্সী ১৯১৫-তে 'Ahkam-i-Alamgiri' নামে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে মূল ফার্সী পুস্তক, ইহার অনুবাদ এবং প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে মুদ্রিত হয় এবং ইহাদের নাম প্রদত্ত হয় যথাক্রমে—Ahkam-i-Alamgiri (১৯২৫), Anecdotes of Aurangzib (১৯২৫), এবং Studies in Mughal India (১৯১৯)—শেষোক্তটি সহিত বারটি প্রবন্ধ সংযোজন করিবার ফলে ইহাতে মোট ২২টি প্রবন্ধ হয়। Anecdotes of Aurangzib ও Studies in Mughal India-তে ঔরঙ্গজেবের সংক্ষিপ্ত জীবনীও মুদ্রিত হয়। ১৯৩৩-এ 'Studies in Aurangzibs reign' প্রকাশিত হয়।

১৯১৯-এ যদুনাথের 'Shivaji and his Times' প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৯ সনে তিনি শিবাজীর জীবনী (সংক্ষিপ্ত) বাঙলা ভাষায়ও প্রকাশ করেন। 'শিবাজী'র হিন্দী (১৯৩৩) এবং মারাঠী অনুবাদও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়।

Shivaji and his Times রচনায় যদুনাথ সমসাময়িক বহু নূতন ও অমূল্য উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন এবং শিবাজীকে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, বলা বাহুল্য, শিবাজীর দোষ-ত্রুটিও তিনি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যান নাই। ফার্সী, মারাঠী, পর্তুগীজ, ইংরাজী, ফরাসী

ও রাজস্থানী (ডিঙ্গল) প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বহু সমসাময়িক তথ্যাদি তিনি যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে কেহই এমন করেন নাই। **Grant Duff** এর পুস্তকের অনেক ভুল যদুনাথ কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। শিবাজীর উপরে অন্যায়ভাবে যে সব কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছিল সেইগুলি দূর করিয়া যদুনাথ তাঁহার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করিয়াছেন। এই বিষয়ে অন্ততঃ একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৬৫৯-এ বিজাপুর-সরকার আফজল খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। আফজল খাঁ তাঁহাকে এক সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলে শিবাজী তাহা গ্রহণ করেন এবং সাক্ষাৎকারের স্থান প্রতাপগড় দুর্গের পাদদেশে স্থির হয়। ডাফ্ লিখিয়াছেন যে, ঐ সাক্ষাতের সময়ে শিবাজী আফজলকে প্রথম আক্রমণ করেন, কিন্তু যদুনাথ ইংরাজ ফ্যাক্টরীর একটি সমসাময়িক পক্ষপাতহীন ও বিশ্বাসযোগ্য চিঠি ও পুরাতন মারাঠা ঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আফজলই শিবাজীকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহাকে কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তবুও যদুনাথ নিজের মতেই অটল রহিলেন এবং ধৈর্যের সহিত আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুসলমান ঐতিহাসিক ও নিজাম্-উল্-মুল্ক-এর মন্ত্রী মীর আলমের প্রামাণিক বিবরণ পাইয়া তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত সঠিক হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার পূর্বের মতই বহাল রাখিলেন।

সত্য উদ্ঘাটনের জন্য তিনি সারাজীবন এইরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই তাঁহার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থ পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। বিশ্বাসযোগ্য নূতন উপাদান পাইলে তিনি তাহা পরবর্তী সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করিতে

দ্বিধা করিতেন না। ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্তব্য এবং যদুনাথ অক্ষরে অক্ষরে এই কর্তব্য পালন করিয়াছেন।

Shivaji and his Times সম্বন্ধে বেভারিজ বলিয়াছেন, "All his Jadunath's books are good ; Perhaps the best of them is the Life and Times of Shivaji." Sir R. C. Temple এর মতে "The book is indeed History treated in the right way and in the right spirit."

শিবাজী সম্বন্ধে যদুনাথের অপর একটি পুস্তক—'Shivaji a study in leadership' ১৯৫৯-এ প্রকাশিত হয়। মারাঠা ইতিহাস সম্বন্ধে যদুনাথের 'House of Shivaji'-studies and documents on Maratha history : Royal Period [1626-1700] ১৯৪০ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে মধ্যে মালিক অম্বর ও শাহজীর জীবনী, শিবাজী সম্পর্কে কতকগুলি ঐতিহাসিক পত্র এবং শিবাজী ও শম্ভুজী প্রভৃতির সম্বন্ধে নানা মূল্যবান উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা আছে। পাঁচটি অধ্যায়ে ঐতিহাসিক রাজওয়াড়ে, কাশীনাথ নারায়ণ সানে, ভি. ভি. খারে, 'ডি. বি. পারসনিস এবং কবীন্দ্র পরমানন্দের জীবনীও দেওয়া হইয়াছে। শিবাজী ও মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কে এই দুইটি পুস্তক বিশেষ মূল্যবান।

উইলিয়ম আরভিন 'Later Mughals' [১৭০৭-১৭৩৯] রচনায় ব্যাপৃত থাকিবার শেষ দিকে অসুস্থ হইয়া পড়েন ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কন্যা যদুনাথকে পিতার সমস্ত অসম্পূর্ণ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া উহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হন। যদিও তিনি ঐ সময়ে নিজের গবেষণাকার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন তাহা

হইলেও সকল দুরূহ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া তিনি **Later Mughals** এর সম্পাদনা অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পূর্ণ করেন্। দুই খণ্ডের এই পুস্তক ১৯২২-এ প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে **'Nadirshah in India'** সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

চারিখণ্ডে তাঁহার 'Fall of the Mughal Empire' বিখ্যাত পুস্তক। নাদির শাহের ভারতত্যাগের পর হইতে অর্থাৎ ১৭৩৯-এর প্রায় মধ্যভাগ হইতে ১৮০৩-এ মুঘল রাজত্বের শেষ ও ইংরাজদের ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই চারি খণ্ডের বিষয়বস্তু। কেন্দ্রীয় মুঘল শাসনের দুর্বলতা ও অবনতিতে ভারতে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের উদ্ভব হওয়াতে ঐ সময়ের ইতিহাস যেমন অশান্তি ও গোলযোগে পূর্ণ, তেমনি জটিল। মুঘল, মারাঠা, জাঠ, রোহিলা, শিখ, আফগান, ফরাসী ও ইংরাজ প্রভৃতির দ্বন্দ্ব লইয়া এই কালের প্রধান ঘটনাবলী এবং ঐ বিরাট জটিলতার গভীর অরণ্যে লেখককে প্রতি পদে পদে পথভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা; কিন্তু যদুনাথ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই যুগের একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রণয়নে আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই কার্যকে সার্থক করিবার জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, **"Such a long survey, always on the basis of original sources in many languages, could be completed only by the rigid exclusion of those provinces of India which had broken away from the Mughal Empire, and also by ignoring events not directly related to the fate of that empire, such as the Anglo-French rivalry for the**

dominion of India, and the dynastic struggles in the provinces that had renounced the suzerainty of Delhi...... The social and economic history of this long stretch of time has been crowded out of the present series, though I have made many short excursions into that field in many minor works and essays." (Preface, Fall of the Mughal Empire, Vol. IV) দিলীপকুমার বিশ্বাস ঠিকই লিখিয়াছেন, "পরিকল্পনার এই সামঞ্জস্যবোধ ও সংযম ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের বিশেষত্ব। অষ্টাদশ শতকীয় ভারতবর্ষের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যে রাষ্ট্রীয় সংহতির একটি মূল সূত্র আছে এবং তা অবলম্বন করে যে সমগ্র দেশের প্রামাণ্য রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব যদুনাথই প্রথম তা দেখালেন।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৫ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।)

এই চারি খণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড যথাক্রমে ১৯৩২, ১৯৩৪, ১৯৩৮ এবং ১৯৫০-এ প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে ১৭৩৯-এ নাদির শাহের ভারত ত্যাগের পর হইতে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহের শাসনের অবশিষ্ট কাল, আহমদ শাহ ও তাঁহার পতন এবং দ্বিতীয় আলমগীরের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত (১৭৫৪) আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকাল হইতে ১৭৭২ সনের ৬ই জানুয়ারী দ্বিতীয় শাহ আলমের দিল্লী অধিকার পর্যন্ত নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই খণ্ডে আফগান ও মারাঠাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে যুগান্তকারী যুদ্ধ ১৭৬১-তে পানিপথে সংঘটিত হইয়াছিল যদুনাথ তাহাতে নিপুণ ও নিখুঁত বর্ণনা এবং আলোচনা করিয়াছেন। এই যুদ্ধ বর্ণনের তুলনা এই দেশে অন্য কোনও ঐতিহাসিকের রচনায় পাওয়া কঠিন। সমর-বিদ্যায়

তাঁহার কিরূপ গভীর জ্ঞান ছিল ইহা হইতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ১৭৬৫ সনে শাহ্ আলম কর্তৃক ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদত্ত হইবার উল্লেখও এই খণ্ডে আছে। তৃতীয় খণ্ডে ১৭৭২ হইতে ১৭৮৮ পর্যন্ত দ্বিতীয় শাহ্ আলমের শাসন কালের দিল্লী ও উত্তর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে। মহাদ্জীর নেতৃত্বে দিল্লীতে মারাঠাদের আধিপত্য ও ক্ষমতাচ্যুতি এবং মহাদ্জীর আধিপত্যের পুনঃপ্রাপ্তি এই খণ্ডেই আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে রাজপুত ও হোলকারের বিরুদ্ধে মহাদ্জী সিন্ধিয়ার বিজয় কাহিনী, পেশোয়া সাম্রাজ্যের অবসান, যশবন্ত রাও হোলকারের উত্থান এবং পরিশেষে মুঘল ও মারাঠা-সাম্রাজ্যের ভগ্ন সৌধের উপরে ভারতে ইংরাজদের প্রভুত্ব স্থাপন (১৮০৩) ইত্যাদি বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে।

মুঘল সাম্রাজ্য এবং ইহার সঙ্গে হিন্দুস্থানে মারাঠা-প্রভুত্বের পতনের কারণ সম্বন্ধে যদুনাথ বলিয়াছেন, "The Mughal Empire and with it the Maratha overlordship of Hindustan, fell because of the rottenness at the core of Indian society. This rottenness showed itself in the form of military and political helplessness. The country could not defend itself ; royalty was hopelessly depraved or imbecile ; the nobles were selfish and short-sighted, corruption, inefficiency and treachery disgraced all branches of the public service. In the midst of this decay and confusion, our literature, art and even true religion had perished." (Fall of the Mughal Empire, Vol. IV, pp. 343-44.) আমাদের দেশের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি

বলিয়াছেন যে, ভারতে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শাসনের ক্ষিপ্রগতিতে পতন এবং সদ্য উত্থিত মারাঠাদের হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ব্যর্থতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং যদি আমরা অতীতের দোষ ত্রুটি দূর করিয়া বর্তমান ভারতের সমস্যাবলীর প্রকৃত সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই, তবে ঐ সমস্ত ঘটনার যথাযথ বিবরণ ও সেইগুলি ঘটিবার কারণ সম্বন্ধে বিবেচনা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা বর্তমানে আমাদের দেশবাসীর ভাগ্যনিয়ন্তা হইবেন তাঁহাদের সঠিকভাবে পরিচালিত করিবার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। চারি খণ্ডের এই বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে সমকালীন অনেক ফার্সী ও মারাঠী পুঁথি, দলিল, চিঠিপত্র, হিন্দী ঐতিহাসিক কাব্য এবং ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় রচিত বিভিন্ন দুর্লভ উপাদান তাঁহার ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তাঁহার পূর্বে কেহ এত মৌল উপাদান ঐ সময়ের ইতিহাস রচনায় ব্যবহার করেন নাই, অনেক উপাদান পূর্বে অজানা ছিল। প্রত্যেক খণ্ডে তিনি স্বতন্ত্র প্রমাণপঞ্জী দিয়াছেন।

তাঁহার 'Mughal Administration'-ও একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "This volume has grown out of two courses of six lectures each delivered by me as Reader in Indian History at the Patna univesity in January 1920 and February 1921." ১৯২০তে কেবল প্রথম বৎসরের বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৪-এ দ্বিতীয় সংস্করণে দুই বৎসরের বক্তৃতাগুলি ছাড়া দুইটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করা হয়। ১৯৫২তে চতুর্থ সংস্করণে আরও দুইটি নূতন অধ্যায়—১। Army and Navy এবং ২। City Administration যুক্ত হয়। ইহা প্রণয়নে

ভারতের বাহিরের মুসলমান রাজ্যগুলির শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তিনি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতের অভ্যন্তরে তাঁহার মৌল উপাদান ছিল মুঘল দরবারের পত্রাদি, আবুল ফজলের আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরী, দস্তর-উল-আমল্, গুজরাতের ইতিহাস মিরাৎ-ই-আহমদী, ও বিদেশীদের বিবরণ, ইত্যাদি।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯২৮-এ তিনি সেখানে যে বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন তাহা ঐ বৎসর 'India through the Ages' নামে প্রকাশিত হয়। এই বইটি ছোট হইলেও ইহাতে একটি বিরাট বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় জীবনের ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস এত প্রাঞ্জল ও নিপুণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, যাহার তুলনা অন্যত্র পাওয়া কঠিন। ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর অনুসরণে বলা যায় যে, যদুনাথ যদি কেবল এই বইটিই লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও হিসাবে তাঁহার ঐতিহাসিক নাম অমর হইয়া থাকিত। বিভিন্ন জাতি বা ধর্ম, যেমন আর্য, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইংরাজ, প্রত্যেকেই ভারতে নূতন নূতন অবদানের দ্বারা এই দেশের জীবন ও চিন্তাধারা এবং রাজনৈতিক ইতিহাস যেভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করিয়াছে তাহা তিনি এই পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বশেষে, ভারতের ইতিহাসের শিক্ষা কি, সেই বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন, "This study of our country's history leads irresistibly to the conclusion that we must embrace the spirit of progress with a full and unquestioning faith,.. ...we must not forget that modern Indian civilization is a composite daily-growing

product " স্বাধীন ভারতের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য কি করা উচিত তিনি তাহাও এই গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ১৯২৮ সালেই তিনি এই জাতির প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, "No nation can exist in the present-day world by merely cultivating its brain, without developing its economic resources and military power to the high pitch attained by its possible enemies."

তাঁহার 'Military History of India' যদিও পরিকল্পনা মত তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তবুও তিনি আমাদের যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য অনস্বীকার্য। ১৯৬০-এ অর্থাৎ তাঁহার পরলোক গমনের দুই বৎসর পরে, এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৫২ হইতে 'Hindusthan Standard'-এ প্রবন্ধাকারে ইহার কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অধ্যায়গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রণের পরিকল্পনাও তাঁহার ছিল। তিনি ইহাকেই "My last work" বলিয়াছেন। (Modern Review, 1958, p. 23.) গ্রন্থটির প্রারম্ভে 'Writer's Note' শিরোনামে উক্ত হইয়াছে, "This series is a study of the development of the Art of War in India, and not a descriptive list of every battle that has been fought in our land. Only such battles are discussed here as can teach a military student what to do and what not to do. Mere skirmishes, panic flights without striking a blow, rebellions and riots are outside the scope of this study. Sieges and naval fights will not be treated here."

অল্প বয়স হইতেই যদুনাথের সামরিক বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ছিল। তাঁহার পিতার ক্রীত গ্রন্থগুলির মধ্যে নেপোলিয়নের প্রাক্তন সমরাধ্যক্ষ ব্যারণ-ড্য-জোমিনীর সমর-সম্বন্ধীয় কলা-কৌশলের একটি ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তিনি এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার নিজের ভাষায়, "Thus the microbe of military historiography entered into my brain and I was doomed to become a military bore (Civil Division) when I grew up." (Modern Review, 1958. p. 21.) তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে প্রথম দিকে ছিল শিখ, নেপাল, ইংরাজ-মারাঠা ও বর্মা যুদ্ধ-সংক্রান্ত পুস্তকাবলী। ইহার পরে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধেও তিনি বহু পুস্তক সংগ্রহ করেন। ফরাসী বিপ্লব ও নেপালিয়নের সমকালীন পেনিনসুলার ও ওয়াটারলুর যুদ্ধসংক্রান্ত যে সব বই তাঁহার নজরে পড়িত সেইগুলিও তিনি ক্রয় করিতেন। একজন একজন ভারতীয় ঐতিহাসিক এই দেশের সামরিক ইতিহাসের যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে যে আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাহা আমরা যদুনাথের মধ্যে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করি। তিনি লিখিয়াছেন, "It was only late in my literary career that I turned from the romance of war to its technical or educative side ; I set myself to exploring the old strategy and tactics of battles fought in India, so long as there was an Indian State to oppose the foreigners. This limited my range to Alexander as the upper-time limit and Wellington as the lower, 323 B. C.—1803 A. D., because of these wars only we possess accurate descriptions,......

"But if I am to correctly assess the tactics and strategy of the mediaeval Indian wars, and deduce the lessons that they can teach to a modern soldier, I must first equip myself with a knowledge of the evolution of the art of war in Europe, its modern technicalities and practical illustrations (on which subjects the books relating exclusively to Indian history are silent.)" শেষোক্ত বিষয়গুলিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের জন্য তিনি "Oman's History of the Art of war in the Middle Ages, Denison's History of Cavalry, Lloyd's History of Infantry, Cole and Priestly's Outlines of British Military History, ও Liddell Hart, Cyril, Falls, Ceneral Fuller এবং Evelyin Wood-এর পুস্তকগুলি পাঠ করেন। জোমিনির বই এ সময়ে পুরাতনের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। (Modern Review 1958, pp. 22, 23.)

যদুনাথের Military History of India-তে ২১টি অধ্যায় ও দুইটি পরিশিষ্ট আছে। তাঁহার রচনায় শত্রু-মিত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা-পদ্ধতি, যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থানের জন্য কাহার কি রকম সুবিধা-অসুবিধা, উভয়পক্ষের আক্রমণ ও প্রতিরোধের কলা-কৌশল প্রভৃতি যথাসম্ভব প্রাঞ্জল, প্রাণবন্ত ও নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সামরিক বিদ্যার বিভিন্ন দিকে তাঁহার গভীর জ্ঞান, যুদ্ধক্ষেত্র ও চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন ও রচনা শৈলিতে অসাধারণ দক্ষতা, তাঁহাকে এই কৃতিত্বের অধিকারী করিয়াছিল। মুঘল ও মারাঠাদের রণ-কৌশল এবং উভয় পক্ষের দুর্বলতাও তাঁহার লেখনীতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আবার ভারতীয়দের তুলনায়

তাহাদিগের বিদেশী প্রতিপক্ষগণ সচরাচর যুদ্ধবিদ্যায় কত উন্নত এবং যুগোপযোগী যুদ্ধাস্ত্রচালনায় কত বেশী দক্ষ ছিল, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। স্বদেশের সামরিক শক্তি বর্ধিত হউক, ইহা তিনি মনে-প্রাণে কামনা করিতেন। সামরিক শিক্ষার জন্য তিনি তাঁহার পুত্র সত্যেন্দ্রনাথকে ইংলণ্ডের **Sandhurst Military Academy**-তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য তিনি আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। বর্তমানে যদুনাথের একমাত্র পৌত্র সন্তোষকুমার সরকার ভারতের সামরিক বিভাগে **Lieutenant-Colonel.** আমাদের দেশ স্বাধীন হইবার পর সামরিক বিভাগ যদুনাথকে একাধিকবার সামরিক-বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করে এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেই ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেন যে, একজন বেসামরিক ব্যক্তি যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে, খুঁটিনাটি বিষয়েও, এত গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

১৯৩১-এ যদুনাথ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Bihar and Orissa during the Fall of the Mughal Empire' শীর্ষক যে বক্তৃতা দেন (P.U. Readership Lectures) তাহাতে ঐ সময়ের বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় মারাঠাদের কার্যাবলী বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে। ইহা পরবর্তী বৎসর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯০৯ সালে তাঁহার **'Economics of British India'** প্রকাশিত হয়। নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গী ও অকাট্য যুক্তির জন্য এই বইটি অর্থনীতির ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের নিকট এমন সমাদৃত হয় যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার চারিটি সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রামাণিক তথ্যাদিসহ ইহাতে ভারতে ইংরাজ আমলের অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থার স্বাধীন ও তীব্র সমালোচনা পাঠকের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। স্যার

থিওডর মরিসন লণ্ডন ইকনমিক্ জার্ণালে এই পুস্তকের সমালোচনায় লেখকের সৎসাহস ও স্বাধীন মতপ্রকাশের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

যদুনাথ বৈষ্ণব বংশের সন্তান। যদিও তিনি নিজে বৈষ্ণব ছিলেন না, তবুও শ্রীচৈতন্যের উপরে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। ১৯১৩-তে তিনি 'Chaitanya : His Pilgrimages and Teachings' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ১৯২২-এ দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাতে আরও নূতন তথ্য সংযোজন করা হয় এবং ইহার নাম হয় 'Chaitanya's Life and Teachings'. ইহার তৃতীয় সংস্করণে (১৯৩২) 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থ হইতে চৈতন্যদেবের গার্হস্থ্যাশ্রমের বিবরণ সংযোজিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে C. F. Andrews লিখিয়াছেন, "a work of surpassing value, full of human interest from beginning to end."

ধর্মসংক্রান্ত যদুনাথের অপর পুস্তক—'History of Dasnami Sect,' Vols. I, II; ইহা জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের সংগঠিত দশনামী নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সম্বন্ধে রচিত। ইহার একটি হিন্দী সংস্করণও প্রকাশ করা হয়।

'The Cambridge History of India'-র চতুর্থ খণ্ডে তিনি চারিটি মূল্যবান অধ্যায় লিখিয়াছেন (১৯৩৭)।

বাঙলার ইতিহাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। যদুনাথ দ্বিতীয় খণ্ডের (Muslim Period, 1200-1757) সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৮-এ এই খণ্ড প্রকাশিত হয়। পাঁচ শত পৃষ্ঠার অধিক আয়তনের এই প্রামাণ্য পুস্তকের দুই শত পৃষ্ঠার বেশী তিনি নিজেই লিখিয়াছেন। ১৯১৯-এ প্যারিস Bibliotheque Nationale হইতে তাঁহার আবিষ্কৃত মির্জা নাথনের সমসাময়িক মূল্যবান ইতিহাস 'বহারিস্তান-ই-খায়েবী' এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মির্জা নাথন মুঘলদের পক্ষে

বাঙলার ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও। তাঁহার রচিত গ্রন্থ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের (১৬০৮-১৬২৭) বাঙলার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস।

যদুনাথ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরিকল্পিত জাতীয় ইতিহাস—'**A New History of the Indian People**'-এর প্রধান সম্পাদকও ছিলেন।

কর্ণেল জেরেটের অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ভুল-ত্রুটি সংশোধন ও সম্পাদনের ভার কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি যদুনাথের উপরে অর্পণ করে এবং তিনি সেই কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

অনেকগুলি মূল্যবান ফার্সী পুঁথিও তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এইগুলি গবেষকদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্যে একটি সাকী মুস্তাদ খাঁ রচিত 'মাসির-ই আলমগিরি'। ইহাতে ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ (১৬৫৮) হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭) ইতিহাস সরকারি দলিলপত্রের সাহায্যে ১৭০৭ হইতে ১৭১০ মধ্যে রচিত হইয়াছে। যদুনাথের ইংরাজী অনুবাদ ১৯৪৭-এ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করে।

তাঁহার আরও তিনটি ফার্সী পুঁথির ইংরাজী অনুবাদ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্‌-এর জন্ম দ্বি-শত-বার্ষিকী (১৯৪৫) সংখ্যারূপে '**Bengal Nawabs**' নাম দিয়া ১৯৫২-তে প্রকাশ করে। এই তিনটি হইল—১, আজাদ-আল্‌-হোসেনির 'নৌ-বহার-ই মুরশিদ কুলি খান্‌-ই', দ্বিতীয়টি, করম আলির 'মুজফ্‌ফরনামা' এবং তৃতীয়টি, ইয়ুসুফ আলির 'আহোয়াল-ঈ-মহাবৎজঙ্গ'। এইগুলি অষ্টাদশ শতকের বাঙলার নবাবী আমলের (সমসাময়িককালে লিখিত) ইতিহাস।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দাক্ষিণাত্য-সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ইতিহাস-প্রণেতা দিলেন ভীমসেন নামে একজন মুঘল সরকারের কর্মচারি। তিনি অনেক সমসাময়িক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ফার্সীতে রচিত তাঁহার বিবরণ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ ১৭৪৩ সম্বত (১৬৮৭-৮৮) পর্যন্ত এবং ইহার নাম 'তারিখ-ই-দিলকশা', দ্বিতীয় ভাগের নাম 'নুশ্‌খা-ই-দিল্‌কশা', ইহাতে ১৭৪৩ (১৬৮৭-৮৮) হইতে ১৭৬২ সম্বত (১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ) ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাস আছে। শেষোক্ত ভাগ যদুনাথ ফার্সী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং মহারাষ্ট্র সরকার এই অনুবাদ স্যার যদুনাথ সরকার জন্ম-শত-বার্ষিকী-স্মৃতিসংখ্যারূপে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছে। যদুনাথ ঈশ্বরদাস নাগরের ফতুহাৎ-ই-আলমগিরি-ও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহা এখনও মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে। ইহা ছাড়া তিনি ফকির খয়ের-উদ্-দীনের 'ইব্রৎনামা' ও মুন্নালালের 'তারিখ-ই-শাহ্ আলমের' ইংরাজী অনুবাদও করেন।

ঐতিহাসিক পুঁথি ও দলিল-পত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ভারতসরকার ১৯১৯-এ যে **Indian Historical Records Conmission** গঠন করে যদুনাথ ইহার সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অনেক বৎসর ইহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

তাঁহার উদ্যমে সরকারি দলিল-পত্র সংরক্ষণ ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের অধিকারে রক্ষিত ঐতিহাসিক পুঁথি-পত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কর্মসূচিও কমিশন গ্রহণ করে এবং অনেক আকর পুঁথি ও দলিল-পত্র কমিশনের মহাফেজ খানায় সংগৃহীত হয়। তাঁহার প্রস্তাবেই কমিশন পুণের পেশোয়া দফ্‌তর গবেষকদের নিকট উন্মুক্ত করিতে ও সেখান হইতে বিশেষ রকমের দলিল প্রকাশ করিতে সুপারিশ করে। তিনি ভারতের রাজন্যবর্গের ঐতিহাসিক দলিলাদির সাহায্যে গবেষণার জন্য ঐগুলি সংরক্ষণের উপরেও

জোর দেন এবং তাঁহার প্রস্তাবে (১৯৩৭, ১৯৩৯) এবং কমিশনের সুপারিশে ভারত সরকার ১৯৪০-এ নির্ধারিত নিয়ম শিথিল করিয়া গোপনীয় ব্যতীত অন্যান্য দলিল সমূহ (১৮৮০ পর্যন্ত) ব্যবহারের অনুমতি গবেষকগণকে প্রদান করে। তাঁহারই প্রয়াসে কোটার গুলগুলে দফ্তর, পারসনিসের হেফাজতে রক্ষিত মহাদজী সিন্ধিয়া সম্পর্কিত দলিল-পত্র, পুণের পেশোয়া-দফ্তর এবং জয়পুরের মহাফেজখানায় রক্ষিত পুঁথি ও দলিলাদি আবিষ্কৃত হয়। মুঘল ও মারাঠা ইতিহাসের আকর সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ জ্ঞান এইভাবে কমিশনকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল। ১৯২১-এ তাঁহার সুপারিশে পুণের ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডলের উপরে গোয়াতে রক্ষিত পর্তুগীজ, মারাঠী ও ফার্সিতে লিখিত দলিলাদি পরীক্ষা, সুবিন্যস্ত করা ও মূল্যায়নের ভার অর্পণের জন্য কমিশন সরকারকে অনুরোধ করে। এই কমিশনের সম্মুখে যদুনাথ তেরটি গবেষণামূলক প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলেন। রচনাপঞ্জীতে এইগুলির পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই কমিশনে যদুনাথের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিতে হইত—গবেষকগণ যে সব গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইহার বিভিন্ন অধিবেশনে পাঠ করিবার জন্য প্রদান করিতেন সেইগুলি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া যথোচিত মূল্যায়ন করিতেন এবং যেখানে প্রয়োজন হইত সেখানে আরও নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়া প্রবন্ধের উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য গবেষকদের সাহায্য ও উৎসাহিত করিতেন। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি এই কমিশনের সহিত যুক্ত থাকিয়া এইভাবে ইহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার ও ইহার বাস্তব উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রয়াস করেন। (Commemoration Vol. I. pp. 94-100.)

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে, তাঁহার উদ্যোগেই মহারাষ্ট্র সরকার Peshwa Daftar Series এবং Poona Residency Correspon-

dence Series প্রকাশ করিয়াছে। যদুনাথ-জন্ম-শত-বার্ষিকী-স্মারক-গ্রন্থে মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এম. ডি. চৌধুরী যদুনাথের মহারাষ্ট্র ইতিহাসে অসামান্য দানের কথা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "**Along with Dr. G. S. Sardesai, Sir Jadunath Sarkar moved in Maharashtra for fifty years in search of historical material. With the initiative of Sir Jadunath, Dr. G. S. Sardesai was able to bring out 45 volumes of Peshwa Daftar Series which deal with the various aspects of the history of the Marathas. Along with Dr. G. S. Sardesai, he was also the General Editor of the 14 volumes of the Poona Residency Correspondence Series" (Foreword, p. V.)**।" Poona Residency Correspondence Series এর প্রথম, অষ্টম ও চতুর্দশ খণ্ড যদুনাথ স্বয়ং সম্পাদনা করিয়াছেন। জয়পুর দরবারের মহাফেজখানায় কয়েক শতাব্দীর রক্ষিত ও এ-পর্যন্ত অব্যবহৃত রাজপুত ও মুঘল ইতিহাস সংক্রান্ত পুঁথি ও দলিলপত্রের সাহায্যে যদুনাথ যে '**History of Jaipur State**' লিখিয়াছিলেন তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আশা করা যায় ইহা কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

প্রায় ষাট বৎসরকাল তিনি একাগ্র চিত্তে মৌলিক গবেষণায় অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সাধনা অভূতপূর্ব। দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, দলিল-পত্র, মুদ্রিত গ্রন্থ, কখন কখন মানচিত্রকে সঙ্গী করিয়া তিনি নিজ নির্জন গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে সাধনায় রত থাকিতেন। তখন তিনি সংসারের সকল সুখ দুঃখের অতীত হইতেন। এই সম্বন্ধে তিনি একবার বন্ধু সরদেশাইকে লিখিয়া-

ছিলেন: "The intoxication of work,—especially a work on which one has set his heart,—makes us forgetful of everything else,—external disturbances, physical fatigue, even the sadness of bereavement." (Commemoration Vol. I. p. 169.) ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, "অধ্যাপক যদুনাথ সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। আপন রোজগারের প্রধান অংশ পুরাতন ফার্সী পুঁথি ক্রয় করতে ব্যয় করেছেন, পাটনা খোদাবক্‌স্ লাইব্রেরীতে বৎসরের পর বৎসর ধরে নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করেছেন। তাই মুঘলযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি আজ **Authority** বা প্রামাণ্য পণ্ডিত।......বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই এঁর পাণ্ডিত্যের কারণ নয়—এই কৃতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর জীবনের সাধনা।" (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ররায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, ২০২ পৃষ্ঠা)। সরদেশাই এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "**Jadunath as a historian is not an accident, not a fortunate child of opportunities, but** the consummation of a life of preparation, planning, hard industry and ascetic devotion to a great mission". (Commemoration Vol. I. p. 32.) ভারতের ইতিহাসে তিনি যে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছেন তাহার কাছাকাছিও কেহ এই পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখিয়াছেন, "ঐতিহাসিক যদুনাথ, পণ্ডিত যদুনাথ, মনীষী যদুনাথ কিছুটা দূরের মানুষ, যিনি বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধার পাত্র, ঐতিহাসিক গবেষণায় জ্যেষ্ঠাগ্রজ হিসাবে যিনি নমস্য, যাঁর রচিত গ্রন্থাদি আরও বহু বৎসর অধীত হবে, সযত্নে ও সাগ্রহে।" (মণি বাগচির 'আচার্য যদুনাথের ভূমিকা' ১২ পৃষ্ঠা)। ঐতিহাসিক বেভারিজ

যে যদুনাথকে "Bengali Gibbon" আখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যদুনাথের বিদ্যাবত্তা, আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতা ও রচনাশৈলির গুণে মুগ্ধ হইয়া বেভারিজ তাঁহাকে এই অ্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। 'The Decline and Fall of the Roman Empire' রচনা করিয়া এডওয়ার্ড গিবন যশস্বী হইয়াছেন এবং যদুনাথ ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। উভয়ে যার যাঁর নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। উভয়ের বিষয়বস্তুই বিরাট ও ব্যাপক কিন্তু তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম। আবার উভয়ের বিষয় বস্তুর বিরাটত্বের মধ্যে গিবনের রচনায় প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরিক্রমা করা হইয়াছে; এই সম্বন্ধে গিবন লিখিয়াছেন, "The whole period extends from the age of Trajan and the Antonines to the taking of Constantinople by Mahomat the Second; and includes a review of the Crusades and the state of Rome during the middle ages." যদুনাথ মুঘল ইতিহাসের দেড় শত বৎসরের কিছু বেশী পরিক্রমা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। গিবন পূর্বে উদ্ধার করা বহু আকর উপাদানের সুযোগ সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যদুনাথ এইরূপ সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার একাই মৌলিক উপাদান সমূহের সন্ধান, সংগ্রহ ও সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত কায সম্পূর্ণ করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রকৃত ইতিহাস লিখিতেই তাঁহার শ্রম, শক্তি ও সময় ব্যয়িত হইয়াছে। ফলে, তাঁহার রচনায় গিবনের বা টয়েনবীর মত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় না। এই অভাবের বিষয় উপলব্ধি করিয়া যদুনাথ নিজেই লিখিয়াছেন, "We

have yet to collect and edit our materials and to construct the necessary foundation,—the bedrock of ascertained and unassailable facts, on which alone the superstructure of a philosophy of history can be raised by our happier successors. Premature philosophising based on unsifted facts and untrust-worthy chronicles, will only yield a crop of wild theories and fanciful reconstruction of the past " (Studies in Mughal India, p. 266.)। তবু ও তাঁহার History of Aurangzib, Fall of the Mughal Empire এবং বিশেষভাবে India through the Ages-এ তিনি মাঝে মাঝে ঘটনাপরম্পরার পর্যালোচনায় যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা দার্শনিকতা বর্জিত নহে। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল আলী যবর জঙ্গ ১৯৭৫ এর ২রা জানুয়ারি বলিয়াছিলেন, "Dr. Jadunath Sarkar was not a historian in the narrow sense of the word but a humanist and, therfore an exponent, at the same time of the philosophy of History—this at a time when the reading, learning and teaching of history was in the narrower sense and concerned little with the history of the people." (Making of a Princely Historian, Foreword.) জাতীয় ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে যদুনাথের অভিমত সুস্পষ্ট। ১৯৩৭-এর ১৯শে নভেম্বর তিনি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লিখিয়াছিলেন, "National history, like every other history worthy of name and deserving to endure, must be true as regards the facts and

reasonable in the interpretation of them .. The first duty of our national historian will be to depict all aspects of our national life in the past... He will not suppress any defect of the national character, but add to his portraiture those higher qualities which, taken together with the former, help to constitute the entire individual."

যদুনাথের তত্ত্বাবধানে গবেষণা ও তাঁহার শিষ্যগণ

যদুনাথ স্বীয় সাধনায় মগ্ন থাকিলেও প্রকৃত গবেষকদের প্রতি তিনি কখনও বিমুখ ছিলেন না। তাহারা তাহার নিকট হইতে পুত্রবৎ স্নেহ, সহানুভূতি ও ভালবাসা পাইতেন। কেহ কেহ তাঁহার বাড়িতে অবস্থান করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও তাহার গ্রন্থাগারের সাহায্যে গবেষণা করিবার সুযোগও লাভ করিয়াছেন। ইহাদের কাহারও নিকট হইতে তিনি কখনও এক কপর্দকও গ্রহণ করিতেন না। যদি কেহ কখনও তাঁহাকে ভক্তি সহকারে অতি সামান্য উপহারও দিতে যাইতেন তাহা হইলে তিনি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইতেন এবং সেই ব্যক্তিকে তাহার রুদ্রমূর্তির সম্মুখীন হইতে হইত। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগ সম্পর্কে গবেষণা করতে হইলে গবেষককে অবশ্যই ফার্সী ভাষা জানিতে হইত এবং আচার্য যদুনাথ তাঁহার কাজের অগ্রগতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, ছাত্রটি কাজে খাটি ও বিশ্বাসযোগ্য তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে সম্ভবমত সকল সাহায্য দিতেন। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে গুণানুসারে সকলেই তাঁহার অধীনে গবেষণা কার্যে সাদরে

গৃহীত হইতেন। উত্তর ভারতের ও দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান হইতে এইরূপ ছাত্র তাঁহার নিকট আসিতেন এবং তাঁহারা তাঁহার সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে কৃতিত্ব অর্জন করিয়া বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে উত্তরকালে যশস্বী ঐতিহাসিকরূপেও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কয়েকজনকৃতী গবেষক-ছাত্রের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁহার কাছে থাকিয়া গবেষণা করেন এবং 'Sher Shah', 'Dara Shukoh' এবং 'History of the Jats, ইত্যাদি রচনা করিয়া ঐতিহাসিকরূপে সুখ্যাত হন। ১৩৭৩-এ 'রাজস্থান-কাহিনী' নামক পুস্তকে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারও লাভ করেন। ঢাকা ও লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হরিরাম গুপ্ত, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক ও পরে এমেরিটাস অধ্যাপক ডঃ আশীর্বাদীলাল শ্রীবাস্তব উভয়েই যদুনাথের গৃহে বাস করিয়া গবেষণা করিয়াছেন এবং এমন কি, পরে তাঁহাদের গবেষণামূলক নিবন্ধ মুদ্রণের সময়ে তিনি নিজে 'প্রুফ' সংশোধন পর্যন্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি সরদেশাইকে লিখিয়াছিলেন, "I am supervising the printing of the doctorate theses of HariRam Gupta and Ashirbadilal Srivstava...have cost me an enormous amount of time." (Commemoration Vol. I. p. 9)। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য সীতামাও-এর মহারাজকুমার রঘুবীর সিং যদুনাথের অধীনে গবেষণা করিয়া আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. ডিগ্রী পাইয়াছেন। যদুনাথ তাঁহাকে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন ইহাদের মধ্যে তিন শত উনত্রিশটি একত্র করিয়া এস. আর. টিকেকারের সম্পাদনায় Maharashtra State Board for Archives and Archaeology মুদ্রিত করিয়াছে। এই পুস্তকের নাম—'Making of

a princely Historian' । এই চিঠিগুলির মধ্যে যদুনাথের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। থিসিসের উচ্চমানের উপরে তাঁহার কিরূপ দৃষ্টি ছিল এবং ইতিহাস রচনা সম্পর্কে তিনি কি ধারণা পোষণ করিতেন তাহা এই পত্রাবলী হইতে জানা যায়। তাঁহার অনুপ্রেরণায় রঘুবীর সিং সীতামাওতে একটি উচ্চমানের গ্রন্থাগার ও গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে যদুনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "A very rich library of sources has been created at Sitamau (Malwa) by its englightened prince, Maharajkumar Dr. Raghuvir Sing, D. Litt., LL. B, where mediaeval and modern Indian History is fully represented in the form of mss , books and micro-films of the treasures of the British Museum and the I. O. Library (London), besides costly reference works. Scholars can freely use them" (Commemoration Vol. I. p. v) ।

পাতিয়ালা মহেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক স্বরযনারায়ণ বাও গবেষণাকালে দক্ষিণ কলিকাতায় যদুনাথের বাড়িতে ছিলেন। যদুনাথের স্বভাব-সিদ্ধ সহৃদয় ব্যবহার ও গবেষণায় তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পাইয়া এই গবেষক অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তিনি লিখিয়াছেন, "He (Jadunath) takes genuine pleasure in leading young seekers after knowledge to their goal. It is for this reason that we find to-day the lamps, lighted by his own, burning in every nook and corner of our country. Thus in him I discovered a real scholar of modern times". (Commemoration Vol. I. pp. 82-85) ।

'বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব,' প্রণেতা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও

সাহিত্যিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় গবেষণাকালে যদুনাথের নিকট হইতে যে উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম, আচার্য যদুনাথ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচায। আমার অন্যতম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কালিদাস নাগ মহাশয় তখন একদিন কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, উপাচার্য মহাশয় আমায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। কালিদাস বাবুই আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পরিচয়ও করিয়ে দিলেন। কিন্তু যদুনাথ ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর, স্বল্পবাক, রাসভারী প্রকৃতির লোক, এমন মানুষ যাঁর ধারে-কাছে যেতে সাহস হয় না। দু-তিনটির বেশী কথা তিনি আমায় বললেন না! বিদায় নেবার সময় হয়েছে ভেবে আমি উঠে আসছি এমন সময়ে খুব গুরুগম্ভীর নৈর্ব্যক্তিক গলায় তিনি বললেন, বাংলা সরকারের গবেষণা-বৃত্তি বিজ্ঞাপিত হলে আমি যেন দরখাস্ত করি এবং তাঁকে জানাই। দু'মাস পর সে বৃত্তি আমি পেয়েছিলাম, পর পর তিন বছর, সন্দেহ নেই, তাঁরই আনুকূল্যে।......তিনিই আমাকে বাঙ্গালীর ইতিহাসের কাঠামোয় রক্তমাংস যোজনার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন; সেই পরিণত বয়সেও কতদিন তিনি হেঁটে হেঁটে আমার বাড়িতে এসেছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে চলে গেছেন, কাজটা কতদূর এগুলো। পরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে একদিন আমার বইটির একটি দীর্ঘ পরিচয়-পত্রও লিখে দিয়েছিলেন। সেদিন আমি বাড়ির বাইরে কোথাও ছিলাম; পরিচয়-পত্রটি পুরু খামে পুরে নিজে আমার বাড়ি বয়ে এসে ভৃত্যের হাতে রেখে চলে গিয়েছিলেন। খামের উপর নির্দেশ লেখা ছিল, প্রুফটি যেন তাঁকে দিয়ে দেখিয়ে নিই।" (মণি বাগচি, 'আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা', ভূমিকা)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক গবেষণা-কার্যের মূলে ছিল

"আচার্য যদুনাথের নিকট প্রাপ্ত ইতিহাস গবেষণায় শিক্ষা ও নির্দেশ।" ঐতিহাসিক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ জগদীশ-নারায়ণ সরকার ও লেখক নিজেও তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও তাঁহার গ্রন্থাগারের সাহায্যে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি যে কি আন্তরিকতার সহিত গবেষকদের সাহায্য করিতেন তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন।

আচার্যের এই সাহায্য ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। সর্বভারতীয় একটি ঐতিহাসিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৩৯-এ পুণের নিকট সরদেশাই-এর কামশেটের বাড়িতে ছাত্রদের গবেষণা-কার্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইরূপ একটি গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং তাঁহার উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় সেখানে ভাল কাজও হইয়াছিল।

তাহার অমূল্য উপদেশের মধ্যে ছিল যে, কোন বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন না করিয়া ইহার কোন একটি ক্ষুদ্র অংশে বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টা করা অনুচিত, কারণ ইহা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 'আমার জীবন দর্শন' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "জগতে কোন খাঁটি জিনিষ, কোন সাধু প্রচেষ্টা, কোন সত্য জ্ঞান, নষ্ট হয় না। তোমার কাজের ফল পাবার আকাঙ্ক্ষা না করে, নিঃস্বার্থভাবে ভাল কাজ করে যাও, ভগবান সেটাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।......শস্যের সুস্থ বীজ পাথরের গর্তে পড়লেও, অনেক বছর পরে, সুবিধায় জলবায়ু পেয়ে, অঙ্কুর গজায়, গাছ হয়, সহস্রগুণ ফল প্রসব করে। সত্য কাজের, সত্যকথার, খাঁটি জিনিষের মধ্যে এই অজেয় প্রাণশক্তি আছে, এই চিরন্তনী সজীবতা আছে।......"

"এ পথেও যে পথিক হবে তার শুধু মনের বল নয়, অসীম ধৈর্যও চাই। তাকে অল্পে সন্তুষ্ট হলে চলবে না, সহজে কাজ সারব এই ফন্দি করলে তার চেষ্টা শেষে পণ্ড হবে।......সাহিত্য বা কলার সাধনা ঠিক যোগ-

সাধনার মত। এতে কঠিন জিনিষ দেখে ভয় পেলে চলবে না।......খাঁটি কাজের, জ্ঞান সাধনার, দেশ সেবার কঠোর ব্রত কখন কখন সাধককে জীবিতকালেই পুরস্কার দেয়; আমি নিজে তাহা পেয়েছি।"

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে (২০-এ এপ্রিল, ১৯৫৭) ভারতীয় ঐতিহাসিকদের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত বাণী হইতে বুঝা যায় তাঁহাদের সম্পর্কে তিনি কিরূপ আশা ও মমতা পোষণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "Time has now brought me to the brink of the great Ocean of Eternity, and as I look back I take the opportunity of this book (Commemoration Volume) to bid farewell to my friends and pupils, with gratitude for the love and kindness with which they have enriched an unusually long life.

"My message to my pupils and my pupils' pupils is one of hope. I bid them be of good cheer, because the opportunities for carrying on scientific research in Indian history on the Indian soil are now unimaginably great, and the right atmosphere for this type of work has also been created around us.

... ...

"Work in the right way, for the means are ready to hand, and the reward sure."

যদুনাথ শিষ্যদের কেবল গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখিতেই উপদেশ দিতেন

ও উৎসাহিত করিতেন—যাহাতে স্বদেশবাসী ও বিদেশীও আমাদেব মাতৃভূমির ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভে উপকৃত হইতে পারে। পাঠকের সুবিধার জন্য তিনি নিজের পুস্তকেব স্বল্প মূল্য ধার্য করিয়াছিলেন এবং অপরেও এই আদর্শ অনুসরণ করুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

শিষ্যদের কার্যে ও আচরণে তিনি গৌববান্বিত বোধ করিতেন। এই সম্বন্ধে তিনি একবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বলেন, "আমার ঐতিহাসিক শিষ্যগণ, এখানে এবং অন্যত্র, কখনও আর্থিক পুরস্কার খোঁজেনি,...... গবর্ণমেণ্ট অথবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদেব এক পয়সার সাহায্যও করেনি। আমি এটাকেই আমাব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব মনে করি।

"এই সব নবীন কর্মীর সত্যস্পৃহা এত বেশী যে, তাদের প্রকাশিত লেখায় কোন ভুল বা ত্রুটি দেখিয়ে দিলে, তাবা তা বিচার করে তাব সত্য অংশটুকু পরবর্তী সংস্করণে যোগ করে দেয়। এরূপ নিজ ভ্রম স্বীকার করাকে তারা অপমানেব কারণ বলে মনে করে না। এই ক্রমোন্নতির জন্য আগ্রহ, এই মুক্ত হৃদয়ে সত্য বরণ করার স্পৃহাই প্রকৃত পণ্ডিতের চিহ্ন। আমার শিষ্যগণ তা ভোলেনি।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫৫, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ৯৩ পৃষ্ঠা)

একের পর এক স্বজনবিয়োগে গভীব শোকাহত অবস্থায় যখন তিনি প্রায় নির্জনতার মধ্যে সময় অতিবাহিত কবিতেছিলেন তখনও পৌত্র ও দৌহিত্রদের নিকট শিষ্যদের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত!

যদুনাথ ও সরদেশাই

সরদেশাই-এর কথা আগে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। যদুনাথ ও সরদেশাই উভয়ে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন, তবে যদুনাথের স্থান

অপেক্ষাকৃত উচ্চ। তাঁহার গবেষণা মুঘল ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া মারাঠা ইতিহাসের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কারণ একটির সহিত অপরটি জড়িত। সরদেশাই মারাঠা ইতিহাসে একজন বিশেষজ্ঞ। এই ইতিহাস ছিল তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনা। ইহার আলোচনাতেও মুঘল ইতিহাস আসিতে বাধ্য। মুঘল ঐতিহাসিক যদুনাথ যেমন একজন মারাঠা ঐতিহাসিকের সান্নিধ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন তেমন সারদেশাই-ও একজন ফার্সী জানা মুঘল ঐতিহাসিকের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় ঘটিল।

যদুনাথের সহিত প্রথম পরিচয়ের সম্বন্ধে সরদেশাই লিখিয়াছেন যে, ১৯০৪-এর কোন এক সময় বরোদাতে অপরিচিত হস্তাক্ষরে একটি পত্র পাইয়া তিনি অবাক হইয়াছিলেন। চিঠিটির লেখা ছিল স্পষ্ট ও বাহুল্যবর্জিত, কাজের কথা ভিন্ন উহাতে অন্য কোন কথাই ছিল না। পত্রলেখকের নাম তখন তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল এবং তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, পত্রলেখকের কাছে তিনিও হয়ত তেমন পরিচিত নন, কারণ তাঁহার সাহিত্যজীবনের তখন কেবল সূত্রপাত হইয়াছিল এবং তিনি একটি দেশীয় রাজ্যের মহাকরণের নির্জন কোনে আবদ্ধ। যাহা হউক, ঐ চিঠিখানি পাইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, উহা যেন ভগবানের দান-স্বরূপ আসিয়াছে। পত্রলেখক ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তাঁহার বিপুল ফার্সী-উপাদানের সম্পূরক হিসাবে মারাঠী ভাষায় লিখিত উপাদানের জন্য তাঁহার (সরদেশাই-এর) সাহায্য প্রার্থী। একটি সম্মান-জনক লাভের আশায় সরদেশাই খুব উল্লসিত হইলেন। ১৯০২-এ তাঁহার 'মারাঠী রিয়াসৎ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়; তৎপর তিনি 'রিয়াসৎ'-এর পরবর্তী কার্যের জন্য ফার্সী ভাষা না জানিয়াও ফার্সী উপাদান ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সেই পত্রটি

মুঘল ও মারাঠা ঐতিহাসিকদ্বয়ের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার পথে প্রতিশ্রুতি-স্বরূপ হইয়াছিল। সরদেশাই লিখিয়াছেন, "This acquaintance through correspondence soon ripened into a close intellectual friendship, and resulted in co-operative exchange of historical materials supplying our mutual needs during the life-long progress of our researches." (Commemoration Vol. I., p. 18.)

গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই যদুনাথের অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে যদুনাথের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে, "ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে প্রবল আগ্রহে আশ্চর্যজনক অল্প সময়ের মধ্যে যদুনাথ মারাঠী ভাষায় অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, জ্ঞানের অজ্ঞাত-রাজ্যে যদুনাথের চিরকাল আকর্ষণ ছিল এবং তাঁহার "আলমগীর-শাহী" শক্তি এবং দৃঢ় সংকল্পের নিকট কোন বাধাই অলঙ্ঘনীয় ছিল না।"

১৯০৯-এর অক্টোবর মাসে মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহার দেওয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত বরোদায় একটি মারাঠী-গ্রন্থাগার-সম্মেলন সংগঠিত করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ আর্. জি. ভাণ্ডারকার, যদুনাথ এবং আরও তিনজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সরদেশাই এই সম্মেলনের কার্যকরী সম্পাদক ছিলেন। সেই সময়ে যদুনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার প্রথম সুযোগ ঘটিল।

ইহার পর তাঁহারা প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার মিলিত হইতেন; ইহা ভিন্ন উভয়ের মধ্যে পত্র-বিনিময়-ত ছিলই। তাঁহাদের পত্রাবলীর মধ্যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও সাধারণতঃ উভয়ের গবেষণা-সংক্রান্ত বিষয়ই প্রাধান্য পাইত। তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ডের বিবরণও এই পত্রাবলীর মধ্যে সুন্দরভাবে পাওয়া যায়।

ইতিহাস চর্চায় যদুনাথ সরদেশাইকে কি রকম সাহায্য করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে সরদেশাই বলেন, "Though I cannot say that I could render much help to Jadunath, I am for ever grateful to him for disinterested and unique help I received from him in my own historical studies... ...I sincerely feel that it is to him that I owe all the work which I have been able to put forth. Jadunath's interest in Maratha history and his mastery over the old Marathi have been most fortunate for Maharashtra." (Ibid., p. 22).

তাঁহারা মিলিতভাবে ভারতের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন, যেমন, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, কোটা, গোয়ালিয়র, ভিল্‌সা, মথুরা, আগ্রা, দিল্লী, অজন্তা, এলোরা, ঔরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ, বিজয়নগর, ইত্যাদি। শুধু মহারাষ্ট্রের মধ্যেই তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বহুদিন যাবৎ ঘুরিয়া মারাঠা ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদান, যে-সমস্ত বহুকাল অজ্ঞাত স্থানে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল—উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। Peshwa Daftar Seris এবং Poona Residency Correspondence

এর বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুই বিরাট কাজে যদুনাথ সরদেশাইকে যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না, সরদেশাই নিজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্তরিকতার সহিত ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

যদুনাথের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় মারাঠা ইতিহাসের আরও অনেক উপাদান উদ্ধার ও উহাদের সঙ্কলন সুসম্পন্ন হইয়াছে, যেমন, মহাদজী সিন্ধিয়ার শিবির হইতে লিখিত প্রায় ৮০০ সংবাদ সংক্রান্ত পত্র (**news letters**), গোয়ালিয়র দরবার হইতে এক খণ্ড এবং গোয়ালিয়র হিস্টরিক্যাল সোসাইটি হইতে আরও দুই খণ্ড মূল পত্রসমূহ প্রকাশিত হয়। ৫

যদুনাথ সরদেশাইকে গবেষণায় নানা বিষয়ে, যেমন, কোন সন-তারিখ, কোন স্থানের অবস্থিতি, কোথায় কি ভাবে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাইতে পারে এবং রচনাপদ্ধতি কিরূপ হওয়া কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃত খবরাখবর ও উপদেশ দিতেন। সরদেশাইকে লিখিত তাঁহার বিভিন্ন চিঠি হইতে তাঁহার সত্য নির্ধারণের পদ্ধতি ও রচনা শৈলীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। সরদেশাই তাঁহার রচনা শৈলী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "His pen moves like the delicate brush of the court-artists of the Mughal Empire. He concentrates his best effort on his English style. Jadunath remarks very often that what taxes his brain most are style and presentation, in which he has attained perfection almost by assiduous efforts added to his natural gifts for observation and narration. (Ibid. p. 31). ইংরাজী এবং বাংলা উভয়

ভাষাতেই যদুনাথের নিজস্ব স্টাইল ছিল এবং তাহা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিশক্তিও যে কিরূপ প্রখর ছিল তাহাও সরদেশাই উদাহরণ সহকারে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদুনাথ একই সময়ে পর পর অনায়াসে তুকারাম ও কবীর, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপিয়র, হালী ও হাফেজ হইতে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

যদুনাথের সুপারিশে সরদেশাই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৬-এ মারাঠা ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি পরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'The Main Currents of Maratha History' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'New History of the Marathas' (৩য় খণ্ড) ও পূর্বের গ্রন্থটি তাহাকে ঐতিহাসিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

যদুনাথ সব সময়ে সরদেশাইয়ের সহযোগিতা পাইয়াছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের এই দুই ইতিহাস-সাধক ও জ্ঞান-তপস্বীর যে মিলন-সৌধ রচিত হইযাছিল তাহা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের সেবায় ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৫৯-এর ২৯শে নভেম্বর সরদেশাই পরলোক গমন করেন।

যদুনাথ ও বাঙলা ভাষা এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বাল্যকাল হইতেই যদুনাথ মাতৃভাষার অনুরাগী ছিলেন। উত্তর জীবনে সেই অনুরাগ আরও বর্ধিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার পিতার একমাত্র (কনিষ্ঠ) ভ্রাতা হরকুমার সরকার অল্পবয়সে......বাংলা সাহিত্যে অগাধ উৎসাহী হলেন। তাঁর কাছে সব ভালো বাংলা বই ও

মাসিক······প্রকাশ হওয়া মাত্র আসত। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ একভাবে তার কাছে আসে। এর কাছে আমি বাংলা কাব্য ও উপন্যাসের আস্বাদ পাই।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ নভেম্বর, ১৯৫২)।

যদুনাথের প্রকাশিত প্রথম বাঙলা রচনা 'হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা'। কালকাতার হডেন হিন্দু হস্টেলের সুহৃদ-সমিতির প্রকাশিত 'সুহৃদ' পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ইহা মুদ্রিত হয়। (Sir Jadunath Sarkar—A Centenary Tribute.)

সাহিত্য-প্রীতি তাহার অন্তরের মর্মস্থলে যে কি গভীর স্থান লাভ করিয়াছিল তাহা তাহার উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নানা রকম বাধার মধ্যে তিনি সাহিত্যের মধ্যে শান্তি অন্বেষণ করিয়াছেন এবং পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ হয়েছে এই গ্রন্থের (পূর্ববর্তী মনীষিগণের রচিত সাহিত্যের) সাহচর্য। সংস্কৃত কাব্য ও উপনিষৎ, ইউরোপীয় কাব্য, ইতিহাস ও জীবনী, বাঙলার-ত কথাই নাই, এগুলি আমাকে এক নূতন রাজ্য দিয়েছে যেখানে কোনো শত্রু প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে গিয়ে আমি নূতন প্রাণ পাই। এটিও আমার পিতার নিকট হতে শিখেছি।" ('আমার জীবন দর্শন')। বাঙলা ব্যতিরেকে সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার বেশ আকর্ষণ ছিল, তাহা উপরি উক্ত কথা হইতে বুঝা যায়। ভারতে সংস্কৃত চর্চার হ্রাস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "If Sanskrit ceases to be a living study in India, then India will have lost her soul." (Commemoration Vol. II p. ii). বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাহার যে কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ ও মমতা ছিল তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ের কায হইতে জানা যায়। কটকের রেভেনশ কলেজে তিনি স্বেচ্ছায়

বাঙলা পড়াইতেন, ইহা আগে বলা হইয়াছে। তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ছিল যে কেবল নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুরাজির বিকাশ হওয়া সম্ভব। তাঁহার সাহিত্যবোধও ছিল তীক্ষ্ণ এবং তিনি সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করিতে সম্যক সমর্থ ছিলেন।

তিনি বাঙলা ভাষায় 'শিবাজী', 'মারাঠা জাতীয় বিকাশ' ও 'পাটনার কথা', এই কয়টি পুস্তক লিখিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তিনি একটি বাঙলা গ্রন্থের সম্পাদনা ও বহু বাঙলা গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদুনাথের বাঙলায় রচিত পুস্তকের সংখ্যা অল্প, তবে বাঙলায় তাঁহার ১৫০-এর অধিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে তাঁহার অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধও আছে। প্রবন্ধগুলির ভাষা এত সহজ ও স্বচ্ছ যে সেইগুলি পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইতে পারেন। সুতরাং ইংরাজী না জানিয়াও শুধু বাঙলা ভাষায় শিক্ষিত বাঙালীরা তাঁহার বহু গবেষণামূলক রচনার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত অনেককাল যুক্ত থাকিয়া ইহার উন্নতিকল্পে আন্তরিকতার সহিত ইহার সেবা করিয়াছেন। তিনি ইহাকে যে কত ভালবাসিতেন ও ইহার কিরূপ মঙ্গল কামনা করিতেন তাহা তাঁহার রচনা 'বাঙালীর নিজস্ব বাণী-মন্দির' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের একটি বিশেষত্ব, ইহার মত দীর্ঘায়ু ও বহুকীর্তি প্রতিষ্ঠান ভারতের আর কোন প্রদেশে নাই ...বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকের ও হস্তলিখিত পুঁথির এত বৃহৎ ও সর্বাঙ্গীন সংগ্রহ ভারতে আর কোনও স্থানে নাই।...

"যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব সৃষ্টি, গৌরবের প্রতিষ্ঠান।

"বাঙ্গালী জাতি ইহাকে নিজ সঙ্ঘ-শক্তি দ্বারা বলীয়ান করিয়া তুলুন ইহাই কামনা।"

১৩৪২-৪৩, ১৩৪৭-৫১ এবং ১৩৫৪ তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং ১৩২৫-২৮, ১৩৩৪, ১৩৪১, ১৩৪৪-৪৬, ১৩৫২-৫৯ এবং ১৩৬১-৬৫ সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৩৪৫-এ তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বকালে বাঙলা-সাহিত্য গ্রন্থের "রক্ষা ও প্রচারের কর্তব্য পরিষদ অনেকাংশে পালন" করিয়াছে। পরিষদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্যও তিনি প্রাণপণ সচেষ্ট ছিলেন।

এই পরিষদাশ্রয়ী তাঁহার সাহিত্য-কৃতির মধ্যে আছে ১৩৪২-এ তাঁহার প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা-মালা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি রচনা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাতটি উপন্যাসের তদ্রচিত ভূমিকা। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা-মালায় তাঁহার তিনটি বক্তৃতার বিষয়-বস্তু ছিল,—১। মারাঠা জাতির অভ্যুদয়, ২। শিবাজী ও ৩। শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা। ১৯৩৮-এ (বাঙলা সন ১৩৪৫) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শত-বার্ষিকী উপলক্ষে পরিষদ যখন বঙ্কিম রচনাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হয় তখন তাহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভূমিকা লিখিবার ভার যদুনাথের উপর অর্পিত হয়। তিনি এই কায অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন; ভূমিকাগুলি সুচিন্তিত এবং তাঁহার ইতিহাস ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

তাঁহার মতে দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম, মৃণালিনী, ও চন্দ্রশেখর ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী

ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। তিনি বলেন, "কোন নভেলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা বর্ণিত হইলেই সব সময়ে সেই গ্রন্থকে ঠিকমত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের চিহ্ন এই যে, তাহার মধ্যে ঘটনায় এবং চরিত্রে, ইতিহাস হইতে যাহা জানা গিয়াছে, এরূপ উপাদানই বেশী পরিমাণে এবং নিছক দেওয়া হইয়াছে; লেখকের কল্পনা তাঁহার পরিকল্পনায় এবং "অধম" চরিত্রগুলিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে বর্ণিত শহর গ্রাম, ঘর বাড়ী, পুরুষ স্ত্রী, পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র, কথাবার্তা রীতি-নীতি, আর যাহা সব চেয়ে বড়—চিন্তার ধারা এবং বিশ্বাস, এমন কি, কুসংস্কার পর্যন্ত—ঠিক সেই যুগের জ্ঞাত সত্যের কিছুতেই ব্যতিক্রম করিবে না" (দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা)। এই মানদণ্ডে যদুনাথ দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম, মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখরকে ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে বিশেষিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসগুলিতে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য এবং "সেই যুগের প্রাণ" আছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ঐতিহাসিক তথ্যের একান্ত অভাবের জন্য তিনি ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে গণ্য করেন নাই এবং তাঁহার মতে "ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 'আনন্দমঠে' বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটা খণ্ড যুদ্ধ বাদে) অনেকাংশে অসত্য"। সুতরাং তিনি ইহাকেও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে পারেন নাই। তথ্য ও প্রকৃত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার এই সংক্রান্ত প্রত্যেকটি মন্তব্য বিশেষ মূল্যবান।

ইহার পরে তিনি বলেন, "কিন্তু 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামের' মধ্যে যে অমৃতরস আছে, তাহা এ তিনখানি গ্রন্থ অপেক্ষা শতগুণ বেশী 'সত্য' ঐতিহাসিক কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় না।" ঐতিহাসিক ভূমিকা ব্যতিরেক যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত বিভিন্ন পুরুষ ও নারী চরিত্রের মনোজ্ঞ আলোচনাও করিয়াছেন।

১৩৫৫-র ২৪শে মাঘ (ইংরাজী ১৯৪৯-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে যদুনাথকে তাঁহার অষ্টসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনাকালে যে মানপত্র প্রদত্ত হয় ইহার কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইল :

"তুমি পরাধীন ভারতবর্ষের কলঙ্কিত ইতিহাস মন্থন করিয়া স্বাধীনতার গৌরবরত্ন আহরণ-পূর্বক আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছ, অশেষ দুর্গতি ও নৈরাশ্যের মধ্যে মহিমময় অতীতকে স্মরণ করাইয়া আশা ও উদ্যমে আমাদের জীবন সঞ্জীবিত করিয়াছ, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই কথা উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধচিত্তে তোমাকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি,...

"তুমি একক সাধনায় শুধু আপনার গৌরব অর্জনে ও বর্ধনে কালাতিপাত কর নাই, বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে সকলের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জয় যাত্রা, তুমি স্বদেশের কল্যাণের কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছ, তোমার অনুপ্রেরণায় তাঁহারা ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস ধীরে ধীরে উদ্ধার করিতেছেন,...

"হে সত্যসন্ধি, হে সত্যভাষী, হে জ্ঞানতপস্বী, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

"শিক্ষায় পশ্চাৎপদ এই দেশের তরুণদের শিক্ষাকার্যে যৌবনে আত্ম-নিয়োগ করিয়া তুমি আজীবন সেই ব্রতই পালন করিতেছ,

"সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে তুমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছ, নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রীতির দ্বারা তোমার উত্তরসাধকদের তুমি পথপ্রদর্শক হইয়াছ। তোমার নিরলস কর্মসাধনা আজিও সঙ্কট-কালে বার-বার পরিষদকে রক্ষা করিতেছে, রমেশচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্রনাথের ধারা তুমিই বহু ক্লেশে

অব্যাহত রাখিয়াছ,...হে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরিষদ শ্রেষ্ঠ, আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর, অভিনন্দন গ্রহণ কর, প্রীতি গ্রহণ কর॥"

যদুনাথ আট বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত 'রবীন্দ্র পুরস্কার' বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি সবদা একটি উচ্চমান বজায় রাখিয়া এই কর্তব্য পালন করিতেন। কর্তৃপক্ষও তাঁহার কাযে সন্তুষ্ট ছিলেন, তথাপি স্বাস্থ্যের কারণে ও সমালোচনায় বিরক্ত হইয়া তিনি ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন।

তিনি 'রবিবাসরের' সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, সময়ে সময়ে ইহার অধিবেশনে ভাষণও দিতেন এবং আলোচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। নীরস বিষয়ও তিনি শ্রোতাদের কাছে এমন সরস করিয়া বলিতে পারিতেন যে তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন। একবার শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় তিনি বলেন, "ইংরেজী সাহিত্যে যেমন মেরী করেলি বাংলা সাহিত্যে তেমনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উভয়েই জনপ্রিয়তা অজন করিয়াছেন খুব, কিন্তু কালের কষ্টি পাথরে ইহারা কতটুকু টিকিয়া থাকিবেন বলা কঠিন।" । 'বরণীয়', বাগল, পৃঃ ১৪৩

যদিও তিনি নীরব কর্মীরূপে থাকিতেই ভালবাসিতেন এবং সভা-সমিতিতে যাওয়া বিশেষ পছন্দ করিতেন না, তথাপি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার পক্ষে সব সময়ে সম্ভব হয় নাই। ১৩২২ ও ১৩৪৩-এ তিনি যথাক্রমে বর্ধমান ও চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতিত্ব করেন এবং ১৩১৭ ও ১৩৩৭ সনে তিনি যথাক্রমে মালদহ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ও আগ্রাতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৩৩৪-এ তিনি পঞ্চবিংশ-বার্ষিক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্মেলনেও সভাপতি ছিলেন।

যদুনাথ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে রাজশাহী (বর্তমান বাঙলা দেশে) জেলার কিছু অংশ ছিল। এই অংশের মধ্যে পতিসর ছিল। দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া জমিদারি-তত্ত্বাবধানকালে যদুনাথের পিতা রাজকুমার সরকারের সহিত পরিচিত হন। এই পরিচয়ের সুযোগ হওয়ার কারণ রাজকুমারের নিবাস করচমাড়িয়া ও মহর্ষির মহল পতিসর প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। যদুনাথ যখন কলিকাতায় স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন পিতা তাহাকে একবার জোড়াসাঁকোতে মহর্ষির ভবনে লইয়া যান। তখনই যদুনাথ মহর্ষিকে প্রথম দর্শন করেন।

মহর্ষি ও রাজকুমারের মধুর সম্পর্ক তাঁহাদিগের পুত্রদ্বয়ের আমলেও বজায় ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি যদুনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁহার রচনা যখনই যাহা প্রকাশিত হইত যদুনাথ সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতেন।

১৯০৪-এর অক্টোবর মাসে যদুনাথ বুদ্ধগয়াতে গিয়াছিলেন। তখন সেখানে জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ও ভগিনী নিবেদিতাও গিয়াছিলেন। তথায় বঙ্গদেশে স্বার্থত্যাগ ও জাতীয়তাবোধ ইত্যাদির অভাবে ব্যথিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা যখন দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন তখন যদুনাথ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদিও আমাদের হতাশ হইবার কারণ আছে, তবুও আমি হতাশ হই নাই. রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের বাঙলার পরিত্রাতা।" তৎপর যদুনাথ কবির অল্প দিন পূর্বের রচিত কয়েকটি কবিতার কয়েক পংক্তি উপস্থিত মত ইংরাজীতে অনুবাদ

করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন কি করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গাথা, গল্প, সঙ্গীত ও প্রবন্ধ ইত্যাদিতে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী, সত্যনিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গ ও আত্মনিবেদনের সাধনা বাঙলা সাহিত্যে নূতনভাবে পরিবেশন করিয়া বঙ্গদেশের নবপ্রজন্মের প্রাণ উদ্দীপিত করিতেছেন। যে কয়টি কবিতার অংশ তিনি তখন ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ভগিনী নিবেদিতাকে শুনাইয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে একটির ইংরাজী অনুবাদসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই'—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" (সুপ্রভাত)

"What voice is it that I hear
From the land of dawn,
'Fear not ! Fear not !'
He who will give up his life
Retaining nothing !
Will never end, never perish."

যদুনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে মনে প্রাণে স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এবং বড়লাট লর্ড কার্জনের সময়ে অনুষ্ঠিত বঙ্গভঙ্গে উভয়ই অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। যদুনাথ তখন পাটনায় ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের দিনে অর্থাৎ ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০-শে আশ্বিন) কবি তাঁহাকে পাটনায় 'রাখী' এবং লিপি পাঠান।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিরুদ্ধে এক সময় দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতার অভিযোগ উঠিয়াছিল। খ্যাতনামা সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের

অভিব্যক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে 'প্রবাসী'তে (কার্তিক, ১৩.৩) এই অভিযোগ করিয়া লিখিলেন, "আমাদের দেশে এই অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। · রবিবাবুর ভক্তগণ রবিবাবুর 'সোনার তরী'কে তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন।···বলা বাহুল্য কবিতাটি যারপর নাই অস্পষ্ট।" পরবর্তী মাসের 'প্রবাসী'তে যদুনাথ 'সোনার তরী'র ভাবার্থ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়া লিখিলেন, "কাব্য বুঝিতে হইলে পাঠকের মনের সহায়তা অত্যাবশ্যক।···যে পাঠক যতটা পুঁজি লইয়া আসেন, কাব্য পাঠ করিয়া সেই পরিমাণেই লাভ করেন।

"রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাব প্রচার করিতেছে। ('সোনার তরী'কে এ ভাবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বা আদর্শ মনে করা ভুল)। এই ভাবগুলি আমাদের পুরাতন স্মৃতি-অভ্যস্ত ভাব হইতে ভিন্ন, অনেকের পক্ষেই নূতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা করা যায় না;···

"কেবল একটি কবিতা বা অধ্যায়ে চক্ষু নিবিষ্ট রাখিলে লেখকের মনের ভাব ধরা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু এমন কোন লেখক নাই, যাঁহার অনেকগুলি এক সময়ের রচনা পড়িলে অর্থবোধ অসম্ভব বা কঠিন।··· আমাদের দেশের সমালোচকেরা যদি ভাব বিকাশ তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া চিনিতেন, তবে এতদিনে রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরনের কবিতাগুলি পাঠক-সমাজে বড়ই পুরাতন হইয়া পড়িত। তাহা হয় নাই বলিয়া কি এগুলি অর্থহীন জটিলতা মাত্র, শুধু মিছে কথা গাঁথা? তাহাদের মধ্যে কি এক মহান শিক্ষা নাই?"

১৯১১-১৩-র মধ্যে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের ১৫টি রচনা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ঐগুলি 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে বাঙলা ভাষায়

অপরিচিত ভারতীয় জনসমাজে ও বিশ্বসভায় পৌঁছান। এই অনুবাদের পালা ও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ আমাদের দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজের প্রথম দিকেই ছিলেন যদুনাথ। যে রচনাগুলি ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা', 'শকুন্তলা', 'জয়-পরাজয়', 'কালিদাস', 'ঘাটের কথা', 'এক রাত্রি' ও 'শিখ জাতির উত্থান ও পতন' প্রভৃতি ছিল। এই অনুবাদগুলি কবির পছন্দ হইয়াছিল।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ "আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপে"...তাঁহার 'অচলায়তন' নাটকখানি যদুনাথের নামে "উৎসর্গ" করেন।

যদুনাথের উপর উক্ত অনুবাদগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার জন্য ১৯১৯-এ এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। লণ্ডনের জনৈক প্রকাশকও "এইরূপ গ্রন্থের প্রকাশের ও বিক্রয়ের ভার লইতে সম্মত হইয়া" তাঁহাকে লিখেন, কিন্তু তিনি ঐ সময় "চাকরির ঝঞ্ঝাটে ও পারিবারিক শোকে অভিভূত" থাকিবার জন্য ঐ কাজ হয় নাই।

কবির রচিত 'বৃহত্তর ভারত' এবং 'পণরক্ষা' ও 'পূজারিণী' ১৯২৭ ও ১৯৩১-এ যদুনাথকৃত ইংরাজী অনুবাদ 'মডার্ণ রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়। 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি তিনি (যদুনাথ) এত ভাল বাসিতেন যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি সময়ে সময়ে তিনি বাড়িতে আবৃত্তিও করিতেন।

'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ' প্রকাশের পূর্বে কবিগুরু তাঁহার সহিত পরামর্শ করেন। যদুনাথ 'গুরুদাস চ্যাটার্জি এণ্ড্ সন্স্' এর স্বত্বাধিকারীকে তাঁহাদের আট আনা সংস্করণের মত ইহা প্রকাশ করিতে সম্মত করান। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে একটি প্রবন্ধও প্রকাশ

করেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "জ্ঞানই শক্তি। সেই শক্তি সরল মাতৃভাষায় রচিত সদ্‌গ্রন্থের দ্বারা ভারতময় সঞ্চারিত করিতে হইবে। জাতীয় মুক্তি এই পথে।" এই উদ্দেশ্যে বাঙলায় এবং পরে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এই পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ইহার মুখ্য সম্পাদক, উপদেষ্টা ও কার্য-নির্বাহক এবং যদুনাথ সম্পাদক মনোনীত হন।

যদুনাথ কবিগুরুর সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে কতকগুলি সারগভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলির সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ভারতের অতীত কথার গভীর মর্ম, ইতিহাসের মধ্যে আমরা কি চাই, ইতিহাস-গ্রন্থ কিরূপ হওয়া চাই, এই সব বিষয়ে তিনি অনেকগুলি গভীর চিন্তাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র ও সমস্যা সম্বন্ধে অতি মূল্যবান বিচার লিখিয়া গিয়াছেন।" যদুনাথ আরও বলেন যে, কবিগুরু ভারতের অতীতকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা এই রচনাগুলিতে পরিস্কার-ভাবে বুঝা যায়। এইগুলিতে আছে "Philosophy of history" এবং এই সমস্ত পাঠ করিলে "রবীন্দ্রনাথকে আরও একান্তভাবে চিনিতে এবং কবির হৃদয় স্পষ্টতর" দেখিতে পাওয়া যায়।

যদুনাথ কবির যেমন শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তিনিও কবিকে তেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। কবির অনুরোধে যখন যদুনাথ বিশ্বভারতীর পরিচালক সমিতির সদস্যপদ গ্রহণে অসমর্থ হন (১৯২২), তখন কবি অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনার প্রতি চিরদিন যে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাহার প্রধান কারণ আপনি ব্যক্তিগত অন্ধ-সংস্কার বা মিথ্যা ভাবুকতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া সত্য-সন্ধানের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না।

আমাদের দেশের অনেকে যাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য তাঁহাদের সাধনা এরূপ বিশুদ্ধ নহে।...

"আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।" (প্রবাসী, ১৩৫২)। সুতরাং উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক পূর্বের মতই ছিল।

উভয়ের মধ্যে শান্তিনিকেতন, বুদ্ধগয়া, বারাণসী ও দার্জিলিঙ্ প্রভৃতি স্থানে ব্যক্তিগভাবে দেখা-সাক্ষাৎ ব্যতীত চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান-ত ছিলই। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ যতুনাথকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণও জানাইতেন, যেমন পৌষ ও শারোদৎসবের সময়ে। একবার তিনি লিখিয়াছিলেন, "৭ই ও ৮ই পৌষের উৎসবে আশ্রমবাসীরা আপনাকে প্রার্থনা করে। দর্শন যদি পাই, তবে কাজও হয়, আনন্দও হয়।" পণ্ডিত প্রবর সিলভ্যাঁ লেভি শান্তিনিকেতনে আসিবার কালেও যতুনাথ আমন্ত্রিত হন। কবি তাঁহাকে লিখেন, "আগামী নভেম্বরে ১৯২১ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি আশ্রমে এসে কিছুদিন অধ্যাপনা করবেন। সেই সময়ে আপনাদের মত লোকের সমাগম আশ্রমে নিতান্ত দরকার হবে।" (প্রবাসী, ১৩৫২)। পরবর্তীকালের চিঠি হইতেও রবীন্দ্রনাথ ও যতুনাথের এইরূপ হৃদ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই দুই মহান্ ব্যক্তির মধ্যে যে আত্মীয়তা-বন্ধন হইয়াছিল তাহা উভয়ের সাংস্কৃতিক-ভাব-বিনিময় এবং একে অপরের প্রতিভার সম্যক উপলব্ধির জন্য আরও মধুর হয়। উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিলও ছিল ; ধন, মান ও যশ, কোনটিই তাঁহাদিগকে কখনও প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের ছিল অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা, প্রেম এবং স্বদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও শাস্ত্রে গভীর শ্রদ্ধা ও উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন। অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট উপনিষদ পাঠ করিতেন। তিনি পিতার সহিত

হিমালয়ে গিয়াই প্রথম প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবন গড়ার পক্ষে পিতার নির্মল চরিত্র ও এই সমস্ত শিক্ষা খুবই সহায়ক হইয়াছিল। যদুনাথের জীবনেও পিতার পূত চরিত্র ও সুন্দর শিক্ষা তাঁহার উত্তর জীবনে কার্যকরী হইয়াছিল।

তাঁহাদের উভয়ের অবিচলিত ভগবদ্ভক্তি ছিল বলিয়াই জীবনে একাধিকবার আপনজনের গভীর বিয়োগব্যথা তাঁহারা নীরবে সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং স্ব স্ব কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই।

তাঁহাদের সমুন্নত জীবন, মহান্ আদর্শ, ও অমূল্য সাংস্কৃতিক দান শুধু ভারতের নয়, বিশ্বেরও চির-সম্পদ।

মানুষ যদুনাথ

সুদীর্ঘ তিরিশ বৎসরের অধিক কাল আমার (লেখকের) যদুনাথের সহিত পরিচয় ছিল। পাটনায় তাঁহার ভিক্না পাহাড়ীর বাড়িতে আমি কয়েকমাস অতিথিও ছিলাম। সুতরাং অতি নিকট হইতে তাঁহাকে জানিবার আমার অনেক সুযোগ হইয়াছে। তাঁহার বাড়িতে অবস্থান করিয়া যাঁহারা তাঁহার অধীনে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার ও আচার্য পত্নীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়াছেন।

রাত্রে যদুনাথ আমাদের সঙ্গে একত্র আহার করিতেন এবং আমাদের মতই পিঁড়িতে বসিতেন। তাঁহার যেমন বাক্‌সংযম ছিল তেমন আহারেও তিনি সংযমী ছিলেন। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার বেশীর ভাগ সময় পাঠাগারেই অতিবাহিত হইত, অবশ্য প্রত্যূষে ও বৈকালে তিনি নিয়মিত বেড়াইতে বাহির হইতেন।

অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাতে তিনি কখনও সময় নষ্ট করিতেন না। স্বল্পভাষী ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেন

এবং কঠোর স্বভাবের মনে করিতেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন তাঁহারা ভালভাবে জানেন যে, তাঁহার হৃদয় কত স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র ছিল। প্রয়োজনবোধে তিনি কখনও কাহাকেও সাধ্যমত সাহায্য করিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু মিথ্যাকথা ও ছলচাতুরি তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। মানুষ চিনিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কেহ তাঁহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিলে তিনি কখনও তাহাকে সুনজরে দেখিতেন না। আবার যে তাঁহাব বিশ্বাসভাজন হইত ও সঠিক পথে চলিত, তাহাকে তিনি স্নেহ ও ভালবাসা দিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার পছন্দ ও অপছন্দের মধ্যে একটি কঠিন সীমারেখা থাকিত। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেও তাঁহার সময়োচিত বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাব হইত না।

তাঁহার দীর্ঘ ঋজু দেহ, বলিষ্ঠ অবয়ব, বিস্তৃত ললাট ও অন্তর্ভেদী চক্ষু নিঃসন্দেহে তাঁহার ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করিত। তাঁহাকে দর্শন মাত্রই মনে হইত তিনি একজন দৃঢ়চেতা মানুষ। আলস্য বা দীর্ঘসূত্রিতা তাঁহার চরিত্রের পরিপন্থী ছিল এবং তাঁহার সময়ানুবর্তিতা এক রকম প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

তিনি নিজে যেমন পবিত্র ও সংযত জীবন যাপন করিতেন তেমন তিনি চাহিতেন জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি যেন চরিত্রবান হয়। চরিত্রই জাতির মেরুদণ্ড; নাগরিকদের চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে জাতীয় উন্নতি ও কল্যাণ সম্ভব নয়। জাতীয় চরিত্রের অবনতির ফলেই যে জাতি বিপদাপন্ন হয় ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার **Fall of the Mughal Empire**-গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণপূর্বক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

নিরহঙ্কার ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ যদুনাথ নিজেকে একজন দীন কর্মী ও জ্ঞানসাধকই মনে করিতেন, কাজের ফলের প্রতি তাঁহার দৃকপাত ছিল না। 'আমার জীবন দর্শন' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "কেহ যেন না ভাবেন যে এই যোগ সাধনায় আমি সিদ্ধিতে পৌঁছতে পেরেছি। আমার মৃত্যুর পরই জগৎ বলতে পারবে এর কতটা 'বিফল বাসনা রাশি' মাত্র।" তিনি ছিলেন নিষ্কাম কর্মী। যশ অথবা পুরস্কারের প্রত্যাশায় তিনি কখনও কোন কায করেন নাই। কিন্তু তবুও তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ভারত ও ভারতের বাহিরের বিভিন্ন বিদ্বৎসমাজ হইতে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি, গ্রিফিথ পুরস্কার এবং আরও যে সব সম্মান প্রাপ্তির কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলি ব্যতীত তিনি ১৯২৩-এ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড-এর অনারারি মেম্বর, ১৯৩৫-এ ইংলণ্ডের হিস্টরিক্যাল সোসাইটির করেসপণ্ডিং মেম্বর এবং আমেরিকান হিস্টরি-ক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব্ ওয়াশিংটন-এর অনারারি লাইফ মেম্বর মনোনীত হন। ১৯২৩-এ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বোম্বে তাঁহাকে ক্যাম্বেল স্বর্ণপদক প্রদান ও অনারারি 'ফেলো' নির্বাচিত করে। ১৯২৬-এ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলও তাঁহাকে 'ফেলো' নির্বাচিত করে। ১৯৩৬ ও ১৯৪৪-এ যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে তিনি সম্মানসূচক ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত হন। পরে তিনি এইরূপ উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃত হন এবং ১৯৫২-তে তিনি সরদেশাইকে লিখেন, "I now decline the Hony. Doctorship which is being showered by the Indian Universities." (Commemoration Vol. I. P. 269.)। ইংরাজ সরকার তাঁহাকে ১৯২৬-এ সি. আই. ই. এবং ১৯২৯-এ 'নাইট্' উপাধিতে ভূষিত করে। এখানে উল্লেখ্য যে,

১৯২৯ হইতে ১৯৩২ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের মনোনীত সদস্য ছিলেন। তাঁহার আশি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি ১৯৫০-এ তাঁহাকে সম্বর্ধনা দেয় এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৭-১৯৫৮) দুই খণ্ডে Sir Jadunath Sarkar Commemoration Volume প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে।

এইরূপ বিভিন্নভাবে সম্মানিত হইয়াও তিনি কখনও আত্মগৌরবে স্ফীত হন নাই এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সহজ, সরল ও আড়ম্বরবিহীন জীবনধারার কোন পরিবর্তন হয় নাই। তিনি নিভৃতে নিজের সাধনায় সময় অতিবাহিত করিতেই ভালবাসিতেন। উপাধি-প্রাপ্তিতে তিনি সময়ে সময়ে রসিকতাও করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি. লিট্ উপাধি প্রদত্ত হইলে সবদেশাই তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া চিঠি লিখেন; ইহার প্রত্যুত্তরে যদুনাথ লিখিলেন, "yes, I am now a doctor, but I like to place after my title, Hom. within brackets, i. e., Homoeopathic, instead of the usual Hon." (Commemoration Vol. I., P. 6.)

পরমুখাপেক্ষী হইয়া চলা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। নিজের কাজ তিনি নিজে করিতেই ভালবাসিতেন। ভাবিতে অবাক লাগে, যখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তখনও তিনি বাজার করিয়া নিজ হস্তে জিনিষপত্র লইয়া হাঁটিয়া বাসায় ফিরিতেন। জীবনে তাঁহার কোন নেশা (যেমন ধূম বা মদ্যপান) ছিল না। সাধারণভাবে হিসাবী ও মিতব্যয়ী হইলেও পরোপকারে অর্থব্যয় করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না এবং পুঁথি ও পুস্তকের জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

তাঁহার ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ কানুনগো বলেন,

He is not a devotee of any mortal born of mother's womb believing neither in incarnations nor prophets." তাঁহার মন জাতিভেদ ও সর্ববিধ কুসংস্কারের বিরোধী এবং অত্যন্ত উদার ছিল। জাতি বা ধর্মবিষয়ে কোন রকম পার্থক্য না করিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলাই তাঁহার নীতি ছিল। উপনিষদের ধর্ম তাঁহার উপরে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, যে সমস্ত গ্রন্থের সাহচর্যে তিনি নূতন 'প্রাণ পাইতেন' তাহাদের মধ্যে উপনিষদও ছিল। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুধা ঘোষের নিকট হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতেও উপরি উক্ত মতই সমর্থিত হয়।

যদুনাথের আন্তরিক স্বদেশ-প্রীতি ছিল। যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন আন্দোলনে যোগদান করেন নাই তাহা হইলেও তাঁহার অনেক কার্যে এই মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব হইতেই তিনি বিলাতি ধুতি পরিধান না করিয়া স্বদেশে প্রস্তুত মোটা ধুতি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার স্বদেশ প্রীতির সহিত সুপরিচিত ছিলেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের দিনে তাহাকে পাটনায় 'রাখী' ও কার্ড পাঠাইতে ভুলিয়া যান নাই। সরকারি চাকরি করিয়াও যদুনাথ তাঁহার Economics of British India-তে স্বাধীন চিন্তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন এবং নির্ভীকভাবে তিনি বিদেশী শাসনের সমালোচনা করিয়াছেন। আবার দেখা যায়, তিনি নিঃসংকোচে পাটনায় তাঁহার বাড়িতে বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের অনুগামী বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রকে পুত্র-কন্যাদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিহার ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র এবং বাঁকিপুর বিপ্লবীদলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন। কিন্তু ঐ কলেজ হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত (rusticated) করা হয়। ঐ অবস্থায় যখন তিনি বাঁকিপুরে কোথাও থাকিবার স্থান পান নাই,

তখন যদুনাথ তাঁহাকে তাঁহার বাড়িতে আশ্রয় দেন। (W. sealy-connections with the Revolutionary organisation in Bihar and Orissa, 1906-16, printed by the Bihar Government in 1917 ; B. B. Majumdar, Militant Nationalism in India, pp. 120-21)। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় বলিয়াছেন যদুনাথ "কখনও বিদেশী পণ্ডিত সমাজের মতামতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন নি," তিনি "ছিলেন মনেপ্রাণে স্বদেশী"। এই উক্তিগুলি অতি যথার্থ।

ভারতের স্বাধীনতার পরে কিভাবে এই দেশের কল্যাণ হইবে এবং দেশের সামরিক শক্তি বর্ধিত করা যাইতে পারে সেই সমস্ত বিষয়ে তিনি যে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করিতেন তাহার স্বাক্ষর তাঁহার বিভিন্ন রচনায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই পৌত্র—সন্তোষকুমার সরকার ও অমিতকুমার সরকারকে সামরিক বিভাগে দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ, অমিতকুমার ১৯৫৭ সালে অকস্মাৎ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। সন্তোষকুমার বর্তমানে সামরিক বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, ইহা আগেই বলা হইয়াছে।

স্বদেশ-ভক্ত, মানবপ্রেমিক বা বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি যদুনাথের বরাবর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৩) ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। আমাদের দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও নিষ্কাম কর্মের দ্বারা এই দেশের সেবার জন্য তিনি ভগিনী নিবেদিতাকেও (১৮৬৭-১৯১১) অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। 'ডন' সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও স্বদেশপ্রেমিক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৮) প্রতি তাঁহার আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা, ও শিক্ষা-সংস্কার

প্রভৃতির জন্যও যদুনাথের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। ১৯১৭-১৯১৯-এ বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি প্রায়ই সতীশচন্দ্রের আবাসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

যদুনাথ কথায় ও কাযে, সবদা ছিলেন অতি স্পষ্ট। তাঁহার উক্তিতে বা রচনায় কখনও দ্ব্যর্থবোধক কিছু থাকিত না। তাঁহার হস্তাক্ষরও সুন্দর ও স্পষ্ট ছিল। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি এত সুবিস্তৃত ও গভীর ছিল যে, তাহা অপরের পক্ষে পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। শুধু সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়েও তাঁহার জ্ঞান কম ছিল না। বিজ্ঞানে নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত এবং তিনি এই সমস্ত বিষয় অনায়াসে সহজভাবে আলোচনা করিতে পারিতেন। পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল তিনি নিয়মিত 'টাইম্‌স্ লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট'-এর পাঠক ছিলেন এবং সাময়িক ইংরাজী সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধেও সম্যক্ অবহিত ছিলেন।

তিনি দার্জিলিঙ্ বিশেষভাবে পছন্দ করিতেন, কারণ স্থানটি মনোরম, স্বাস্থ্যপ্রদ এবং শীতল, তাঁহার গবেষণা-কার্যের মানসিক পরিশ্রমের পক্ষে খুব অনুকূল। প্রথমে সেখানে তিনি একটি ছোট বাড়ি ক্রয় করিয়াছিলেন, পরে টোঙ্গা রোডে একটি অপেক্ষাকৃত বড় ও সুন্দর বাড়ি তৈয়ারি করাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহার ৭০ বৎসর বয়সের পর দার্জিলিঙ-এর জলবায়ু সহ্য না হওয়াতে তিনি দক্ষিণ কলিকাতার ঢাকুরিয়া হ্রদের অদূরে একটি গৃহ নির্মাণ করাইয়া ১৯৪০ হইতে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি এই বাড়িতে বাস করিয়াছিলেন। ১৯৫৪-তে দার্জিলিঙ্ এর টোঙ্গা রোডের বাড়িটি এভারেষ্ট-শৃঙ্গ-বিজয়ী টেন্‌জিঙ্গ্ নোরকের নিকট বিক্রয় করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮৯৩-তে যদুনাথের সহিত কাদম্বিনী

চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদের বিবাহিত জীবন প্রথমে সুখ ও শান্তির মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই উদার ও উন্নত চরিত্র-বিশিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য ছিল। কিন্তু পরবর্তী-কালে একাধিক আপনজনবিয়োগে তাঁহাদের জীবন বড়ই বিষাদময় হয়।

তাঁহাদের সন্তানদের মধ্যে তিন পুত্র ও সাত কন্যা। ১৮৯৬-এর ৮-ই জুন, সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান অবনীনাথের জন্ম হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্. এস্. সি. পাশ করিবার পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট (Ph. D.) উপাধি প্রাপ্ত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রিডারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে তিনি সেই কাজ বেশীদিন করিতে পারেন নাই। ১৯৪৭-এ নিজেদের ছাপাখানার কায তদারকের পরে বাড়ি ফিরিবার পথে তিনি কলিকাতার ধর্মতলায় মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার পত্নীর নাম চিত্রা দেবী। দ্বিতীয় সন্তান, কন্যা—জন্ম, ১৮৯৮-এর ১০ই অক্টোবর, মৃত্যু ১৮৯৯-এর ২-রা জানুয়ারি। তৃতীয়, সন্তান, কন্যা—জন্ম, ১৯০০-এর ১০ই জানুয়ারি, মৃত্যু, ১৯০৩-এর মে মাসে। চতুর্থ সন্তান—মণীন্দ্রনাথ, জন্ম, ১৯০২-এর ১৭ই মার্চ; তিনি আই. এস্. সি. পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করেন। ১৯২০-এর ১৯শে মে তাঁহার মৃত্যু হয়। পঞ্চম সন্তান—সত্যেন্দ্রনাথ, জন্ম, ১৯০৩-এর ৭ই জানুয়ারি, মৃত্যু, ১৯৫৫-এর ৮ই সেপ্টেম্বর, ষষ্ঠ, কন্যা—প্রিয়ম্বদা, জন্ম, ১৯০৫-এর ৩১ শে আগষ্ট, মৃত্যু, ১৯৮১-এর ২৭ শে মার্চ,—স্বামী, ডাঃ সৌরীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৯৭-১৯৪৭); সপ্তম, কন্যা—জন্ম, ১৯০৭-এর ২ রা জুলাই, মৃত্যু, ১৯০৮ এর ২২শে মে; অষ্টম, কন্যা—দীপিকা, জন্ম, ১৯০৯-এর ৬ই মার্চ, মৃত্যু, ১৯৭১-এর ১৮ই জুলাই,—স্বামী, বীরেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৬-১৯৬৪); নবম, কন্যা—সুধা, জন্ম, ১৯১১-এর ১৯শে নভেম্বর,—স্বামী, মেজর সুশীলকুমার ঘোষ,

মৃত্যু, ১৯৪২-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি ; দশম, কন্যা—রমা, জন্ম, ১৯১৬-এর ১৮ই নভেম্বর; তিনি আই. এস. সি. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্. এস্. সি. পাশ করিবার পরে তিনি গবেষণাকার্যের জন্য ইংলণ্ডে যান ; ১৯৪৯-এ তিনি সেখানে পরলোক গমন করেন।

উপরের তালিকায় দেখা যায় ১৯২০-এর মধ্যে যদুনাথের তিন কন্যা ও এক পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এই সব গভীর শোকাবহ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধেও শঙ্কিত ছিলেন। ১৯২২-এর ২০শে জানুয়ারি তিনি কটকে অবস্থানকালে কলিকাতায় পত্নীকে লিখেন, "আগে কখন একেলা থাকিতে এত বিসন্ন ও হতাশ হইয়া পড়িতাম না। এখন আমাদের ও অন্যান্য সংসারের ব্যারাম, মৃত্যু, দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন বৃদ্ধ বয়স মহাশোকে কাটাইতে হইবে ; চারিদিকে অন্ধকার ও নিরাশা ঘন হইয়া জমিতেছে।" (যদুনাথের পুত্রবধূ চিত্রা দেবী ও শেষোক্তের পুত্রবধূ রেবা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত পত্র হইতে উদ্ধৃতি।) নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার শঙ্কা নিদারুণ ও নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হইয়াছিল। ১৯৪২-এ যদুনাথের তৃতীয় জামাতা মেজর সুশীলকুমার ঘোষের মৃত্যু হয় ; ১৯৪৭-এ জ্যেষ্ঠ জামাতা সৌরীন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীনাথ, ১৯৪৯-এ কন্যা রমা, ১৯৫৫-তে পঞ্চম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং ১৯৫৭-তে পৌত্র ক্যাপ্টেন অমিতকুমারের মৃত্যু হয়। এই সমস্ত শোকাবহ ঘটনার মধ্যে যদুনাথের সহধর্মিণী আকস্মিক পতনের ফলে অবশিষ্ট জীবনের জন্য শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন।

উপরি উক্ত ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যেও যদুনাথ কি অসীম ধৈর্যের সহিত সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গভীর দুঃখ-বেদনায় হৃদয়ের অন্তস্থল জর্জরিত হইলেও বাহিরে তাঁহার

সেই চির-প্রশান্ত মূর্তিই দেখা যাইত। তাঁহার আন্তরিক ভগবদ্‌বিশ্বাস এই বিষাদময় অবস্থায় নিজেকে স্থির রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর ১৫।২০ দিন পূর্বে লেখক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় অত্যধিক গরমের জন্য তাঁহার তেমন কোন কর্ম-ব্যস্ততা ছিল না। শরীর কেমন আছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জবাব দিলেন, "ভাল, তবে গরমে বড কষ্ট হয়, কোন কাজ করতে পারি না; সভা-সমিতিতেও বিশেষ যাই না। সকালে ও বৈকালে ঢাকুরিয়া লেকের কাছে বেড়াইতে যাই।" তাঁহার সঙ্গে লেখকের বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল এবং অনেক পুরাতন কথারও আলোচনা হইল। ইহাতে বেশ বুঝা গেল তাঁহার স্মৃতি-শক্তি তখনও ভালই ছিল এবং তাঁহার ঋজু দেহেরও কোন পরিবর্তন হয় নাই। সেইদিন তাঁহাকে দেখিয়া একেবারেই মনে হয় নাই যে, মাত্র কয়েকদিন পরে তিনি এই পার্থিব জগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চির-বিদায় গ্রহণ করিবেন।

১৯৫৮-এর ১৯শে মে বৈকালে তিনি অভ্যাসমত বেড়াইতে যান; বাড়িতে ফিরিয়া কন্যা সুধাকে বলেন, "শরীরটা তেমন ভাল নয়, বুকের বাঁ-দিকে একটু কেমন কেমন মনে হয়। রাত্রে আমাকে কেবল এক গ্লাস জল দিও, আর কিছু খাব না!" রাত্রি নয়টার কিছুক্ষণ পরে জল লইয়া আসিয়া কন্যা পিতাকে ডাকিলেন; পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও পিতার কোন সাড়া না পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন পিতা অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত।

এইভাবে কাহারও সেবার প্রতীক্ষায় না থাকিয়া যদুনাথ নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে দুঃখ-বিষাদময় জগৎ হইতে চির-শান্তির নিলয়ে আশ্রয় নিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তিনি রাখিয়া গেলেন তাঁহার অক্ষয়-কীর্তি। মৃত্যুর পরে সুধা তাঁহার শয্যায় দুইটি পুস্তক পাইলেন, একটি 'আইভান্‌হো', অপরটি 'ব্রহ্মসঙ্গীত'। 'আইভান্‌হো' যদুনাথের খুব

প্রিয় ছিল এবং কয়েকটি প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্য তিনি ব্রহ্মসঙ্গীতও কাছে কাছে রাখিতেন।

যদুনাথ পরলোক গমন করার পর তাঁহার গ্রন্থাগারে রক্ষিত সমস্ত গ্রন্থ, পুঁথি ও মানচিত্র, ইত্যাদি, জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়। তাঁহার সহধর্মিণী লেক টেরাসের বাড়িটির স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন এবং তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালকে দান করা হয়। ১৯৬৪-র ১৯শে এপ্রিল তিনি পরলোক গমন করেন।

লেক টেরাসের একাংশের নাম পবিবর্তন হইয়া বর্তমানে যদুনাথ সরকার রোড রাখা হইয়াছে।

রচনাপঞ্জী ঃ

বাঙলা পুস্তক

১। পাটনার কথা ১৩২৩

২। শিবাজী ১৯২৯

৩। মারাঠা জাতীয় বিকাশ আষাঢ়, ১৩৪৩ (ইং ১৯৩৬)

সম্পাদিত গ্রন্থ

সিয়ার্-উল্-মুতাখ্‌খরীণ—লেখক—ঘুলাম হুসেন্ খান্, সৈয়দ ;
অনুবাদক—গৌবসুন্দর মিত্র, যদুনাথ সবকার কর্তৃক সম্পাদিত। কার্তিক
১৩২২ (ইং ১৯১৫) পৃ. ৪০ (অসম্পূর্ণ)

মহেন্দ্রনাথ করণ—২য় সংস্করণ, যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংশোধিত ও সজ্জিত।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ও ভাষণসমূহ

সুহৃদ

হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা ৮১ বছর পূর্বে বৈশাখ, ১৩০২

প্রবাসী

আওরংজীবের আদিলীলা	কার্তিক, ১৩১১
কবিবচন-সুধা	অগ্রহায়ণ, ১৩১২
চাটগাঁ ও জলদস্যুগণ	পৌষ, „
শায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ অধিকার	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩
শাহজাহানের রাজ্য-নাশ	অগ্রহায়ণ, „
'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা	অগ্রহায়ণ, „
তুইরকম কবি-হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ	ভাদ্র, ১৩১৪
সিয়াব-উল্-মুতাখ্খরীণ	ভাদ্র, ১৩১৫
খুদাবক্স্ খাঁ বাহাতুর	আশ্বিন, „
মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ	ফাল্গুন, „
বঙ্গভাষীদেব জন্য বিহারে কলেজ স্থাপন	ফাল্গুন, ১৩১৬
মথুবানাথ সিংহ (ছদ্মনাম)	
বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য	মাঘ, ১৩১৭
বিকানীব	কার্তিক, „
বাদশাহী গল্প	আশ্বিন, ১৩১৮
পূর্ব-বঙ্গ	শ্রাবণ, ১৩২০
মুর্শিদকুলী খাঁর অভ্যুদয়	কার্তিক, ১৩২১
ইতিহাসচর্চার প্রণালী	বৈশাখ, ১৩২২
('ইতিহাস' ১৩৭৭ পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত)	
বর্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণ	„
(১৩৫৫ আশ্বিন শনিবারের চিঠিতে পুনর্মুদ্রিত)	
বাঙ্গালার ইতিহাস	শ্রাবণ, „

পাটনার প্রাচীন চিত্র	মাঘ, ১৩২৩
প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গসাহিত্য	আষাঢ়, ১৩২৪
বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ	শ্রাবণ, „
প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ	আশ্বিন, ১৩২৬
(১৩৫৫ আষাঢ় শনিবারের চিঠিতে পুনর্মুদ্রিত)	
মুসলমান আমলের ভারত শিল্প	কার্তিক, „
প্রতাপাদিত্যেব পতন	কার্তিক, ১৩২৭
(১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ শনিবারেব চিঠিতে পুনর্মুদ্রিত)	
বেতালের বৈঠক	বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩২৮
প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদরী	আষাঢ়, „
(১৩৫৫ আষাঢ় শনিবারের চিঠিতে পুনর্মুদ্রিত)	
বঙ্গের শেষ পাঠান বীর	অগ্রহায়ণ, „
আওরংজীব ও মন্দির ধ্বংস ঐতিহাসিক সত্য কি ?	আশ্বিন, „
বোকাইনগব কেল্লা ও উসমান	শ্রাবণ, „
কেজো রসায়নের ওয়ার্কসপ্	আশ্বিন, „
বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারদের পতন	ভাদ্র, ১৩২৯
বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী	ফাল্গুন, „
কুমার দারার বেদান্ত-চর্চা	বৈশাখ, ১৩৩৩
শিবাজীর কীর্তি	ফাল্গুন, ১৩৩৫
(পুনর্মুদ্রিত, আনন্দবাজার পত্রিকা, কংগ্রেস সংখ্যা, ১৩৩৫)	
মহারাষ্ট্র দেশ ও মারাঠা জাতি	চৈত্র, „
শিবাজীর অভ্যুদয়	বৈশাখ, ১৩৩৬
শিবাজী ও আফজল খাঁ	জ্যৈষ্ঠ, „
শিবাজী ও মুঘল-শক্তির সংঘর্ষ	আষাঢ়, „

শিবাজী ও আওরংজীব	শ্রাবণ, ১৩৩৬
চতুরে চতুরে-শিবাজী ও আওরংজীবের সাক্ষাৎ	ভাদ্র, „
শিবাজীর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন	আশ্বিন, „
শিবাজীর দক্ষিণ বিজয়	কার্তিক, „
পিতাপুত্রে	অগ্রহায়ণ ও পৌষ, „
আওরংজীবের জীবন-নাট্য	বৈশাখ, ১৩৩৭
নাদির শাহের অভ্যুদয়	শ্রাবণ, „
ভারতে মুসলমান	আশ্বিন, „
বঙ্গে বর্গী	চৈত্র, „
বর্গীর হাঙ্গামা	বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৩৮
মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস	ফাল্গুন, ১৩৩৯
মোহিনীমোহন চক্রবর্তী-স্মৃতি	পৌষ, ১৩৪৮
আকবরের আমল	চৈত্র, ১৩৫১
আর্যা নিবেদিতার নারী আদর্শ	মাঘ, ১৩৫২
গবেষণার প্রণালী	মাঘ, „
পত্রাবলী	ফাল্গুন-চৈত্র, „
স্বাধীনতার উষায় চিন্তা	আশ্বিন, ৩৫৪
দেশের ভবিষ্যৎ	আশ্বিন, ১৩৫৫
আমার জীবনের তন্ত্র	পৌষ, „
বঙ্গ সাহিত্যে ইতিহাসের সাধনা	চৈত্র, „
(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৫৫, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত)	
বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা	, ১৩৫৭
বাংলার সমাজ-জীবন সম্পদ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

বাঙালীর অগ্রগতির পথ	ভাদ্র, ১৩৬২
রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত	মাঘ, „
পদ্য আর গদ্য	চৈত্র, „
বুদ্ধের কীর্তি	আষাঢ়, ১৩৬৩

ভারতবর্ষ

উইলিয়ম আর্ভিন, আই. সি. এস্.	আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩২৩
পাটনার কথা	ফাল্গুন, „
বাঙ্গলার বেগম	ভাদ্র, ১৩২৪
রামমোহন রায়ের কীর্তি	অগ্রহায়ণ, ১৩২৬
মুঘল ভারতে ইতিহাসের লুপ্ত উপাদান	চৈত্র, „
অরাজক দিল্লী (১৭৯৯-৮৮)	বৈশাখ, ১৩২৮
আওরঙ্গজীবের সাতারা অবরোধ	আষাঢ়, ১৩২৯
শিবাজীর নৌবল এবং ইংরাজের সহিত ঘাত-প্রতিঘাত	কার্তিক, ১৩৩৬
বিদ্যাসাগর	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড) সমালোচনা	পৌষ, ১৩৩৯
নবীন বঙ্গের জীবন-প্রভাতের দৃশ্য	শ্রাবণ, ১৩৪০
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড) সমালোচনা	শ্রাবণ, „
জাতীয় নাটকের বিকাশ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১
বেকার	আষাঢ়, ১৩৪৪
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (৩য় খণ্ড) সমালোচনা	পৌষ, ১৩৪২

নবনূর

সাধু বচন	আষাঢ়, ১৩১২
একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর	মাঘ, „

প্রভাতী

ভারতী

ভারত মহিলা

মানসী ও মর্মবাণী

বঙ্গশ্রী

শিক্ষক

প্রাচী, শান্তিপুর

জগতে ভারতের দান — যদুনাথ সরকার সংগ্রহ, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

বাহিরের জগৎকে বাঙ্গলার দান — কার্তিক, ১৩৫৫

আনন্দবাজার পত্রিকা

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস — ২রা চৈত্র, ১৩৪২

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-বার্ষিকীতে সভাপতির ভাষণ — ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯

জাহ্নবী

রজনীকান্ত সেন — ভাদ্র, ১৩১৮

যুগান্তর

আমার জীবন দর্শন— — ২০শে মে, ১৯৫৮

ঊষা

খ্রীষ্টান সম্প্রদায় সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ — শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬০

দেশ

বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণীমন্দির — ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

মহারাজা দিব্য ও ভীম — ১ চৈত্র, „

শনিবারের চিঠি

বঙ্কিম প্রতিভা — আষাঢ় ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথের একটি দান — আশ্বিন, ১৩৩৮

ইতিহাস রচনার প্রণালী ও ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব — আশ্বিন, ১৩৫৫

ব্রজেন্দ্রনাথ — অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

মাসিক বসুমতী

বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ — আষাঢ়, ১৩৪৫

নূতন পত্রিকা

ইসলামীয় সভ্যতার স্বরূপ কি — ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৬

এডুকেশন গেজেট

বঙ্গের বাহিরে শক্তিপূজা — ৩০শে আশ্বিন, ১৩৪৩

উত্তরা

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে নবম (আগ্রা)
অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণ — চৈত্র, ১৩৩৭

কায়স্থ পত্রিকা

পঞ্চবিংশ-বার্ষিক বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার
সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ — ভাদ্র, ১৩৩৪

উদ্বোধনী ভাষণ — সুবর্ণ-জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৯

চন্দননগর সাহিত্য সম্মেলনের কার্যবিবরণ

চন্দননগর সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস শাখার
সভাপতির ভাষণ — আশ্বিন, ১৩৪৩

রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

মালদহ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ। — মাঘ, ১৩১৭

বেঙ্গল জার্নাল লিমিটেড

(রজত জয়ন্তী ; ভারত সাম্রাজ্যের ২৫ বৎসর ১৯১১-১৯৩৫) আধুনিক
ভারতে ইতিহাসের বিকাশ। — কলিকাতা, ১৯৩৫

অলকা

যুগধর্ম ও সাহিত্য — আশ্বিন, ১৩৪৫

বুলবুল

ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব — কার্তিক-পৌষ, ১৩৪১

শিবাজী ও জয়সিংহ | আশ্বিন ১৩৩৯
হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, ২য় খণ্ড (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) ১৩৩৯

বঙ্কিম প্রতিভা

বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ | আশ্বিন, ১৩৪৫

ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনের কার্যবিবরণ

মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ | ফাল্গুন, ১৩১৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ	১ম সংখ্যা, ১৩৪২
সভাপতির অভিভাষণ	„ „
মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী	২য় সংখ্যা, „
মারাঠা জাতির অভ্যুদয়	১ম সংখ্যা, ১৩৪৩
শিবাজী	„ „
শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা	„ „
মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ	„ ১৩৪৫
মুঘল ভারতের ইতিহাস	২য় সংখ্যা, „
মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ	„ ১৩৪৬
'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস	৪র্থ সংখ্যা, „
রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা	১ম সংখ্যা, ১৩৪৭
মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা	৪র্থ সংখ্যা, „
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২য় সংখ্যা, ১৩৪৯
দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি	৩য় সংখ্যা. ১৩৫০
নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ?	১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৩৫১
বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'	৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, „

সভাপতির অভিভাষণ ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৩৫২
মানপত্রের উত্তরে অভিভাষণ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫৫
বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণী-মন্দির ১ম সংখ্যা, ১৩৬৫
(৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪২ 'দেশ' হইতে পুনর্মুদ্রিত)

বাঁশরী

স্থরাটে ইংরাজ-কুঠির এক পুরাতন কাহিনী আশ্বিন, ১৩৩১
স্কুল-শিক্ষক ও জাতি গঠন মাঘ, ১৩৩৩

ইতিহাস

আওরঙ্গজীব-মুর্শিদকুলী পত্রালাপ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮
১৬৭৯ খ্রীঃ বাংলাদেশে পর্তুগীজ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ভাদ্র-কার্তিক, ১৩৫৯
এক শতাব্দীর ঐতিহাসিক চিত্রমালা : ১৭৫৭-১৮৫৭ জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৬১
ইসলামিক ইতিহাস চর্চায় নব-জাগরণ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

গ্রন্থ সমালোচনা (বাঙলা গ্রন্থ)

Manjari by Ramanimohan Ghosh—Modern Review May, 1908.

Asoka Anushasan, Text, Sanskrit and Bengali tr. by Charu Ch. Basu and Lalitmohan Kar—Modern Review, October, 1916.

Lal Kalo by Girindrasekhar Bose—Modern Review, October, 1930.

Kamrupa-Sasanavali by Padmanath Bhattacharya—Indian Historical Quarterly 1933

গ্রন্থসমালোচনা (বাঙলা গ্রন্থ)

Rabindra-Grantha Parichaya by Brajendranath Banerjee, 2nd edn.—Modern Review, March, 1944

Bangalir Saraswat Avadan, Part I—Modern Review, by Dinesh chandra Bhattacharya, July, 1952

Bangalir Itihas, vol. I by Rakhaldas Banerjee—Modern Review, June, 1915

রাজা বাদশা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রবাসী, ভাদ্র,	১৩২৮
রণডঙ্কা ,, ,,	,, অগ্রহায়ণ,	১৩২৯
দিল্লীশ্বরী ,, ,,	,, ভাদ্র,	১৩৩০
কেল্লা ফতে ,, ,,	,, পৌষ,	১৩৩১

ভূমিকা

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৩১৯
প্রতাপ সিংহ—সতীশচন্দ্র মিত্র	১৩৩৫
মোগলযুগে স্ত্রী শিক্ষা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩২৬
শিবাজী মহারাজ ,, ,,	১৩৩৫
জাহানআরা ,, ,,	১৩২৭
মোগল পাঠান ,, ,,	১৩৫৯
ওমর খৈয়াম—সুরেশচন্দ্র নন্দী	১৩৩৬
গুলবাহার—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯১৩
বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়	১৯৪৯
বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ—রেজাউল করিম	১৯৪৪
প্রাচীন কলিকাতা—হরিহর শেঠ	১৩৫৯

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ—সরলাবালা সরকার	১৩৬৩
ভগবৎ প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়—হরিশ্চন্দ্র সিংহ	১২৫৮
ভারতের মুক্তি সন্ধানী—যোগেশচন্দ্র বাগল	১৩৬৪
ছেলেদের বাবর—বাণী গুপ্ত	১৩৫২
আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ	১৩৪৫
সীতারাম (২য় সংস্করণ) ,, ,, ,, ,,	১৩৫২
দুর্গেশনন্দিনী ,, ,, ,, ,, ,,	১৩৪৫
দেবী চৌধুরাণী ,, ,, ,, ,, ,,	১৩৪৬
রাজসিংহ ,, ,, ,, ,, ,,	১৩৪৭

গ্রন্থপঞ্জী ও রচনাপঞ্জী

Books : English

1.	India of Aurangzib, Statistics, Topography and Roads	1901
2.	Economics of British India	1909
3.	History of Aurangzib, vol. I	1912
	vol. II	,,
	vol. III	1916
	vol. IV	1919
	vol. V	1924
4.	Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays	1912
5.	Ahkam-i-Alamgiri, Ist. edition	1915
6.	Ahkam-i-Alamgiri, 2nd. edition	1925
7.	Anecdotes of Aurangzib, 2nd. edition	,,

8. Studies in Mughal India, 2nd. edition 1919
(Historical essays with 12 new essays added to it)

9. Studies in Aurangzib's reign 1933

10. Chaitanya : His Pilgrimages and Teachings 1913

11. Chaitanya's Life and Teachings, 2nd. edition of (No. 10) Revised and enlarged 1922

12. Shivaji and His Times 1919

13. Shivaji—a study in leadership 1950

14. Mughal Administration 1920
,, ,, Combined Vol 1924

15. House of Shivaji 1940

16. Later Mughals (1707-1739) by William Irvine, Continued and edited by Jadunath Sarkar vols. I and II 1922

17. Fall of the Mughal Empire, vol. I 1932
vol. II 1934
vol. III 1938
vol. VI 1950

18. India through the Ages 1928

19. A Short History of Aurangzib 1930

20. History of Dasnami sect, vols. I and II —

21. Nadir Shah in India 1922

22. Military History of India (Posthumous) 1960

23. Bihar and Orissa during theFall of the Mughal Empire 1932

24. Maasir-i-Alamgiri (Eng translation by Jadunath Sarkar) 1947

25. Bengal Nawabs (English translations of three Histories written in Persian,– tr. by J N. Sarkar 1952

26. Nuskha-i-Dilkasha, Eng. tr. by J. N. Sarkar (Part II of Sir Jadunath Sarkar Birth Centenary Commemoration volume, Govt. of Maharashtra) 1972

27. A New History of the Indian People —General Editor 1946

28. History of Bengal, vol. II—Editor 1948

29. Ain-i-Akbari of Abul Fazl, vols. II and III tr. into English by Col. H. S. Jarrett, revised and annotated by Jadunath Sarkar vol. III 1948
vol. II 1949

30. Four Chapters written by J. N. Sarkar in vol. IV of the Cambridge History of India

31. Poona Residency Correspondence series, edited by Jadunath Sarkar vol I 1936
vol. VIII 1943
vol. XIV 1951

32. Persian Records of Maratha History, edited by Jadunath Sarkar, vol. I. Delhi Affairs ; 1761-88 (News letter from Parasnis Collection) tr. into English with notes by Jadunath Sarkar 1953
vol. II Sindhia as Regent of Delhi (1787 and 1788-91), tr. from the Persian with notes. 1954

33. Glimpses of Mughal Architecture text by S. K Saraswati, ed. by A. Goswami, introduction with historical analysis by Jadunath Sarkar 1953

34. Bubbles by Satishchandra Sinha with two articles on Compulsory Hindi by Jadunath Sarkar 1953.

35. Selections from Sarkar—Sardesai correspondence, 1907-56,ed. by H. R. Gupta in Sir Jadunath Sarkar Commemoration vol I. 1957

Hindi and Marathi

36. Aurangzib (in Hindi) Hindi Grantha Ratnakar, Bombay. 1951

37. Aurangazib Ke Upakhayana—Hindi rendering of english trans. of Ahkam-i Alamgiri by Bhudeva Sastri, Agra. 1967

38. History of Dasnami sect (Hindi)
K. P. Dube, Allahabad.

39. Mughal Sasan Paddhati (tr. into Hindi from 'Mughal Administration') by V. N. Caube, Agra. 1960

40. Sivaji (Hindi), Hindi Grantha Ratnakar, Bombay.

41. Yuga Yugina Bharata, Agra. (A Hindi translation from 'India through the Ages') 1938

42. Sivaji va Sivakala (in Marathi), Bombay. 1930

Articles, and Speeches in English

Modern Revew

Shivaji-Letters	January, 1907
Life of Shivaji	February-June, ,,
Jai Singh and Shivaji	July, ,,
Life of Shivaji	August-November, ,,
Guide to Indian Historical Literature	November, ,,
Shivaji-Letters	January, 1908
Utopia	February, ,,
A Muslim Heroine	April, ,,
Khuda Bakhsh, the Indian Bodley	September, ,,
Aurangzib's Daily life	October, ,,
Daily life of the Mughal Emperors	,, ,,
Baz Bahadur and Rupamati	January, 1909
Raj Narain Bose (1826-1899)	April, ,,
Anecdotes of Aurangzib	July-December, ,,
Legacy of Shivaji	January, 1910

History of Aurangzib	April and May, 1910
History of Aurangzib	August and September, ,,
Sakuntala : Its inner meaning	February, 1911
(The) Rise and Fall of the Sikh power	April, ,,
(The) Impact of Europe on India	May, July, ,,
Beauty and self-control	September ,,
History of Aurangzib	September-December, ,,
Victorious in defeat	December, ,,
History of Aurangzib	January-May, 1912
India's Epic	March, ,,
Women's Lot in East and West	June, ,,
(The) The Supreme Night	,, ,,
(The) Springhead of Indian civilisation	December, ,,
Adamant	,, ,,
Communal Life in India	June, 1913
My interpretation of Indian History,	August, September ,,
Kalidas the Moralist	October, ,,
William Irvine (I. C. S.)	January, 1914
Nemesis of Aurangzib	January, 1915
Education of the Mughal Prince	April, ,,
How Jai Singh defeated Shivaji	,, ,,
(The) Rajput struggle for Independence	,, ,,
Belgium, or, what 80 years of liberty can do	July, ,,

(An) Old Hindu Historian of Aurangzib	August, 1915
(The) Passing of Shah Jahan	October, ,,
Confessions of a history teacher	December, ,,
Zeb-un-Nissa's Love Affair	January, 1916
Satnamis and Sikhs : 17th Century	April, ,,
New lights on Maratha History	July, ,,
Address at the Behari Sutdents' Conference	December, ,,
Oriental Monarchies	March, 1917
(The) Vernacular Medium : Views of an old teacher,	January, 1918
New Light on Shivaji	March, ,,
(The) Rise of the Maratha Power	April, ,,
(The) Higher teaching of History in our College	July, ,,
(The) Downfall of Bijapur	October, ,,
(The) Last years and Death of Shivaji	November, ,,
Shivaji's Navy	December, ,,
(A) Great Historian (Hindu) in Persian	January, 1919
(The) Coronation of Shivaji	February, ,,
History of Shivaji 1667-1670	April, ,,
Lessons from the Career of Shivaji	June, ,,
History of Shivaji, 1671-1674	May, ,,
Art in Muslim India	October, ,,
Shivanath Shastri	November, ,,

University Problems cf to-day January, 1921
Delhi during the Anarchy, 1749-1788 February, „
Reply of University problems to-day : Comment by P. Mitra and further reply of Sir Jadunath Sarkar February, „
Industries of Mughal India 17th Century June, „
Lesson for to-day April, 1922
Present condition of the Calcutta University „ „
(The) Aristocracy in the Mughal Empire July, „
An Educational Programme for Bengal „ „
(The) Sovereign as the Head of religion in the Mughal Empire August, „
The Prerogatives of the Mughal Emperors September „
Criminal Law and Justice in the Mughal Empire October, „
State Industries in the Mughal Empire November, „
Help to Historic studies „ „
(A) Hero of old Maharastra December „
(The) Mughal-Maratha struggle for Madras January, 1923
University Reform February, „
(The) Famous Siege of Jinji „ „
Letters of Aurangzib March, „
'Protap' of Bengal „ „
(The) Panipat Cammpaign from the inside (a review) April, „

(A) Flower of Rajput Chivalry (Durgadas Rathor) July, 1923
Mughal-Maratha Struggle on the Bombay
Coast strip, August, ,,
(The) Crisis in Maratha National History November, ,,
(The) Breakin -·p of the Mughal Empire—Jats
and Gaurs, Cctober, ,,
New Light on Shivaji ,, ,,
Aurangzib's Favourite son January, 1924
Help to Historical Research February, ,,
Shivaji in the Madras Karnatak ,, ,,
(The) First Printed Life of Shivaji, 1633 May, ,,
Sources of the life of Shivaji ,, ,,
(The) Renaissance in India in the 19th Century June, ,,
Calcutta University Reform July, ,,
(The) Last King of the House of Shivaji October, ,,
Historical Records of Northern India 1700-1817 Feb , 1925
(The) Pitfalls of the Investigator of Indian History July, ,,
(The) Calcutta University and reform ,, ,,
On the death of Mr. C. R. Das ,, ,,
(The) Calcutta University to-day October, ,,
(The) Maratha Recovery After Panipat November, ,,
Indian Influence on the art of Indo-China 1926, v. 39, No.I
D. B. Parasnis June, 1926

Hindu Influence on further India	July, 1926
(A) Forgotten Aspect of the Mughal Empire	July-September, ,,
In memoriam : Surendranath Banerjee	December ,,
(The) Historian Rajwade	February, 1927
Kashinath Narayan Sane	May, ,,
Shivaji His genius, Environment and Achievement	,, ,,
V. Khare	July, ,,
Greater India	August, ,,
Bombay University Convocation address,	September, ,,
Calcutta University Special Convocation address	,, ,,
On the Indianisation of the intellect	November, ,,
Hermitages—the Springhead of Indian Civilization	September, 1928
Shahji Bhonsle in Mysore	July, 1929
Ruin of the Hindus of the Madras Karnatak,	August, ,,
(The) Indian Antigone	September, ,,
India's Military defence : What it implies,	October, ,,
(A) Page from Eerly Mysore History	November, ,,
(The) Rajputs in the Mughal Empire	January, 1930
(The) Noontide of Maratha Power	April, ,,
True Sources of Maratha History	March, ,,
Tagore's Ballads	April, 1931

North and South in Indo-Muslim Culture June, 1931
Emperor Muhammad Shah and his court, December, „
(The) Unity of India November, 1942
(The) Battle of Haldighat April, 1943
Swords against Cannon-Balls :
The battle of Patan, 1790 May, „
Unity in spite of diversity; an Indian problem solved, June, „
India's military decline in the 18th Century, Aug , Dec., „
Ramanand Chatterjee : India's
Ambassador to the Nations November, „
(The Battle of Merta, 1790 January, 1944
(The) Battle of Lakheri, 1793 February, „
Mahadji Sindhia's End March, „
Two Rajput-Feringi battles : Fathpur (1790)
and Malpura, 1800 July, „
(A) Twentieth Century Rishi (P. C. Roy) July, „
(A) New Source of Maratha History January, 1945
(The) Lakheri campaign of De Boigne : A New
Study February, „
(A) Scheme or a dream June, „
Battle of Panipat : The Victor's despatches May, 1946
Maratha History newly Presented December, „
Free Hindustan, Defence and Progress June, 1947

Free India September, 1947

(A) Corpus of original Sources of Later Bengal History ,, ,,

Plassey, 1757 January, 1948

From Asaf Jah I to Osman Ali, the Fate of Hyderabad, August, ,,

Brothers from over the river : The Refugee problem of India September, ,,

Our immediate future October, ,,

Eastern India under the Pala Kings December, ,,

University Reform February, 1949

(The) Raghubir Library September, ,,

(The) Progress of Historical Research in India, January. 1951

(An) Old Man's Last Hope August, ,,

How the British Lost India (our gains and losses from British rule) October, ,,

Must India disintegrate ? November, 1955

(A) Noble Life (Pramathanath Bose) January, 1956

(The) Birth of modernised economy in India September, ,,

(A) Chapter of my life : How my library grew up January, 1958

Bengal Past and Present

(A) Word to Research Workers in Indian History 1957, v 76

Alivardi Khan and Siraj-ud-daula, 1949, v. 68
Alivardi Khan as Nawab of Bengal 1948, v. 67
Alivardi Khan in Orissa and Bihar 1946, v. 66
East Bengal in 17∠8-29 1950, v. 69
Murshid Quli Khan 1946, v. 66
(A) Prisoner of Tipu Sultan 1935, v. 50
General De Boigne's First Wife ,, ,,
The Battle of Tukaroi, 3rd March, 1575 ,, ,,
French merceneries in the Jat campaign of 1775-76 1936, v. 51
Memoire of Monsieur Rene Madec ,, v. 52
Some French men in India ,, v. 51
Memoire of Rene Madec 1937, v. 53
(The) Mission of James Brown to the Delhi Court ,, v, 54
Memoire of Rene Madec 1938, v 55
Memoire of Rene Madec 1940, v. 58
(A) Proposal for a Subsidiary Alliance in Rajputana in 1794 1941, v. 60
Some European soldiers of fortune 1945, v. 65
Warren Hastings as seen by the Maratha Envoy 1953, v. 72
A century of Historic Prints January-June, 1954
(The) Jat Dynasty of Bharatpur July-December, 1955, 56

Hindustan Review

(The) Gifts of Aryans to India July, 1928

India through the ages : the History of Buddhism in India January-March, 1929

India through the ages : Islam in India April-June, ,,

India through the ages : What the British have done in India July, ,,

India through the ages : Indian Renaissance of the 19th Century August, ,,

Indo-Iranica

Address at the Al-Biruni Millenary Celebration organised by the Iran Society on March 19, 1952 under the presidentship of Dr. H. C. Mukherjee, Governor of West Bengal April, 1952

The Servant of India, Poona

Convocation address (Bombay University) 25th August, 1927

Presidency College, Centenary Volume

Inaugural address on the occasion of Presidency College Centenary Celebration, 1955

The Times of India, Bombay

India must create not merely import (Convocation address at the Bombay University), 18th August 1927,

Hindusthan Standard

What Maratha teaches 23rd May, 1925

Rabindranath and Sister Nivedita Puja Annual, 1941

Letter to and from Rajendra Prasad 9th February, ,,

Presidential address at the meeting of Singhee Park, Ballygunge for the creation of a New Bengal 2nd June, 1947

Social life in the Muslim age—Puja Annual, 1948

(The) Condition of Hindus under the Muslim rule— Puja Annual, 1950

How theocracy worked during the Muslim period— Puja Annual, 1951

Whether young India 25th November, ,,

The (Sikhs) in Indian History : Guardian of our frontier 9th December, ,,

Statues of Foreigners 21st ,, ,,

Rajasthan : the Land of Kings 3rd February 1952

(The) Dawn of Rajasthan 30th March, ,,

Al-Biruni 23rd ,, ,,

Janam Vaishaki—Baba Nanak's place in history 13th April, ,,

(The) Rani of Jhansi—Fight Against the British 15th June, ,,

How Geography dictates strategy 10th August, ,,

Elephantry 17the August, 1952

Alexander and Poros : Society, Government and army contrast 24th ,, ,,

Alexander's Battle with Poros : Strategy and tactics 31st ,, ,,

Foot prints of Vivekananda 7th January, 1953

Compulsory Hindi for all India : Can it work ?

Babel of Tongues What remedy ? 15th ,, ,,

Compulsory Hindi Its effect on education 1st February, ,,

Why linguistic Provinces ? 22nd ,, ,,

Future of our Vernaculars 17th May, ,,

Presenting Christianity to India 7th June, ,,

1947-53 : Debit and Credit 15th August, ,,

(The) Future of Sanskrit studies 23rd ,, ,,

Sister Nivedita as I knew her Puja Annual, ,,

Future of our middle class ,, ,,

(The) Place of N. C. C. in our national life 20th December, ,,

Congress : Look within January, 1954

University Centenary thoughts 24th ,, ,,

Pak American Pact 26th ,, ,,

Battle between Alexandar and Poros new interpretation of records, 21st February, ,,

Political and Social Change of Rajputs—their character
28th February, 1954

Islamic invasions—Turks and their wars 7th March, ,,
Shihabuddin Ghori-vs-Prithiraj 14th March, ,,
Timur's invasion, 1398—Military organisation of
Turks 21st March, ,,

Babur's invasion First Panipat (battle), 1526 28th ,, ,,
(A) Century of Historic Prints 30th ,, ,,
Babur and Rana Sangah 1527, 4th April, ,,
Humayun-vs.-Sher Shah (1539-40) 11th ,, ,,
Second battle of Panipat, 1556 18th ,, ,,
Mughal Conquest of Bengal : The battle of
Tukaroi. 1575 25th ,, ,,

Battle of Haldighat, 1576 2nd May, ,,
(The) Last Mughal Pathan battle, Daulambapur
1612 9th ,, ,,

Hindu unity—a dream ? 8th August, ,,
Homage to France 22nd ,, ,,
Two Sisters Puja Annual, ,,
Our debt to Scottish teachers 2nd December, ,,
N. C. C. as the nursery of patriotism 7th ,, ,,
Woman's status in Hinduism 23rd ,, ,,

Fall of the Vijaynagar Empire—the battle of Talikata (January 5, 1565) 6th March 1955

Battle of Bhatvadi, October, 1624 — 13th " "

Army of the Mughal Emperors : Organisation, 20th " "

War for the Delhi throne (1658-59) — 27th " "

War of Succession after Aurangzib ; the battle of Jajau — 3rd April, "

Maratha System of war — 10th " "

Nizam's great battles, 1720-24 — 17th " "

Nizam's great battles—Balapur, 1720 — 24th " "

Peshwa Baji Rao I—the Palkhed Campaign (1727-28) — 1st May, "

Nadir Shah's invasion—Persians and Indians contrasted, — 8th May, "

Battle of Karnal (February 13, 1739) — 15th " "

Alivardi Khan fights Pathans at Kali Diara, 1748, — 22nd " "

Light on Goa — 15th August, "

Playing with fire — 21st " "

Function of Hindi — 4th September, "

What is Goa to India — 9th October, "

Rabindranath Tagore : an analysis — Puja Annual, "

Goa an American example of Cuba — 26th January, 1956

Looking back a hundred years ago — Puja Annual, 1956

After Nehru ? — 26th January, 1957

Kashmir under Islamic theocratic rule—

a picture from history — 17th March, „

Our present discontents — Puja Annual, „

Suhridh

Fall of Tipu Sultan — 1301 B. S., v. I

New Leaven in Bengal — „ „

Sardesai Commemoration Volume 1938

Mahadji Sindhia's Lalsot Conpaign 1787

(The) Earliest persian Accounts of Panipat, 1761

Govind Sakharam Sardesai

Bharat Itihasa Samshodhaka Mandal Qurterly 1928

Life of Shivaji (Tr. from the French of Abbe Carre)

Statesman

(The) Durga Puja in the Villages of old — 16th Septr., 1952

Bengal Historical Records (Letter to the Editor, Statesman, Calcutta) [Source : Jadunath Sarkar Collection, National Library, Calcutta.]

British Monarch in Indian History — 31st May, 1953

Seed and Fruits of Plassey — 2nd May, 1954

Berhampur Krishnanath College Centenary Commemoration Volume : 1853-1953—old Murshidabad

Science and Culture, September 1941—Secondary Education in Bengal.

Journal of the Hyderabad Archaeological (Society)

(The) Last Siege and Capture of Golkonda, 1687, January, 1918

Letter to the Secretary to the Hyderabad Archaeological Society regarding the date of Abdullah Qutb Shah's death 1917, no. 3 ; 1918, no. 4

(The) Second Capture of Hyderabad by the Mughals and the commencement of the siege of Golkanda January, 1917

Portuguese-Maratha war, 1683-84 1919-20, no. 5

Journal of Indian History

(The) Early Life of Bahadur Shah I 1922-23, v. 2, no.3

(The) History of the Madras Coast, 1680-1690 1924, v.3, pt. I

Baharistan ,, ,,

Source : Jadunath Sarkar Collection, National Library, Calcutta

The History of the leading nobles of the kingdom of Bijapur, 1627-87

(A) Hindu traveller in Southern India, 16?5 A. D.

Presidential address at the inaugural session of the Indian Academy of the History, Benares, 30th December 1937

Indian Historical Quarterly

Last Campaign of Shivaji December, 1928
(An) Early Supporter of Shivaji June, 1931
Malik Ambar : A New Life September, 1933
(The) Rise of Najib-ud-Daulah December, ,,
Panipat, 1761 June, 1934
Events leading upto the battle of Panipat, 1761 Sept., 1935
Zabita Khan, the Ruhela-chieftain December, ,,

Amrita Bazar Patrika, Calcutta

Special Convocation address of the Calcutta University
28th August, 1927
Presidential address at the meeting of Singhee Park
Ballygunge, for the creation of a New Bengal 2nd June, 1947
Peasants' rise in Bengal : Sisirkumar's brave fight 2nd May,
1947

Members' Bulletin of Dehra Dun Rotary club, 1942

Speech at the Rotary club of Dehra Dun on Unity of India
16th September, 1942

Prabuddha Bharat

Aryans and their gifts May, 1928
Buddhism and what it did for India June, ,,
(The) History of Buddhism in India July, ,,
Islam in India August, ,,

Indian Renaissance of thc 19th ccntury October, ,,

Sri Ramakrishna February, 1936

Reminiscences of Sister Nivedita Janurary, 1943

Vivekananda's work September, 1943

Source : Jadunath Sarkar Collection, National Library, Calcutta

Dacca University Convocation address 29th July, 1936

(A) Sythsis of Deccan Culture (Radio Talk) Ist October, 1938

Expansion of the Maratha Power (Radio Talk, Bombay) 5th December, 1940

"We must not neglect Tradition of Tansen"—
Address at the 12th Session of the All Bengal Music
Conference at Sree Cinema (in Amrita Bazar Patrika)

Indian Review

Economic India in the Golden days of Shah Jahan April, 1924

Utterances of the day August, 1927

(The) Unity of India December, 1942

The Muslim Review

(A) Forgotten Aspect of the Mughal Empire July-Sept. 1926

Islamic Culture

Ahmad Shah Abdali in India, 1748 : Rise of Independent Dynasties in the Provinces April, 1932

(The) Mughal-Maratha Contest for Malwa, 1728-1741 October, ,,

General Raymond of the Nizam's army January, 1933

Najib-ud-Daulah as the dictator of Delhi 1761-1770 October, 1933

An original Account of Ahmad Shah Durrani's ,, ,,

Campaigns in India and the battle of Panipat July, ,,

Life of Najib-ud-Daulah April, 1934

Hyderabad and Golkanda in 1750, as seen through French eyes April, 1936

Salabat Jang's First war with the Peshwa April, 1937

(The) Delhi Empire a Century after Bernier July, ,,

Old Hyderabad October, ,,

Haidar Ali's Invasion of the Eastern Carnatic, 1780 April, 1941

Two Historical Letters of the Great Asaf Jah I July, ,,

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal

Shaista Khan in Bengal (1664-66) JL, NS, II, 1906

(The) Revenue Regulations of Aurangzib (with the Persian texts of two unique farmans from a Berlin Mss.) JL, NS, 1906

The Feringi Pirates of Chatgaon, 1665 A.D JL, NS. III 1907
(The) Conquest of Chatgaon, 1666 A. D. JL, NS. III, ,,
(A) Corpus of Original Sources of Later Bengal History
JL, NS. 38 ; XIII (L) 1947
(The) European military system in India
during the Mughal times, Introducing India, Pt. II, 1949

Journal of the Bihar and Orissa Research Socity

Assam and the Ahoms in 1660A. D 1915, V. I. Pt. 2
(The) History of Orissa in the 17th century June 1916
(The) History of Orissa in the 17th century September, ,,
Report of the . ihar and Orissa coin committee for the
period ending 31st December, 1916--March, 1917
Shivaji and the English in Western India December, 1918
Shivaji in South Konkan and Kanara March, 1919
Travels in Bihar, 1608 A.D 1919, V. 5, pt. 4
(The) Topography of Garhgaon and its environs In 1662-63
A. D., December, 1919
(The) History of Orissa in the 17th century March, 1921
(A) New History of Bengal in Jahangir's time ,, ,,
(The) Last campaign of Aurangzib, 1705—1923, V.9, pts. 3-4
Prince Muhammad Azam Shah, 1653-1707—March-June, 1924
Sources of the History of Shivaji critically examined— ,, ,,

(A) Contemporary picture of the Mughal court in 1743 A. D.
December, 1931

(A) Correct Chronology of the Delhi History—March, 1932

Rajputana the death of the old order at the end of the 18th century March-June, 1948

The East Bengal Times, Dacca, 1939 1 th January

"Bengal Through the Ages"—Address at the Dacca University Historical Association

Calcutta Municipal Gazette

Old Calcutta reveals herself—13th Anniversary Number,
27th November, 1937

City Administration under the Mogul Emperors of India
17th Anniversary Number, 6th December, 1941

Indian Research Institute. (945)

Despatches and Reports in Indian History (In B. C. Law Commemoration volume, pt I ; ed., by D. R. Bhandarkar and others, Calcutta.)

Calcutta University Magazine

Essay-Writing April and September, 1898

Glimpses of the Hindoo College July, 1901

Jayaji Pratap

Rajputs and Marathas, a Historical Study 25th Feb. 1941

Journal of the University of Bombay

Sources of Maratha History July, ,,

Birla Park Annual, Calcutta

The Unity of Hindu India vol I, no. I, 1928

Jawharlal Nehru Birthday book, 1949

Condition of Kashmiri people under Muslim rule.

Calcutta Police Journal

(The) Police in the Mughal Empire 1953, v. I, no. 3

The Cambridge History of India

Aurangzib (1658-81) : v. 4., Ch. viii., ch x. ch. xi. ch. xiii., 1937

The Proceedings of the Indian Historical Records Commission

(A) Note on the Methods by which officers in charge of Records may best encourage research, 1920, v. 2, Appendix. B.

(The) Missing Links in the History of Mughal India from 1658-1761 1920, v. 2

Report on the Tod Manuscripts relating to the Pindaries in Rajputana 1920, v. 2, Appandix C.

Delhi during the Anarchy, 1749-1788, as told in contemporary records 1921, v. 3

Aurangzibs siege of Satara 1922, v. 4

(The) Affairs of the English Factory at Surat (1694-1700) 1923, v. 5

Shivaji in the Madras Karnatak 1924, v. 6

Historical Records relating to Northern India, 1700-1817 1925, v. 7

Maratha Family Records of the 17th century 1926, v. 9

(The) English Residents with Mahadji Sindhia 1928, v. 11

At Indian Historical Records Commission, Nagpur ,, ,,

(The) House of Jaipur ,, v. 12

At Indian Historical Records Commission Patna 1930, v. 13

At Indian Historical Records Commission Lahore 1937, v. 14

(The) Mission of James Browne to the Delhi Court 1783-1785 ,, ,,

General De. Baigne in India 1938, v. 15

(A) Proposal for a Subsidiary Alliance in Rajputana 1939, v. 16

Presidential address at Indian Historical Records Commission, Calcutta ,, ,,

De Boigne 1940, v. 17

At Indian Historical Records Commission Baroda ,, ,,

Unpublished Articles in English

1. Baroda State.

2. (The) Feast of Lamps : Its Spirit.
3. Hindus and Muslims living together in India.
4. Shivaji's Conquest of Eastern Karnatak.

(দ্রঃ স্যার যদুনাথ রচনাপঞ্জী, ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি পৃ. ১০১)

Book Reviews (English) in Modern Review

The Gujrat Prince (a new drama) by N V.Rajan July, 1906

(The) Private Journal of the Marques of Hastings reprinted, Allahabad (Panini office) August, 1907

(A) History of India by Mahamahopadhaya Haraprasad Shastri (1907) ,, ,,

Cradle-tales of Hinduism by Sister Nivedita April, 1908

(The) General History of the Mogol Empire from the Memoirs of Manouchi, Bangabasi office, Calcutta ,, ,,

In the Service of the Motherland by Sewaram Singh, Thappar (Rawalpindi, 1908) ,, ,,

(An) Address in memory of Albert Cormpton by Sydney style July, 1909

Folk Tales of Hindustan by Shaikh Chilli, February, ,,

Lessons from the Koran by Abul Fazal ,, ,,

Life of RamTonoo Lahiri by R.N.Dey March, ,,

(An) Indian Study of love and death by Sister Nivedita April, ,,

Mrs. Annie Besant (Nateson) ,, ,,

(The) Edicts of Asoka, Eng. tr. by V.A.Smith July, 1909
Messages of uplift for India by Saint Nihal Singh ,, ,,
(A) Narrative of Indian history for High Schools' by F. C. Allen July, ,,
Comment and Criticism by Pol. on the review of Messages of uplift for India by Saint Nihal Singh August, ,,
Answer of Jadunath Sarkar on the Comment and Criticism of Messages of uplift for India September, ,,
(The) Paramaras of Dhara and Malwa by Captain C.E. Luard and Kashinath Krishna Lele February, 1910
Echoes from old Dacca by Syed Hassain ,, ,,
The Triumph of Valmiki tr. into English from The Bengali of Haraprasad Shastri by R.R. Sen ,, ,,
My Father : His life and reminiscences by S. Khuda Bukhsh ,, ,,
(A) Life of Anand Mohan Bose by Hemchandra Sarkar, March, ,,
(A) Note on the Antiquity of the Ramayana by Nabin Chardra Das, September, ,,
(A) Note on the Ancient Geography of Asia, Compiled from Valmiki-Ramayana by Nabin Ch. Das, Sept., ,,
Agra in pictures by Satya Chandra Mukherji, May, 1911

Suvarnamala May and November, 1911

Ancient India by S. Krishnaswami Aiyanger, April, 1912

The Compass of Truth, being an English rendering of Dara Shukoh's 'Risala-i-Haqnuma by R.B. Srish Chandra Vasu, February, 1913

(The) Holy City (Banares) by Rajani Ranjan Sen ,, ,,

(The) Fall of the Mogul Empire by Sidney J. Owen ,, ,,

Smiling Benares Published by K. S. Muthiah & co, March, ,,

Burning and Melting (Suz-u-Gudaz), an Eng. tr. by Mirza Y. Dawud ed. by Dr. A.K. Coomerswamy ,, ,,

The Prithviraj Vijaya by Har Bilas Sarda, September, ,,

(The) Diwan of Zeb-un-nissa (Wisdom of the East Series) September ,,

(A) Pepys of Mogul India, 1653-1708, an abridged edition of W. Irvine's tr. of 'Storia do Mogor', January, 1914

Indian Historical Studies by H.G.Rawlinson February, ,,

(A) History of India for High Schools and Colleges by E.W.Thompson (5th edn.) ,, ,,

History of Jessore-Khulna, Vol. I. by Satish Chandra Mitra June, 1915

Sadhana, the Realisation of life, by Rabindranath Tagore July, ,,

Foot falls of Indian History by Sister Nivedita July, 1915
Chitra, a play in one act, by Rabindranath Tagore Oct, ,,
(The) History of the reign of Shah Alam, by W.
Francklin ,, ,,
Readable Dictionary of Phrases, Idioms and
Colloquialisms etc., by Babu Lal Sud ,, ,,
Readings from Indian History, by E. R. Sykes, pt. I. form
the Vedic Times to the death of Aurangzib, September, 1916
Begams of Bengal, tr. from the Bengali of Brajendra
Nath Banerjee ,, ,,
Laili and Majnun tr. from the Persian of Nizami, by
James Atkinson ,, ,,
Shivaji the Maratha : his life and time by H. G.
Rawlinson October, ,,
Keigwin's Rebellion, 1683-84 ,, ,,
Tulsemmah and Nagaya or folk stories from India by
M. N. Venkataswami ,, 1918
(The) Home and the World, by Rabindranath
Tagore, tr. into English November, ,,
Heeramma and Venkataswami on folktales from India,
by M. N. Venkataswami ,, 1923
(The) Rise of the Imams of Sanaa by A. S. Tritton
February, 1926

(A) History of the Indian wars, by Clement Downing February, 1926

(A) Calendar of the court Minutes etc. of the E. I. Co, 1664-67 „ „

(The) Supplement to the Mirat-i-Ahmadi ; tr. by Sayayid Nawab Ali and C. N. Seddon March, „

Scenes and Characters from Indian History, as described in the works of some Old Masters, ed. by C. H. Payne „ „

Shivaji's Birthday Celebrations „ „

Roman Education from Cicero to Quintilian, by Aubrey Gwynn May, „

Journal of Francis Buchanan (Patna and Gaya district, 1811) ed. by V. H. Jackson „ „

Hindu-Pad-Padashahi or a Review of the Hindu Empire of Maharastra, by V. D. Savarkar „ „

Rajah Rammohun Roy's Mission to England, by Brajendranath Banerji July, „

(The) History of Education in India, part I, Aryan Period by V. P. Bokil „ „

Problems of Primary Education in India, by S. C. Basu „ „

Inland transport and Communication in Mediaeval India by BejoyKumar Sarkar „ „

Dawn of New India, by Brajendranath Banerji, October, 1927

Empire of the Great Mogol tr. from the Latin of De
Laet by Prof. J. S. Hoyland September, 1928

Early English intercourse with Burma (1587-1743),
by Prof. D. G. E. Hall April, 1929

British Expansion in Tibet, by Taraknath Das May, „

Malabar and the Portuguese (1500-1563), by K. M.
Panikkar January, 1930

History of Mughal North-East-Frontier Policy, by
Sudhindranath Bhattacharya „ „

Contributions to the History of the Hindu Revenue
System, by Dr. U. N. Ghoshal April, „

Answer by Prof. Jadunath Sarkar on the Comment
and criticism, by Sudhidranath Bhattacharya
(Author) on the review of his book History of Mughal
North-East Frontier Policy. „ „

(An) Accout of the district of Purnea in 1809-10, by
Francis Buchanan May, „

Hymns of the Alvars, by J. S. M. Hooper September, „

(The) Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna,
by Muhammad Nazim June, 1931

(The) History of Jahangir, by Francis Gladwin ed. by
K. V. R. Aiyangar July, „

Gulab Singh, by K. M. Panikkar July, 1931

Folk stories of the land of India by M. N. Venkataswami August, ,,

My life, (the autobiography of Nawab Server-ul-Mulk Bahadur) tr. by his son Nawab J. Y. Jung Bahadur January, 1932

(The) Building of the Jammu and Kashmir State, by Arjun Nath Sapru ,, ,,

Chow-Chow by Lady Falkland, ed. by H. G. Rawlinson ,, ,,

Beginnings of Modern Education in Bengal women's Education, by Jogeshchandra Bagal January, 1945

Ranjit Singh, by N. K. Sinha (2nd edn.) August, ,,

Twilight of the Mughals : Studies in Late Mughal Delhi, by P. Spear May, 1948

(The) English Factories in India, 1670-77 (New Series), Vol. I (Bombay), Vol. II (East coast and Bengal) : eb. by Sir C. Fawcett June, ,,

Haidar Ali, by N. K. Sinha (2nd-edn.) April, 1949

(The) Dutch in Bengal and Bihar, (1740-1825) by Kali Kinkar Datta August, ,,

(The) French in India ; First establishment and Struggle, by S. P. Sen ,, ,,

A Survey of the Rise of the Dutch Power in Malabar (1603-78) by T J. Poonen July, 1952

Fort William-India House Correspondence (Public series, V. 5 : 1767-69) ed. by N. K. Sinha August, 1952

The After math : 1818-1826 by R. D. Chokey, September ,,

Selections from the Nagpur Residency Records Vol. I. : 1799-1806, ed. by H. N. Sinha October ,,

News-letters of the Mughal Courts : (1751-52 A. D.) ed. by Prof. B. D. Verma November ,,

The Sultanate of Delhi by A.L. Srivastav 2nd ed., June, 1954

Indian art of war, by Major Alfred Devid ,, ,,

(The) Rehla of Ibn Batuta : India, Maldive and Ceylon Eng. tr. by Mahdi Husain July, ,,

Midnapur Salt papers : ed ; by N. K. Sinha March, 1955

Forewards or Introductions to English Books

History of the Jats by K. R. Qanungo 1925

Begam Samru by Brajendranath Banerji ,,

Mirat-i-Ahmadi : ed. by S. Nawab Ali 1927

Tarikh-i-Mubarak shahi, Eng. tr. by K. K. Basu 1932

(The) First two Nawabs of Oudh by A. L. Srivastav 1933

Malik Ambar by Jogindranath Chowdhuri 1934

Malwa in Transition by Raghubir Sinh 1936

Tarikh-i-Badshah Begam tr. by Md. Taqi Ahmed 1938

(A) Bibliography of Mughal India (1526-1707 A. D.)
by Sri Ram Sharma 1939

History of the Sikhs, 1739-1768 by Hariram Gupta ,,

History of Mediaeval Vaishnavism in Orissa
Probhat Mukherjee 1940

Begams of Bengal by Brajendranath Banerjee 1942

Two new Pala records by Manoranjan Gupta (Note
by Jadunath Sarkar at the top of the cover)

Peshwa Baji Rao I and Maratha Expansion
by V. G. Dighe 1944

A New History of the Indan people vol.6,
General Editor, Jadunath Sarkar 1946

Humayun in Persia by Sukumar Ray 1948

(A) Hand-list of important historical manuscripts in the
Raghubir Library, Sitamau, Malwa by Raghubir Sinh 1949

The Life of Mir Jumla by Jagadish Narayan Sarkar 1951

Women's Education in Eastern India by Jogesh
Chandra Bagal 1952

Peasant Revolution in Bengal by Jogesh Ch. Bagal 1953

Glimpses of Mughal Architecture by
Amarendra Goswami ,,

History and administration of the N. W. Provinces,
1803-1858 by Dharma Bhanu 1956

প্রবন্ধ (হিন্দীতে)—'বিশাল ভারতে'

Shibajiki Samudrik Sakti	June, 1921
Shibajika Pradurbhav	July, ,,
Shibaji Aur Aurangzebki Mulakat	December, 1930
Shibajiki Swadhin Rajya Sthapana	February, 1931
Shibajika Rajyabhishek	March, ,,
Chatrapati Shibajiki Dakhin Vijaya	April, ,,
Shibajika Jiwan Sandhya	July, ,,
Bharat Me Musalman	August, ,,
Kanara Me Maratha Prabhab	September, ,,
Shibajika Dakhin Maharastra Mem prabesh	,, ,,
Shibajika Rajya Aur Sashan Pranali	October, ,,
Shibajike Guru Aur Unko Paribar	March, 1932
Itihasmem Shibajika Sthan	April, ,,
Bharat Ki Ekata	December, 1942
Mera Bachpan	June, 1952

মারাঠীতে প্রবন্ধ

Maharashtratil Aitihasik Udhar Karya—
(in Marashtra Sharada) April, 1936

Shri Shiva Charitramchen Rahasya—(Ratnakar, p.314-16

গ্রন্থ সমালোচনা (হিন্দী গ্রন্থ) মডার্ণ রিভিয়ুতে

Bharatbarsh Ka Itihas by Prof. Ramdevji May, 1911

Hindu Navaratna by Pandits Ganesh Vihari, Shyam
Vihari and Shukdev Vihari Misra — March, 1912

Gitanjali by Rabindranath Tagore (Bengali text in Nagri Character) — „ 1915

Rajputana Ka Itihas, tisra Khand by Mahamaho padhyaya Gaurishankar Hirachand Ojha — June, 1931

গ্রন্থ সমালোচনা (মারাঠী গ্রন্থ) মডার্ণ রিভিয়ুতে

Life of Shivaji the great by Malhary R. Chitnis ed.
by Kashinath Narayan Sane — February, 1926

Shiva-Samsmriti ed. by G. S. Sardesai — June, 1927

PrataPgadchen Yuddha by Captain G. V. Modak — September, 1928

Aitihasik Patren yadi Wagaira: Lekh 2nd edn ed.

Udgir Campaign (Poona Daftar Records) — „ 1930

by G.S. Sardesai, Y.M. Kale and V. S, Wakaskar — November, „

Shinde Shahi Itihasachin Sadhanen vol.I, Kota gulgule Daftar)ed. by A. Rao Bhao Phalke — November, „

Records of the Peshwa Daftar, No 2.Panipat Prakaran, 1747-61 — January, 1931

Selections from the Peshwa Daftar, No 3,4,5,6 — April, „

Selections from the Peshwa Daftay,Nos.7,8,9 — June, „

Selections from the Peshwa Daftar, Nos.10,11,12 July, 1931

Shivachhatrapatichi 91 Qalmi Bakhar ed., by V. S. Wakaskar, ,, ,,

Selections from the Peshwa Daftar, Nos.13.14,15,August, ,,

Selections from the Peshwa Daftar,Nos.16,17 December, ,,

Selections from the Peshwa Daftar,Nos.18,19 January, 1932

Rajdhani Raygad by V. V. Goshi February, ,,

Ujjayini Margadarashika by Keshav-Rao Balawant Dongre March, ,,

গ্রন্থ সমালোচনা-ফার্সী পুস্তক-মডার্ণ রিভিয়ুতে

Khulasat-ut-Tawarikh by S. Rai Bhandari of Batala, ed. by Maulavi Zafar Hassan February, 1920

Zafar-Nama-i-Ranjit Singh by Diwan Amarnath ed. by Sitaram Kohli June, 1930

Mirat-i-Ahmadi Pers. text ed. by Sayyid Nawab Ali, ,, 1931

উর্দু

Tarikh-i-jadid-i-Subah-e-Udissa wa Bihar- Modern Review, October, 1915

পর্তুগীজ

Ethnografia da India Portuguesa by A. B. De Braganea Pereira, vol. I, Modern Review, May, 1925

(A) India Contemporanea by Sanatana Rodrigues, July, 1926
Portugueses E. Maratas : I Shivaji by Pissurlencar, „ 1929

ভূমিকা—মারাঠী গ্রন্থ

Aitihasik Patren Yadi Wagaira : Lekh, 2nd edn. ed. by
G. S. Sardesai, Y. M. Kale and V. S. Wakaskar, 1930
Shindeshaichin Rajkaranen vol.I (Satara) 1934
Historical papers relating to Mahadji Sindhia ed.
by G. S. Sardesai 1937
Shindeshaichin Rajkarnen vol. II (Satara) 1940
Aitihasik Lekhmala (1777-93) vol.II ed.by G.S. Sardesai „
Marathi Riyasat (vol.5, Baji Rao) ed.by Do 1942
Sardar Sakharam Hari Gupte by Y. R. Gupte 1945
Paramanand Kavya ed. by G. S. Sardesai 1952

ভূমিকা—হিন্দী গ্রন্থ

Malwa me jugantar ya arajakata Purna Satabdi by
Raghubir Sinh 1938

ভূমিকা—ফার্সী গ্রন্থ

Mirat-i-Ahmadi, ed. by S. Nawab Ali 1927

ভূমিকা—নেপালী গ্রন্থ

Surya Vikram Gewali Amar Singh Thapa 1947

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১২১

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

ও

সরলাবালা সরকার

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
সরলাবালা সরকার

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা— ৭০০০০৬

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

(১৮৭৩-১৯৬০)

বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এই পরিবারের পুত্রদের ন্যায় কন্যারাও এই ভূমিকার দায়িত্ব প্রায় সমভাবে পালন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী ছিলেন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম একুশ জন ছাত্রীর অন্যতম। দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যের জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম। এই পরিবারের কন্যা ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণীও বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিতা নহেন। বিশেষতঃ সংগীতসাহিত্যে তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র কন্যা ইন্দিরা দেবীর জন্ম হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর, ১৫ই পৌষ ১২৮০ বঙ্গাব্দে। তাঁহার জন্মস্থান বাঙলা দেশ হইতে বহুদূরে বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুরের অন্তর্গত কালাদ্‌গিতে। পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের প্রথম সিভিলিয়ান, এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে কর্মরত ছিলেন। মাতা জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ। একমাত্র ভ্রাতা স্বনামখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিক্ষাজীবন

ইন্দিরা দেবীর বাল্যশিক্ষা স্বদেশের মাটিতে আরম্ভ হয় নাই। তাঁহার প্রায় পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সহিত সুদূর লণ্ডনে যান

করেন (১৮৭৮ খ্রী) এবং লণ্ডন হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী সাসেক্স জেলার ব্রাইটন শহরে বসবাস করিতে থাকেন। বিদেশে দুই বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত করিয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সকলের সহিত তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদেশে বাসকালে কোনো বিদ্যালয়ে অনুপ্রবিষ্ট না হইলেও মাতা, পিতা এবং খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের (ইনি এই সময়ে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বিলাতে গমন করিয়াছিলেন) নিকট জ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ের সহিত শৈশবেই পরিচিত হন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার বয়স ছিল সাত বৎসর। তিনি প্রথমে সিমলার অকল্যাণ্ড হাউসে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পর বৎসর কলিকাতায় আগমনের পর কলিকাতার লরেটো কন্‌ভেণ্ট স্কুলে ভর্তি হন। ছয় বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি এখান হইতে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লরেটো বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন-প্রাপ্ত ছিল না বলিয়া ইহার পাঠ্যক্রম ভিন্নতর ছিল। একারণে তিনি অঙ্ক বিষয়ে একেবারেই দক্ষতা অর্জন করিতে পারেন নাই। অবশ্য ফরাসী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তর জীবনে এই ভাষায় প্রভূত অধিকার অর্জন করেন। প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ের পাঠের এখানেই সমাপ্তি।

ইহার পর ইন্দিরা দেবী গৃহেই পড়াশুনা করিতে থাকেন। গৃহশিক্ষক ব্যতীত কাব অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও তাঁহাকে পড়াশুনায় সাহায্য করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বহিরাগত ছাত্রী হিসাবে ইন্দিরা দেবী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পরীক্ষায় তাঁহার অতিরিক্ত পাঠ্য বিষয় ছিল ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য। ফরাসী ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি লা মার্টিনিয়ার বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষয়িত্রীর নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন।[১]

---

১. ইন্দিরা দেবীর পিতা সত্যেন্দ্রনাথ এবং খুল্লতাত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উভয়েই উৎকৃষ্ট ফরাসী জানিতেন। রবীন্দ্রনাথও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ফরাসী ভাষা শিক্ষায় যথোচিত উৎসাহ দিতেন। এ বিষয়ে ইন্দিরা দেবী স্বয়ং লিখিয়াছেন, 'আমি লরেটো ইস্কুলে ফরাসি শিখতুম বলে একবার

ইংরাজী ভাষাতেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি ইংরাজী পত্রে সর্বাধিক নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত বৎসরের সকল মহিলা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত পদ্মাবতী পদক লাভ করেন।

সংগীত শিক্ষা

সংস্কৃতিবান্ পরিবারের কন্যা ইন্দিরা দেবীর সংগীত-বিষয়ে একপ্রকার সহজাত অধিকার ছিল। কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয় ধারার সংগীতেই তাঁহার আগ্রহ ছিল সমান। তাঁহার সপ্তম বর্ষে ইন্দিরা দেবী সিমলায় অবস্থান কালে ব্রাহ্মনেতা ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের গানটি শুনাইয়াছিলেন। উত্তরকালে এই বালিকাই 'রবীন্দ্র সংগীতের অছি' হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্বেও বিদেশী সংগীতের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল অতি শৈশবেই।[২] তিনি পরবর্তীকালে লিখিয়াছেন—

> 'আমার বিলিতি সংগীত-প্রীতি অবশ্য লরেটো কন্‌ভেণ্টের শিক্ষা-জনিত। সেখানে সেণ্ট্ পল্‌স্ ক্যাথিড্রালের অর্গানিস্ট মিঃ স্লেটারের কাছে পিয়ানো, এবং মান্‌জাটো নামক এক ইতালীয় বেহালা-শিক্ষকের কাছে

আমার জন্মদিনে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিখ্যাত ফরাসি কবি কপে, মোরিমে, ল্যা ফঁৎদ্‌লীন, লা ফঁতেন প্রভৃতির রচনাবলী সুন্দর করে বাঁধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম ও আমার নাম লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন।"—দ্র' রবীন্দ্র-স্মৃতি (১৩৮০ সং), পৃ. ৪১.

২. সংগীত বিষয়ে ইন্দিরা দেবীর শৈশবস্মৃতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ১৩-১৪।

বেহালা শেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখনকার কালে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অব্ মিউজিক থেকে গানের ঔপপত্তিক প্রশ্ন এদেশে পাঠানো হত। তার ইন্টারমিডিয়েট পর্ব পর্যন্ত আমি পাস করেছিলাম।'[৩]

এদেশের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতেও তাঁহার প্রভূত আগ্রহ ছিল। তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি বিখ্যাত ওস্তাদ বিদ্রদাস সুকুলের নিকট উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী কণ্ঠসংগীতে তালিম গ্রহণ করেন এবং পরে মধ্য বয়সে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচিতে বাসকালে প্রফেসর ছেদি রাতিয়ার নিকট নবোদ্যমে সংগীতে পাঠ নেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ ও ভরাট।[৪]

যন্ত্রসংগীতের বিষয়েও ইন্দিরা দেবী সমান আগ্রহী ছিলেন। লরেটো কনভেন্টের ছাত্রীর পক্ষে পাশ্চাত্য সংগীতে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক ছিল। তাঁহার নিজের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি, লরেটোতে সেন্ট্ পলস্ ক্যাথিড্রালের অর্গানবাদক মিঃ স্লেটারের নিকট তিনি পিয়ানো এবং মানজাটোর নিকট বেহালা শিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহু পাশ্চাত্য আঙ্গিকবিশিষ্ট গানের সহিত তিনি পিয়ানো বাজাইয়াছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পিয়ানো বাজানো তাঁহার অন্যতম শখ ছিল।[৫] সেতার-বাদনেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। গানের সহিত এস্রাজের সঙ্গত অধিক পছন্দ করিতেন— বিশেষতঃ মহিলাদের গানের সময়।

শৈশবে তাঁহার দেশী-বিদেশী সংগীত শিক্ষার সঙ্গী ছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী। 'আমার দিশী বিলিতী সংগীতের সর্বদা সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন সরলা দিদি। আমরা যা কিছু শিখেছি, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে শিখেছেন।'

---

৩ তদেব, পৃ. ১৩।

৪. সুশীল রায়, স্মরণীয় (১৯৫৮), পৃ. ৬১-৬২।

৫. তাঁহার পিয়ানো বাজানোর দক্ষতা বিষয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য, দ্র চলমান জীবন, ১ম পর্ব (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৩), পৃ. ৮৩.

বিবাহ

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে বঙ্গসাহিত্যে স্বনামধন্য প্রমথ চৌধুরীর সহিত ইন্দিরা দেবীর বিবাহ হয়। চৌধুরী পরিবারের সহিত ঠাকুর পরিবারের পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রমথনাথের অগ্রজ আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের সঙ্গী'। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এই পরিণয়কার্য সম্পন্ন হয়।

সাহিত্য-চর্চা

ইন্দিরা দেবী খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের গভীর স্নেহের পাত্রী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য চর্চার মূলেও প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই ক্রিয়াশীল ছিল। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ইন্দিরা দেবী স্বয়ং লিখিয়াছেন—

> 'সিমলা থেকে নেমে এসে সেই যে বছর-আষ্টেক বয়সের পর কলকাতার স্কুলে ভরতি হলুম তখন থেকে প্রায় তাঁর জীবনান্ত পর্যন্ত রবিকাকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আমাদের সাহিত্য জীবনকে গড়ে তুলেছিল, একথা অবশ্য স্বীকার্য। সে ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করেছি, হয়েছি, এমন কি ভেবেছি পর্যন্ত, তা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আচ্ছন্ন। ছেলেবেলায় বিলেত যাওয়া আর ইংরেজি পড়ার দরুণ, সত্যিকথা বলতে গেলে, আমার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অতি কাঁচাই থেকে যেত যদি-না তাঁর সাহিত্য প্রতিভার সংস্পর্শ পেতুম।'[৬]

অতি শৈশবেই ইন্দিরা দেবী সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় দেন। ইহার মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিশোরী ইন্দিরাকে লিখিত তাঁহার পত্রাবলীই বালিকা

৬. রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ: ৪৬।

ইন্দিরা দেবীকে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইন্দিরা দেবী লিখিয়াছেন—

'আমার যখন আন্দাজ ন'বছর বয়স তখন থেকেই অক্ষয় চৌধুরীকে কবিতায় চিঠি লিখতুম।' (রবীন্দ্রস্মৃতি)

জননী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত রাস্কিনের একটি রচনার অংশাবশেষের অনুবাদ ইন্দিরা দেবীর প্রথম মুদ্রিত রচনা ('বালক' ১২৯২ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা)। এই অনুবাদ ইন্দিরা দেবীর সাহিত্যজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ অনুবাদের সাহায্যে বিদেশী সাহিত্যের রস স্বদেশী সাহিত্যে আনয়ন এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের রস বিদেশকে উপহার দান ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সাহিত্যচর্চার বৈশিষ্ট্য। অনুবাদকর্মে শৈশবাবধি এই প্রবণতা তাঁহাকে উত্তরজীবনে এক দক্ষ অনুবাদক হিসাবে পরিচিত করিয়াছে। প্রথম পরিশিষ্টে সংযুক্ত তৎকৃত অনুবাদের তালিকায় ইহার নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

অনুবাদে তাঁহার অবিসংবাদী দক্ষতা থাকিলেও মৌলিক বাংলারচনাতেও তাঁহার অনুরাগ কম ছিল না। তাঁহার পুস্তকের সংখ্যা অধিক নহে; কিন্তু তাহাতেই মৌলিক রচনাশক্তির প্রমাণ আছে।। বালক, ভারতী, পরিচয়, বামাবোধিনী, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত রচনাবলীই তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। সকৌতুকে ইন্দিরা দেবী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

'...আমার যেটুকু রচনাশৈলীর শিক্ষা হয়েছে সে ঐ সবুজপত্রেরই দৌলতে। ১৯০২ সালের রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুঘটিত কাঠখোট্টা রচনার পর এই দশ বছরে সঙ্গগুণে বা যে কারণেই হোক, আমার লেখার যে উন্নতি

হয়েছিল তার ফলে আমার সবুজপত্রে লেখা প্রবন্ধ সংগ্রহ সম্বোধন নীলমণি 'নারীর উক্তি' বইখানি তখনকার কালে অনেকের ভালো লেগেছিল।[৭]

প্রথম গ্রন্থ 'নারীর উক্তি' প্রকাশিত হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা 'ভারতী' ও 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত লেখিকার ৭টি প্রবন্ধের সংগ্রহ। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংস্করণে দুইটি প্রবন্ধ বর্জিত ও একটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লেখিকা বলিয়াছেন—

> শ্রী যাঁদের সম্পদ, হ্রী যাঁদের ভূষণ, ধী যাঁদের সহায়; স্নেহ যাঁদের অগাধ, ক্ষমা যাঁদের অপার, ধৈর্য যাঁদের অসীম; কর্ম যাঁদের বন্ধু, ধর্ম যাঁদের রক্ষক; মন যাঁদের সরল, বাক্য যাঁদের মধুর, সেবা যাঁদের অক্লান্ত, যাঁরা আত্মসুখে উদাসীন, পরদুঃখে কাতর, অতি অল্পে সন্তুষ্ট—সেই প্রাতঃস্মরণীয়া, সেকালের আদর্শস্থানীয়া পরিচিত অপরিচিত বঙ্গনারীকুলের উদ্দেশে এই সামান্য গ্রন্থখানি অর্ঘ্যস্বরূপ উৎসর্গীকৃত হল। তাঁদের সঞ্চিত পুণ্য যেন আমাদের একালে দিক্‌নির্ণয় করবার আলো দেখায়, তাঁদের সম্মিলিত শক্তি যেন আমাদের নবযুগের পথে চলবার বল দেয়।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭)—রবীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া ইন্দিরা দেবীর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা। সূচনা, সংগীতস্মৃতি, নাট্যস্মৃতি, সাহিত্যস্মৃতি, ভ্রমণস্মৃতি, পারিবারিক স্মৃতি - ছয়টি অধ্যায়ে এই স্মৃতিকথা গ্রথিত। রবীন্দ্র-জীবনের বহু অজ্ঞাত ও সরস তথ্যের সহযোগে বিবৃত 'প্রাণাধিক' ভ্রাতুষ্পুত্রী রচিত এই গ্রন্থ বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রবর্তনায় রচিত হয়।

ইন্দিরা দেবী-রচিত অন্য গ্রন্থদ্বয় সংগীত বিষয়ক। প্রমথ চৌধুরীর সহিত একযোগে লিখিত 'হিন্দুসংগীত' (১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত) গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'সংগীতপরিচয়' ইন্দিরা দেবী-রচিত। এই প্রবন্ধে তিনি হিন্দুস্থানী

---

৭. তদেব, পৃ. ৪৮

সংগীত-সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। সংগীতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ কোনো অবদান তিনি লক্ষ্য করেন নাই। উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের সংগীতবৈশিষ্ট্যাবলী তিনি যথাযথভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কণ্ঠসংগীতের সহিত যন্ত্রসংগীতের আলোচনার ফলে এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম' ইন্দিরা দেবীর তৃতীয় গ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থে অন্যরচিত গানের সুর অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান লিখিয়াছিলেন তাহার একটি বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে ২২৭টি গানের সূত্র নির্ণীত হইয়াছে।

ইন্দিরাদেবী কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনা পূর্বক প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন **'বাংলার স্ত্রীআচার'** গ্রন্থটি (১৩৬৩বঙ্গাব্দ) লৌকিক আচার-সম্পর্কিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ অঞ্চলের কয়েকজন কুলনারীদের সংগৃহীত বিবাহের বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান এবং সংগীত ইহাতে পরিচ্ছন্নভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। 'মুখবন্ধে' সংকলনকারিণী প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—

> 'কালের স্রোতে কত পুরাতন আচার বিচার ভেসে যায় ও কত নূতন বিচার-আচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবু তার মধ্যে কতকগুলি থেকে যায়। সেই চিরন্তন প্রথার মধ্যে বাংলার স্ত্রী-আচার স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে। …এই বইটিতে চারটি অঞ্চলের স্ত্রী-আচারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।'

'পুরাতনী' (১৯৫৭খৃঃ) মাতা জ্ঞানদানন্দিনী-রচিত স্মৃতিকথা ও পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৭টি পত্রের সংকলন।

নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত পাঁচশতটি গানের একটি সর্বভারতীয় সংকলন ইন্দিরা দেবীর সম্পাদনায় ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে **'গীত-পঞ্চশতী'** নামে সাহিত্য-আকাদমী হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, স্বদেশ ও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের যথাক্রমে ১৫৭, ১২৭, ১০৯, ৬৯, ২৯ এবং

৯টি রবীন্দ্রসংগীত সংকলিত হইয়াছে। ইন্দিরা দেবী রচিত ভূমিকা রচনার তারিখ—শান্তিনিকেতন, ১৪ এপ্রিল ১৯৫৯। রামপূজন তিবারী এই সংকলন গ্রন্থের লিপ্যন্তর ও শব্দার্থ রচনা করিয়াছেন।

পত্রিকা-সম্পাদনা

'আনন্দসংগীত পত্রিকা' নামক একটি সংগীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে (শ্রাবণ ১৩২০-আষাঢ় ১৩২৭) ইন্দিরা দেবী ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ১ম বর্ষ 'আনন্দসংগীত পত্রিকার' আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ :

১ম বর্ষ/শ্রাবণ ১৩২০। / ১ম সংখ্যা। / ওঁ/আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা / [বীণাবাদনরতা হংসারূঢ়া সরোবরবাসিনী বাগ্দেবীর চিত্র] / সম্পাদিকা শ্রীপ্রতিভা দেবী/শ্রীইন্দিরা দেবী/অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যা চার আনা মাত্র/৪৭ নং ওল্ড বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনার একস্থলে অন্যতর সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রতিভা দেবী (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী) লিখিয়াছেন—

'যাঁহারা সংগীতজ্ঞ, যাঁহারা সংগীতপ্রিয়, তাহাদের কাছে আমাদের এই নিবেদন, নিজেরা অনুগ্রহপূর্বক গ্রাহক হইয়া এবং অনেক গ্রাহক করাইয়া ইহার সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবেন।···সকলের কাছে আমাদের অনুনয় আমি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকার ভার লইয়া যদি কিছু করিতে পারি সেই চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি।'

'সংগীত-সঙ্ঘ' নামক সংগীত প্রতিষ্ঠানের এই মুখপত্রটি উভয়ে যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করেন। ইহাতে ইন্দিরা দেবীকৃত বহু সংগীতের স্বরলিপি মুদ্রিত হইয়াছে।[৮]

শান্তিনিকেতন আলাপিনী মহিলা সমিতির মুখপত্র 'ঘরোয়া' প্রকাশে তাঁহার

---

৮. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

উৎসাহ এবং নির্দেশ সর্বাধিক সক্রিয় ছিল। এই আলাপিনী মহিলা সমিতি পূর্বে স্থাপিত হইলেও মধ্যে ইহার কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইন্দিরা দেবীর শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাসের পর হইতেই ইহা পুনরুজ্জীবিত হয়। 'ঘরোয়া' প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। সহ-সম্পাদিকা ছিলেন মলিনা দেবী। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ইন্দিরা দেবী রচিত এই 'আশীর্বাণী'টি মুদ্রিত হয়ঃ

যদিও আমাদের বাংলা দেশে এত পত্রিকা ক্রমাগত বেরোয় যে, আর একটি নতুন পত্রিকা জন্মলাভ করলেই শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে খুব ইচ্ছে করে, তা বলতে পারিনে। তবু "ঘরোয়া" পত্রিকাটি সহজ সরল ভাষায় গ্রামে জ্ঞান বিস্তার করতে চায় ব'লে তার একটু নতুনত্ব ও আবশ্যকতা আছে ব'লে মনে করি। তাই তার যাত্রাপথে আন্তরিক আশীর্বাদ করি যেন তার উদ্দেশ্য সফল হয়, যেন পল্লীগ্রামে যারা ভাল বই বা খবরের কাগজ বা বইপড়ার ঘর হাতের কাছে পায় না, তারা যেন এই সামান্য পত্রিকা থেকে মনের খোরাক ও আনন্দ দুইই যোগাড় করতে পারে। আর আমরাও যেন জানতে পাই তারা কি চায়, কি পেলে খুশি হয়।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীমতী সুজাতা মিত্র 'পল্লী নারী সেবায় প্রেরণাদাত্রী ইন্দিরা দেবী' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেনঃ

'এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ইন্দিরা দেবী 'ঘরোয়া' সৃষ্টিতে উৎসাহিত হন গ্রামের মেয়েদের পাঠের উপযোগী কিছু লেখা তাতে থাকবে বলেই। ওদের শিক্ষা ও মঙ্গল চিন্তাই ছিল 'ঘরোয়া' প্রকাশের উৎস। তখন তাঁর মনে গ্রামের মেয়েদের জন্য কিছু করার আগ্রহ ও চিন্তা সব সময়েই কাজ করছিল। আশ্রমের মহিলা-সমিতির মাধ্যমে জোরালো কিছু করেন এই ছিল তাঁর

আকাঙ্ক্ষা। বৃদ্ধা নিজের শরীরের স্থাবিরত্বকে মেনে নিয়েও দিতে চেয়েছিলেন তার মনকে পল্লীর আকাশে বাতাসে। "ঘরোয়া" ছিল তাঁর সেই প্রকাশ, অন্যরূপে।'[৯]

ইন্দিরা দেবী বহু গানের স্বরলিপি-রচয়িত্রী। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজেও বহু গানের রচয়িত্রী। 'সুরঙ্গমা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রচিত কিছু গান মুদ্রিত হইয়াছে। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়[১০] প্রকাশিত ইন্দিরা দেবী রচিত একটি গান এখানে উদ্ধৃত হইল। গানের সুর ও স্বরলিপি রচনা করিয়াছিলেন মোহিনী সেনগুপ্তা।

ঝড়ের তরী

ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে, বইছে ঝড়ের হওয়া,
ওরে মাঝি, 'সামাল' 'সামাল', কঠিন হবে যাওয়া।
মাতাল হয়ে বইছে নদী, সামাল সামাল বাঁচবি যদি,
স্রোতের মুখে যাসনে ভেসে—ভার হবে কুল পাওয়া।
বইছে বাতাস খর বেগে, কাঁপছে তরী (পালে লেগে),
ঢাকল আকাশ কালো মেঘে, যায় না-ক চোক চাওয়া
ঝড়ের মুখে নামিয়ে নে' পাল, জোর করে তুই থাক ধরে হাল,
আজ না পারিস্ পৌঁছুবি কাল, শেষ হবে তোর বাওয়া।
ওরে মাঝি, সামল-সামাল, বইছে ঝড়ের হাওয়া।

সংগীত-চর্চা প্রসংগ

ইন্দিরা দেবীর সংগীত শিক্ষা বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখন

৯. 'ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর স্মরণে' ঘরোয়া শ্রাবণ ১৩৬৯, পৃ. ৪৫।

১০. বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃ. ৪৮।

সেই সংগীতের চর্চা এবং সংগীতসূত্রে তাঁহার বিভিন্ন ভূমিকার কথা আলোচনা করিতেছি। 'আনন্দসংগীত পত্রিকা'র সহিত তাঁহার সংযোগের কারণ ছিল 'সংগীত-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠানটি। ইহার সহিত সংযোগের পর হইতে ইন্দিরা দেবী প্রতিমাসে দশটাকা হিসাবে বৎসরে একশত কুড়িটাকা নিয়মিতভাবে এখানে দান করিতেন।[১১] প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যা 'আনন্দসংগীত পত্রিকা'র বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত আছে :

সংগীত-সঙ্ঘ

> …'শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্তা হিরন্ময়ী দেবী, শ্রীযুক্তা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ও শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী শিক্ষার্থিনীদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।'

ইন্দিরা দেবী ও প্রতিভা দেবী উভয়ে পরে সংগীত-সঙ্ঘের মহিলাবিভাগের সম্পাদিকা হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে পুরুষ বিভাগের সম্পাদকদ্বয় ছিলেন—রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সংগীতসাধক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (পৃ.১৫৭) 'সংগীত-সঙ্ঘ' সম্পর্কে মন্তব্যকালে লেখেন—"মাননীয়া শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী মহোদয়া ও শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী মহোদয়ার প্রযত্নে এই 'সংগীত-সঙ্ঘ' নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।"

বিশ্বভারতী সংগীত-ভবনের প্রনেত্রী পদে তাঁহাকে বরণ করিয়া বিশ্বভারতী তাঁহার গুণের মর্যাদা দান করেন (১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে আমৃত্যু)।

---

১১. 'আনন্দসংগীত পত্রিকায়' প্রতিবারের বার্ষিক প্রতিবেদনে ইহা উল্লিখিত আছে।

ইন্দিরা দেবীর সমগ্র জীবন ও সাধনা রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুশীলন, চর্চা এবং প্রচারে অতিবাহিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। 'ছিন্নপত্রাবলী' তাহার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। আশ্বিন ১২৯৪ সাল হইতে অগ্রহায়ণ ১৩০২ পর্যন্ত ইন্দিরা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ-লিখিত একশত পঁয়তাল্লিশটি পত্র 'ছিন্নপত্র'-এর প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। এই পর্বের যাবতীয় চিঠির সাহিত্যগুণোপেত অংশ ইন্দিরা দেবী দুইটি খাতায় নকল করিয়া রাখেন এবং তাহা রবীন্দ্রনাথকে পরে উপহার দেন। সেই খাতা দুইখানি অবলম্বনেই ছিন্নপত্র প্রকাশিত হয়।[১২] এই খাতা দুইটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রগুলি[১৩] ব্যতীত ইন্দিরা দেবীকে যে-সব চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই 'চিঠিপত্র' ৫ম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। যে দুই একখানি মুদ্রিত হয় নাই, সেই অপ্রকাশিত রবীন্দ্র-পত্রের দুইটি গ্রন্থের তৃতীয় পরিশিষ্টে বিশ্বভারতীর সৌজন্যে মুদ্রিত হইল।

১২. এই সকল চিঠি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মমতার অবধিমাত্র ছিল না—"আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে, তোকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে চলে যাই। …আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস। আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্য সম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব—কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তহলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব; তখন এই সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর—এই স্নিগ্ধ শান্ত বসন্ত জ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকাভাবে ফিরে পাব। আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিন রাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।" ইন্দিরা দেবী এই সুখদুঃখের ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থিকা, প্রথম সম্পাদিকা।

১৩ 'ছিন্নপত্রাবলী'র রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পূর্ণতর পাঠসহ আরও ১০৭টি পত্র সংকলিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথকে যে-সব চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার সবগুলি আমরা বহু অনুসন্ধানেও পাই নাই। সেইগুলি সব পাইলে 'ছিন্নপত্রাবলী'র একটি মূল্যবান্ সঠিক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ রচিত হইতে পারিত এবং তাহাতে ইন্দিরা দেবীর কিশোরী মনের সাহিত্যপ্রাণতা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িত। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ইন্দিরা দেবীর মাত্র চারিখানি চিঠি সংরক্ষিত হইয়াছে। এই অপ্রকাশিত পত্রচতুষ্টয় চতুর্থ পরিশিষ্টে সংযুক্ত হইল। ইহা হইতে উভয়ের সম্পর্কের মাধুর্য সহজেই অনুমিত হইবে।[১৪]

ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১২৯০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'প্রভাত সংগীত' কাব্য-গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রাণাধিক ইন্দিরাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণে ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশ্যে 'স্নেহ-উপহার', 'শরতে প্রকৃতি' ও 'শীত' নামক তিনটি কবিতা রচিত হইয়াছিল—এগুলি পরে পরিত্যক্ত হয়। 'শীত' কবিতাটি অবশ্য পরে অংশতঃ 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চম পরিশিষ্টে 'প্রভাত সংগীত'-এর গ্রন্থোৎসর্গ-কবিতা 'স্নেহ-উপহার' মুদ্রিত হইল।

আশুতোষ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ ১২৯৩ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে চারটি কবিতা ইন্দিরা দেবীকে পত্রাকারে লিখিত হইয়াছিল। পরবর্তী সংস্করণ হইতে এগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য 'পত্র' (মা গো আমার লক্ষ্মী), 'জন্মতিথির উপহার : একটি কাঠের বাক্স' (স্নেহ উপহার এনেছি রে), এবং 'চিঠি' (চিঠি লিখব কথা ছিল) কবিতাত্রয় 'শিশু' গ্রন্থে পরিবর্তিত

১৪ রবীন্দ্রভবনে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত ইন্দিরাদেবীর দুইখানি মূল্যবান্ পত্রও রহিয়াছে।

আকারে যথাক্রমে 'বিচ্ছেদ'; 'উপহার' এবং 'পরিচয়' নামে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ পরিশিষ্টে এই কবিতাগুলির একটি মুদ্রিত হইল।

বালিকা ইন্দিরার সাহিত্যবুদ্ধি এবং সংগীতপ্রীতি পরিণতবয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। ইন্দিরা দেবীর রবীন্দ্র-চর্চা দ্বিবিধ—রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ এবং রবীন্দ্রসংগীতের(অন্যবিধ সংগীত সহ)চর্চা ও সম্প্রসারণ।

বহু রবীন্দ্র-কবিতা ও রচনার দক্ষ অনুবাদক ছিলেন ইন্দিরা দেবী। সাধারণতঃ অনুবাদে মূলের রস সঞ্চারিত হইতে বড় দেখা যায় না। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অনায়াস অধিকার এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত আবাল্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় হেতু এই সকল অনুবাদে সার্থক হইয়াছিল এবং অনুবাদিকা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্যা হইয়াছিলেন। ৬ জানুয়ারী ১৯২৯ তারিখে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন—

> 'তোর সব তর্জমাগুলিই খুব ভালো হয়েচে। ...কবিতার তর্জমাগুলি বিশ্বভারতী জার্নালের জন্যে সুরেনকে কপি করে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলে দিলুম।...
>
> ...এইমাত্র তোর তর্জমাগুলি অপূর্বকে দেখালুম—সে বললে আমার কবিতার এত ভালো তর্জমা সে আগে আর দেখেনি।' (চিঠিপত্র; ৫ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২৮)

ইন্দিরা দেবী-কৃত অনুবাদসূচীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান, গল্প, প্রবন্ধের একটি তালিকা এই গ্রন্থে সংযুক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রী' (১৯১৯) গ্রন্থের প্রথম ইংরাজী অনুবাদিকা[১৫] হিসাবেও ইন্দিরা দেবীর নাম স্মরণযোগ্য।

১৫. এই অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসংগীতের 'আছি'। সারাজীবন ধরিয়া তিনি রবীন্দ্র-সংগীতকে বিলুপ্তির হাত হইতে উদ্ধার, উহার শুদ্ধ স্বরলিপি প্রণয়ন এবং প্রচারের বিবিধ উপায় গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রসংগীতকে বর্তমান জনপ্রিয়তার স্তরে পেঁছাইয়া দিয়াছেন।

ইন্দিরা দেবী অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নিকট কখনও 'হাতে কলমে' গান শিক্ষা করেন নাই—

"আমি রবীকাকার কাছে আলাদা করে বসে কখনো গান শিখেছি বলে মনে পড়ে না। কেবল বাড়িময় হাওয়ায় হাওয়ায় যে গান ভেসে বেড়াত তাই শুনে শুনে শিখেছি। পরবর্তীকালে বরং আমার বালিগঞ্জের কমলালয় বাড়িতে পিয়ানোর কাছে বসে তিনি আমাকে দু-একটা গান শেখাতে চেয়েছেন বলে মনে পড়ে, যেমন, 'কে গো অন্তরতর সে' প্রভৃতি।" ('রবীন্দ্রস্মৃতি' সংগীতস্মৃতি পর্যায়)

পরবর্তী জীবনে তিনি 'অবশ্য রবিকাকার অনেক বিলিতি গানের সংগে পিয়ানো' বাজাইয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্পর্কে নানা আলোচনাও করিতেন। একবার তিনি নিজের প্রথম বয়সের গানের সহিত পরিণত বয়সের গানের তুলনা প্রসংগে বলিয়াছিলেন—'আমার আগেকার গানগুলি ইমোশানাল, এখনকারগুলি ইসথেটিক।'

রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে ইন্দিরা দেবীর অবদান বিবিধ—এক : বহু রবীন্দ্র-সংগীতকে তিনি বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যখনই কোনো সংগীতের শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই গুণীজনেরা তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছেন। শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার তাঁহাকে 'পুরানো গানের একজন বিশ্বস্ত রক্ষক এবং প্রামাণ্য স্বরলিপিকার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দুই : রবীন্দ্রসংগীতের উপর হিন্দী গানের প্রভাবের বিস্তারিত আলোচনা

তাঁহার কারণেই সম্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বহু গান ইহার সংগৃহীত হিন্দী সুরের ছায়ায় বর্ধিত। পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল কারোয়ারে বাসকালে একদা একদল নর্তকী গান শোনাইতে আসিলে ইন্দিরা দেবী তাহাদের নিকট হইতে কানাড়ী ভাষার কয়েকটি গান শিখিয়া লইয়াছিলেন। পরে সেগুলি ভাঙিয়া রবীন্দ্রনাথ 'বড় আশা করে', পূর্ণচন্দ্রাননে', 'আজি শুভদিনে' প্রভৃতি সংগীতের সুরসৃষ্টি করেন।

তবে হিন্দী হইতে ভাঙা গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। ইন্দিরা দেবী তাঁহার 'রবীন্দ্র সংগীতের ত্রিবেণী সংগম' গ্রন্থে নিজের সংগৃহীত ও ভাঙা হিন্দী গানের সুরে রবীন্দ্রসংগীত রচনার বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে তিনি স্বয়ং একটি বক্তৃতায় সংগীত সহযোগে এই প্রভাব বিশদভাবে আলোচনা করেন। 'ঘরোয়া' পত্রিকার সম্পাদিকা এবং এই বক্তৃতার একজন প্রত্যক্ষ শ্রোত্রী শ্রীমতী সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,[১৮]—'She gave once in 1947 an interesting lecture on Rabindra Sangit with demonstrations of many songs of Rabindranath parallel with different Indian and Western songs, in order to show that the poet set the tunes of many of his earlier songs according to the tunes of those songs.'

তিন: রবীন্দ্রসংগীতের তিনি একজন বিশুদ্ধ স্বরলিপিকার। রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসংগীতের সুর সংরক্ষণে উদ্যোগী হইলে ইন্দিরা দেবী বহু আয়াস স্বীকার করিয়া বহু বিস্মৃতপ্রায় গানের সুর স্বরলিপিবদ্ধ

১৮. 'Indira Devi Choudhurani,' Sudhamayee Mukhopadhyaya, Roshni, Journal of the All India Women's Conference, September 1957.

করেন। ইহাদের মধ্যে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'[১৯] ও 'কালমৃগয়া'র স্বরলিপি উল্লেখযোগ্য। 'মায়ার খেলা'র স্বরলিপি ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় দুইশত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি তাঁহার নিজের হস্তে রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ দ্বিসহস্রাধিক সংগীতের রচয়িতা হওয়া সত্ত্বেও নিজের গানের স্বরলিপি লিখনে বিস্ময়কর রকমের অবহেলা প্রকাশ করিতেন। ইন্দিরা দেবী জানাইয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র গানেরই স্বরলিপি করেছিলেন।' এই গানটি তাঁহার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকার ভাদ্র ১৩৫৯ সংখ্যায় গানটি মুদ্রিত হইয়াছে। গানটি হইল 'একি সত্য সকলি সত্য'। 'কল্পনা' কাব্যে গানটির কিছু ভিন্নতর পাঠ মুদ্রিত আছে।

ইন্দিরা দেবীর কৃত স্বরলিপিসমূহ—সংগীত-প্রকাশিকা, বীণাবাদিনী, আনন্দসংগীত পত্রিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মায়ার খেলা প্রভৃতি পত্রিকা ও গ্রন্থে লভ্য। তাঁহার রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপির পাণ্ডুলিপি 'মুদির খাতা' শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। কেবলমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেই ইন্দিরা দেবীর সংগীতচর্চা আবদ্ধ ছিল না। অতুলপ্রসাদ সেন এবং দিজেন্দ্রলাল রায়ের নিকট সংগীতশিক্ষার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। ('রবীন্দ্র-স্মৃতি', সংগীতস্মৃতি অধ্যায়, পৃ. ২১)। তাঁহাদের কয়েকটি গানের স্বরলিপিও ইন্দিরা দেবী রচনা করিয়াছিলেন (তালিকা দ্রষ্টব্য)। বিহারীলাল চক্রবর্তী-রচিত কয়েকটি গান রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়া সেগুলিও শিখিয়া লইয়াছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত এই সকল গান তিনি আগ্রহী শিক্ষার্থীগণকে ভরাট গলায় গাহিয়া শিখাইতেন।

---

১৯. 'ভানুসিংহের পদাবলী'র গানগুলি একত্র একটি নাটকরূপে গ্রথিত করিয়া তিনি পুনঃপ্রকাশ করেন। তাঁহার কৃত স্বরলিপির কারণেই ইহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 'কালমৃগয়া'র লুপ্তপ্রায় সুরের স্বরলিপি রচনাও স্মরণযোগ্য।

অভিনয়-চর্চা

ইন্দিরা দেবী যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সুস্থ সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। নানা উপলক্ষে নাটকাভিনয় করা এই পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' বহুবার ঠাকুরবাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে অভিনীত হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের পর লেডী ল্যান্সডাউনের সম্মানে যে অভিনয় হয়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'ঘরোয়া' গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত ও কৌতুককর বিবরণ দিয়াছেন। এই অভিনয়ে 'লক্ষ্মী'র ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বালিকা 'বিবি'—অথবা ইন্দিরা।[২০] অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'লক্ষ্মী সেজে বিবি যখন লাল আলোতে স্টেজে ঢুকত, আহা সে যে কি সুন্দর দেখাত।' এই অভিনয়ে তিনি 'কেন গো, আপন মনে' -গানটি গাহিয়াছিলেন। ইন্দিরা দেবী অবশ্য বলিয়াছেন যে, তাঁহার তেমন অভিনয়শক্তি ছিল না।

'কালমৃগয়া' নাটকেও তিনি একবার অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ঊষা দেবী 'বনদেবী'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। ইন্দিরা দেবী লিখিয়াছেন,

> "আমি ও ঊষাদিদি কালমৃগয়ায় বনদেবী সেজে 'সমুখেতে বহিছে তটিনী' গানটিতে এক জায়গায় বসে ডান হাতের ভঙ্গীতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বয়ে যাচ্ছে আর দু আঙুল উপরে তুলে 'দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া' দেখাতাম সে গল্প করে সেদিন পর্যন্ত কত মেয়েদের হাসিয়েছি।...

---

২০. এই নামকরণের প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী লিখিয়াছেন—'আমার শিশুকাল কেটেছে বাবার কর্মস্থল দাক্ষিণাত্যের কারোয়ারে। সেখানকার দাসদাসী আমার বিবি নাম দেয়।...কেবল রবিকাকা আমাকে মাঝে মাঝে ডাকতেন 'বব' বলে!'

আমি কখনোই ভালো অভিনয় করতে পারিনে।"[২১] পরবর্তীকালে এই 'মায়ার খেলা' নাটকের একটি অভিনয়ে শান্তা-র ভূমিকার ইন্দিরা দেবী অভিনয় করিয়াছিলেন। এই নাটকটি অভিনীত হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার[২২] বাড়ীর প্রশস্ত বারান্দায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের সাহায্যার্থে তিনি বড় ভাশুর আশুতোষ চৌধুরীর প্রবর্তনায় একবার 'বাল্মীকি-প্রতিভা' মঞ্চস্থ করেন। 'ফাল্গুনী' নাটকের একটি অভিনয়ে ছোটদের নৃত্যশিক্ষার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। অভিনয় ভালো করিতে পারেন না বলিয়া বিনয়প্রকাশ করিলেও তাঁহার মন নাট্যরসে পূর্ণ থাকিত। শান্তিনিকেতনে শেষ বয়সে বসবাসের পর সেখানকার প্রতিটি উৎসব-অনুষ্ঠান তাঁহার পরিকল্পনামতে অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহার সংবেদনশীল মনে নাটকের চরিত্রগণ গভীর প্রভাব রাখিতে পারিত। একবার স্টার থিয়েটারে 'বউঠাকুরাণীর হাট'-এর নাট্যরূপ 'বসন্ত রায়' পালার অভিনয় দেখিতে গিয়া বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের গান ও অভিনয়ে খুব কাঁদিয়াছিলেন।

সভা-সমিতি

ইন্দিরা দেবী কলিকাতা ও শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন সভাসমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা সংগীতসম্মিলনী বা সংগীতসঙ্ঘের সহিত তাঁহার যোগাযোগের ইতিহাস পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ

---

২১. দ্র. 'রবীন্দ্রস্মৃতি,' নাট্যস্মৃতি অধ্যায়।

২২. বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী এই বাড়িটি সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর স্মৃতিকথা পঠিতব্য। দ্রষ্টব্য 'স্মৃতিকথা' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮০) বৈতানিক প্রকাশনী পৃ. ৭৯-৮৩।

এই সংগীতসম্মিলনীর 'প্রোৎসাহক' [Patron] পদ গ্রহণে সম্মত হইয়া সম্পাদিকাকে [ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ?] লিখিয়াছিলেন[২৩]—

সম্পাদিকা,

সংগীত সম্মিলনী

9A, Park Street, Cal.

শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়াসু

তোমরা আমাকে সংগীত সম্মিলনীর যে প্রোৎসাহক পদে বরণ করিয়াছ তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। ইতি,

আশ্বিন ১৩৩১

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিভা দেবীর মৃত্যুর পর প্রমদা চোধুরীর অনুরোধে ইন্দিরা দেবী এই সংগীত সম্মিলনীতে যোগ দেন এখানে রবীন্দ্রসংগীত ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অতুলপ্রসাদের গান ও শিক্ষা দেওয়া হইত।

প্রতিভাদেবীর মৃত্যুর পর প্রমথ চৌধুরীর সহ শেষে ইন্দিরা দেবী এই সংগীত সম্মিলনীতে যোগ দেন এখানে রবীন্দ্রসংগীত ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অতুল প্রসাদের গানও শিক্ষা দেওয়া হইত।

অল্ ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সের কলিকাতা শাখা সমিতির তিনি সভানেত্রী ছিলেন। বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন লীগের তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

---

২৩. এই অপ্রকাশিত পত্রটি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত ও মুদ্রিত। এই সংগীত সম্মিলনী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত একটি অপ্রকাশিত মানপত্র সপ্তম পরিশিষ্টে সংবদ্ধ হইল।

শান্তিনিকেতন আলাপিনী মহিলাসমিতির দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ছিলেন ইহার প্রাণস্বরূপ। বহুদিন অচল থাকার পর ইন্দিরা দেবীর চেষ্টায় ইহা পুনর্জীবিত হয়। ইহার বিভিন্ন কর্মে তিনি সক্রিয় পরামর্শদাত্রী ছিলেন। 'তাঁর পরিচালনায় সমিতির সভ্যরা একবার ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙালি মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের বিবর্তনের সুন্দর চিত্র নিজেরা সেজে দেখান। ইন্দিরা দেবীর ইচ্ছা ছিল এইগুলির ছবি তুলিয়া গ্রন্থাকারে তাহা প্রকাশ করার; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সম্ভব হয় নাই।'[২৪]

একসময় হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রম-এর তিনি প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। 'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রমবাসিনীদের জন্য' ইন্দিরা দেবী রচিত আশ্রম সঙ্গীতটি ছিল নিম্নরূপ:

মোরা আশ্রম দুহিতা,
মোরা দেশের দুহিতা,
মোরা সবাই যে বোন, সবাই মায়ের সেবায় নিবেদিতা ॥
হেথা রক্ষা করেন ধর্ম,
হেথা পুণ্য মোদের কর্ম
হেথা শিক্ষা মোদের লক্ষ্য, হেথা কর্ম মোদের পিতা ॥
হেথা গৃহহীনার মিলে গেহ
মাতৃহীনার মিলে স্নেহ,
শক্তিহীনা নয় কেহ, সবে সুস্থ সুচরিতা ॥
যবে বাহিরিব কাজে,
মাকে লজ্জা দিব না যে,

২৪. সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় 'পূজনীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর জীবন কথা,' 'ঘরোয়া', ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৯, পৃ. ১৬।

হৃদে সদা যেন বাজে মোদের আশ্রমের এই গীতা ॥[২৫]

সম্মানলাভ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সাহিত্যসৃষ্টি পরিমাণে বিপুল না হইলেও গুণগত বিচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গুণগত বিচারের সাহায্যেই এই অন্তর্মুখী সাহিত্যসাধিকাকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসাবে ঘোষণা করিয়া 'ভুবনমোহিনী পদক' দানে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির বিচিত্রা-ভবনে তাঁহাকে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ় (২৫ জুন ১৯৫১ খ্রী) সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।[২৬]

কলিকাতাবাসী তথা দেশবাসীর পক্ষ হইতে ইন্দিরা দেবীর আশীতিবর্ষের শুভারম্ভে কলিকাতার আশুতোষ কলেজ হলে ১৩ আষাঢ় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে (২৭ জুন, ১৩৫৩ তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্ত। 'পট্টবস্ত্র, মৃণালগুচ্ছ, ধূপ, চন্দন ও দুই সহস্র রৌপ্যমুদ্রা সহযোগে একটি পুষ্প পাত্রে তাঁকে প্রণামী নিবেদন করা হয়।' অতুল-চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়-রচিত মানপত্রে উৎকীর্ণ হয়ঃ

> 'তোমারই মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি সেই তাপসগণকে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে ও ধর্মে, ভাবে ও কর্মে জাতীয় নবজাগরণের যাঁহারা উদ্যোক্তা—তোমরা দিশারী। আমরা অনুসারী। তোমাদের জীবনালোকে আমাদের পথ হোক উজ্জ্বল।'

এই বৎসরের নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতন মহিলা সমিতি তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

২৫. শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত ইন্দিরা দেবীর 'আমার খাতা'র ৯৩ পৃষ্ঠায় এই গানটি লেখা আছে।

২৬. এই সম্বর্ধনার বিস্তারিত সংবাদ অষ্টম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৩ খ্রীঃ) তাঁহার অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন 'গীতবিতান' সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন। শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত আম্রকুঞ্জে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন তাঁহাকে সম্বর্ধিত করেন বৈতানিকের সভ্যবৃন্দ।[২৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে স্বামীসহ ইন্দিরা দেবী কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শেষ জীবন শান্তিনিকেতনেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য বিশ্বভারতীর (অন্তবর্তী) উপাচার্য রূপে বৃতা হন। সম্ভবতঃ তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা উপাচার্য। পরবৎসর উক্ত সারস্বত প্রতিষ্ঠান আচার্য জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে তাঁহাকে বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তমা' (ডি. লিট.) উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

রবীন্দ্রচর্চায় তাঁহার নিরলস ও ঐকান্তিক আগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ রবীন্দ্র-ভারতী সমিতি তাঁহাদের নব প্রবর্তিত 'রবীন্দ্রপুরস্কার' তাঁহাকেই প্রথম অর্পণ করিয়া যোগ্যতার সম্মান প্রদর্শন করেন (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

বৈধব্য ও মৃত্যু

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দিরা দেবীর যখন প্রমথ চৌধুরীর সহিত বিবাহ হয় তখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ। ছাব্বিশ বৎসরের শিক্ষা ও চর্চা ইন্দিরা দেবীর জীবনে নবতর ফসল বহন করিয়া আনিল। সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের শুভ পরিণয়

২৭. উভয় অনুষ্ঠানের মানপত্রদ্বয় গ্রন্থের নবম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এইগুলি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সম্পাদিত হইল। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর তিনি যখন শান্তিনিকেতনে বাস করিতে আসিলেন তখন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও সংগে আসিয়াছিলেন। নিঃসন্তান হইলেও উভয়ের দাম্পত্যজীবন ছিল অনাবিল আনন্দের। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুতে তাঁহাদিগের মিলিত জীবনে অনিবার্য বিচ্ছেদ নামিয়া আসে। স্বামীর মৃত্যুর পর ইন্দিরা দেবী স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেন। এখানেই ২৭ শ্রাবণ ১৩৬৭, ১২ আগস্ট ১৯৬০, তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রচিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ

রচিত গ্রন্থ :

১। নারীর উক্তি : প্রথম প্রকাশ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৩। বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৪+৪। প্রথম সংস্করণে, গৃহীত 'সমালোচকের পত্র' এবং 'গ্রীস ও রোম' প্রবন্ধদ্বয় পরবর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত এবং 'বঙ্গনারী : কি ছিল, কঃ পন্থা' প্রবন্ধটি গৃহীত হয়। দুই সংস্করণ মিলিয়া মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ৯। প্রবন্ধগুলি ভারতী, সবুজ পত্র ও শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে সংকলিত।

২। হিন্দু সংগীত (প্রমথ চৌধুরীর সহযোগিতায়) : প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-এর ৩৭ তম পুস্তক হিসাবে মুদ্রিত। গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধের সংখ্যা তিন। দুই এবং তিন সংখ্যক প্রবন্ধের রচয়িতা প্রমথ চৌধুরী। 'সংগীত পরিচয়' নামক প্রথম প্রবন্ধের রচয়িত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। মূল প্রবন্ধটি সবুজ পত্র পত্রিকার আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৩ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩। রবীন্দ্র সংগীতের ত্রিবেণীসংগম : প্রথম প্রকাশ ১৫ পৌষ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। প্রবেশক পত্রে রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে 'উড়ত বন্দন নব' এই মঙ্গলগান ও তাহার অনুসরণে রচিত 'হৃদয় নন্দনবনে' সংগীতটি মুদ্রিত। গ্রন্থের দুইটি অংশ। ইহার মধ্যে প্রবন্ধ অংশ শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র সপ্তাহে প্রথম পঠিত — ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭। সংগীতাংশে ২২৭টি গানের সূত্র নির্ণীত হইয়াছে। সমগ্র প্রবন্ধ ও গীতাংশ বিশ্বভারতী পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

৪। **রবীন্দ্রস্মৃতি**ঃ প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। সচিত্র। সূচনা, সংগীতস্মৃতি, নাট্যস্মৃতি, সাহিত্যস্মৃতি, ভ্রমণস্মৃতি ও পারিবারিক স্মৃতি—এই ছয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিন্যস্ত। সংগীত-নাট্য-সাহিত্য স্মৃতি প্রথমে বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (ত্রয়োদশবর্ষ ৩-৪ সংখ্যা ও চতুর্দশ বর্ষ ১ম সংখ্যা)। ভূমিকা ঃ "পূজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিকথা রচিত। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সোৎসাহ প্ররোচনায় এর উৎপত্তি ও কল্যাণীয় শ্রীমান শুভময় ঘোষের সযত্ন অনুলিখনে এর পরিসমাপ্তি। প্রায় পৌনে শতাব্দীর স্মৃতির জটিল জালকে সংগীতস্মৃতি নাট্যস্মৃতি সাহিত্যস্মৃতি প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি।"

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ

(১) **বাংলার স্ত্রী-আচার**ঃ শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সংকলিত। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৩। গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানের বিবাহের বিবরণ সম্বলিত মোট পাঁচটি প্রবন্ধ চারজন মহিলা কর্তৃক রচিত হইয়া অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১+৪৪। "কালের স্রোতে কত পুরাতন আচার-বিচার ভেসে যায় ও কত নূতন বিচার-আচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবু তার মধ্যে কতকগুলি থেকে যায়। সেই চিরন্তন প্রথার মধ্যে বাংলার স্ত্রী-আচার স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে।"—মুখবন্ধ।

(২) **পুরাতনী**ঃ প্রথম প্রকাশ ৭ই কার্তিক ১৮২৯ শকাব্দ। সচিত্র। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৫। ইহার মধ্যে ১-৪ পৃষ্ঠা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রচিত ভূমিকা—যাহার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ-ঠাকুর কৃত জ্ঞানদা-চরিত মুদ্রিত, ৫-৪১ পৃষ্ঠায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচিত আত্ম-জীবনমূলক রচনা 'ছেলেবেলার কথা', 'বিবাহের কথা', 'বম্বের কথা' এবং 'বিলাতের কথা' নামে

মুদ্রিত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট ১২৭টি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪) **গীতপঞ্চশতী** : প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের পাঁচশত নির্বাচিত সংগীত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সম্পাদনায় সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা দেবী রচিত ভূমিকার তারিখ শান্তিনিকেতন, ১৪ এপ্রিল ১৯৫৯। সচিত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৮। আখ্যাপত্র : গীত-পঞ্চশতী/দেবনাগরী লিপিমেঁ ৫০০ চুনে হুয়ে গীত/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সম্পাদিকা/ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী/লিপ্যন্তর তথা শব্দার্থ/ রামপূজন তিবারী/সাহিত্য অকাদেমী/নঈ দিল্লী। ইহাতে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, স্বদেশ এবং আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের যথাক্রমে ১৫৭, ১২৭, ১০৯, ৬৯, ২৯ এবং ৯টি গান সংকলিত।

অনুবাদ :

(১) [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে]।

The Auto-Biography of Maharshi Devendranath Tagore With illustrations. Translated from the original Bengali by Satyendranath Tagore and Indira Devi, Calcutta 1909 (1st November), pp. ii+xxiv+195.

(২) Tales of Four Friends—(n. d)—Viswa-Bharati, pp. 119. [প্রমথ চৌধুরী-রচিত 'চার-ইয়ারী কথা' গ্রন্থের অনুবাদ।]

অন্যান্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর রচনাবলীর আংশিক তালিকা :

	গ্রন্থনাম	ইন্দিরাদেবীর প্রবন্ধের নাম	পৃষ্ঠা
১.	সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-শতবার্ষিক সংকলন (১৯৭২)	সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১-১৯
২.	স্মৃতিকথা (বৈতানিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ ১৩৮০	গানের স্মৃতি*	৭৩-৭৮
		বির্জিতলাও *	৭৯-৮৩
৩.	Centenary Volume : Rabindranath Tagore (Sahitya Academi Nov. 1951)	Uncle Rabindranath	.-11
৪.	Gurudev Tagore (Madras Tagore Society, 1946, Edited by R. Narasimhan)	The Music of Rabindranath Tagore	৯৩-৯৮
৫.	রবীন্দ্র-সংগীত প্রসঙ্গ [-শেফালিকা শেঠ]	সংগীতে রবীন্দ্রনাথ	১-৪
৬.	'জয়ন্তী উৎসর্গ' [৭০ বৎসরপূর্তি স্মরণ পুস্তিকা]		ঐ

কয়েকটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার: রচনার নাম	সাক্ষাৎকারী	পত্রিকা
১. যন্দৃষ্টম্	প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	দৈনিক বসুমতী জ্যৈষ্ঠ ৩ ও ১০ ১৩৬০
২. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রসঙ্গে	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	যুগান্তর ৭ মে ১৯৬০

---

* 'গানের স্মৃতি' ১৩৬০ সালে বৈতানিক প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত ভাষণ এবং 'বির্জিতলাও'—উভয় রচনাই প্রথমে 'সমকালীন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩. শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার — সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় — গল্পভারতী আষাঢ় ১৩৮২

॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর স্বরচিত গীতাবলীর প্রথম ছত্র ॥

১. রজনীরূপিনী শ্যামা
২. সখা, বন্ধু ! তুমি কোথায় ?
৩. আমি সকলি দিনু তোমারে
৪. তারে রেখো রেখো তব পায়
৫. আয় বীণা কোলে আয় আমার
৬ কে শোনে সব কথা, তবু নাহি তাঁর কান
৭. এইত জীবন ! হয়ত হবে না আর জনম গ্রহণ
৮. বুঝিতে পারিনে প্রভু
৯. এস দয়া—গলে যাক পাষাণ হৃদয়
১০. এস গো দেশ-দুহিতা
১১. ওগো জলে কমল দোলে
১২. জীবন বহে যায় ধরিয়া রাখো তায়
১৩. মোরা আশ্রম-দুহিতা
১৪. আজি স্মরণে
১৫. আজ এস সবে গীতরবে বন্দি ভারতে
১৬. বরষা আসে ফিরে ফিরে

---

২৮. ২০ আগস্ট ১৯৫৮ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার অনুবাদ

॥ পত্র-পত্রিকায় ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর রচনার আংশিক তালিকা ॥

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী যদিও খুব বেশী প্রবন্ধাদি লেখেন নাই, তবুও তাঁহার রচনার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সমস্ত রচনার তালিকা প্রদান করা সুসাধ্য নহে। তবুও প্রধান পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত রচনাবলীর একটি তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল। এই তালিকায় স্বরলিপিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। তালিকা প্রস্তুত কালে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বড়া বয়েজ ক্লাব এবং শ্রীমতী সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সহায়তা পাইয়াছি।

পত্রিকার নাম	রচনার নাম	পত্রিকার সংখ্যা
আনন্দসংগীত পত্রিকা	হারমণি বা স্বরসংযোগ	১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
	স্বর নির্যাস	৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
	আমাদের গান	৯ম বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা
উত্তর সূরি	কবিগুরু স্মরণে	কার্তিক-পৌষ ১৩৬৭
	রবিকাকা ও সবুজপত্র	রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮
ঘরোয়া	আশীর্বাদ	আশ্বিন ১৩৬৩
সুরঙ্গমা পত্রিকা	রবীন্দ্র সংগীতের শিক্ষা	রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ ১৩৬৮
প্রবাসী	৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী	ফাল্গুন ১৩৪৮
	সেকালের স্মৃতি (আদি ব্রাহ্মসমাজ)	বৈশাখ ১৩৪৯
বামাবোধিনী	ঝড়ের তরী (গান)	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
বালক	[রাস্কিনের অনুবাদ]	অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১২৯২

বিশ্বভারতী পত্রিকা	রবীন্দ্রনাথ কৃত	
	স্বরলিপির ভূমিকা	ভাদ্র ১৩৪৯
	বিশুদ্ধ রবীন্দ্র সংগীত	কার্তিক ১৩৪৯
	মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০
	সত্যেন্দ্রস্মৃতি	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২
	* রবীন্দ্র সংগীতের	
	ত্রিবেণী সংগম	মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬
	পুস্তক সমালোচনা	মাঘ চৈত্র ১৩৫৭ ও
		মাঘ-চৈত্র ১৩৫৮
	রবীন্দ্রস্মৃতি	মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩
		বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪
		শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৫
বঙ্গলক্ষ্মী	ধর্মত্যাগী [অনুবাদ]	অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
	সমাজে নারীর সত্য	
	অধিকার	চৈত্র ১৩৩৫
	মেয়েদের পরিবর্তনে	
	দেশের আমূল পরিবর্তন	চৈত্র ১৩৩৬
	নদীজলে ভগ্নাবশেষ	
	প্রতিমাদর্শনে (কবিতা)	কার্তিক ১৩৩৭
ভারতী	বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার	শ্রাবণ ১৩১৯
শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা	বঙ্গনারী : ক : পন্থা	১৩৪৭
সবুজপত্র	ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা	

সবুজপত্র	ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা আঁদ্রে গীদ-(অনূদিত)	অগ্রহায়ণ ১৩২১
	সম্বন্ধ	বৈশাখ ১৩২২
	আদর্শ	ভাদ্র আশ্বিন ১৩২২
	সংগীত পরিচয়	পৌষ ১৩২৩
	ভদ্রতা	পৌষ ১৩২৪
	গ্রীস ও রোম	কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৫
	প্যাটেল বিল	ফাল্গুন ১৩২৫
	সাহিত্য-চর্চা (অনুবাদ সাহিত্য)	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬
	অদৃষ্ট ? (অনূদিত গল্প)	অগ্রহায়ণ ১৩২৬
	নির্বাসিতের আত্মকথা	আশ্বিন ১৩২৮
	লেখকের প্রার্থনা (অনুবাদ)	কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৮
The Calcutta Municipal Gazette	রবীন্দ্র কাব্যের বারমাস্যা	Lxxv No. 21
দক্ষিণী রবীন্দ্র-সংগীত সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ, জুন ১৯৫৭	রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রভৃতি	
ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭	রবীন্দ্রসংগীতে তানের স্থান	
সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা	রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য	শ্রাবণ ১৩৩৯
গীতবিতান বার্ষিকী	স্বরলিপিপদ্ধতি	মাঘ ১৩৫০
সুরছন্দা	শান্তিনিকেতনে শিশুদের সংগীতশিক্ষা	জানুয়ারি ১৯৫৮

সমকালীন	রবীন্দ্রনাথের গান	পৌষ ১৩৬০
Gurudev Tagor Madras	Tagore S.ciety	The Music of Gurudev Tagore

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী কৃত গ্রন্থ সমালোচনা ফাল্গুন, ১৩১৪

সঙ্গীত-সুধা: শ্রীপ্রেমলতা দেবী প্রণীত। প্রবাসী, পৃ. ৭১৬-১৭

রচনার নিদর্শন

আদর্শ—"সেকালের মেয়ের সহিত একালের মেয়েদের তুলনায় সমালোচনা অনেকবার হইয়া গিয়াছে, সে চর্বিতচর্বণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যতই ইচ্ছা এবং চেষ্টা করি না কেন, ঠিক সেই ছাঁচে নিজেদের ফের ঢালাই করা, সেই সংস্করণ অক্ষরে অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত করা এখন অসম্ভব, ইহা নিশ্চিত। কারণ অধিকাংশ লোকই চারিপাশের চাপে গড়িয়া ওঠে, এবং সমাজ সেই চাপ দিবার যন্ত্র বিশেষ। এক এক সময় এই সামাজিক চাপে মেয়েদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কিন্তু স্বভাব কিংবা শিক্ষার গুণে কিংবা দোষে অধিকাংশ স্থলে তাহারা চীন-রমণীর পায়ের ন্যায় সেই চাপ অনুসারে নিজেদের গড়িয়া লয়—এমন-কি একটু ঢিলা পড়িলে অশান্তি বোধ করে, অভ্যাসের এমনি মহিমা। কোনো শংকরমহারাজের এক কলমের টানে, এক পরোয়ানার জোরে যদি একদিনে বাঙলাদেশে অবরোধ প্রথা রহিত হইয়া যায় (হায় রে সে দুরাশা!) তা হলে বাঙালির মেয়ে কি প্রথমে সত্য সত্যই সন্তুষ্ট হয়? যেমন 'স্বভাব ম'লেও যায় না' তেমনি স্বাধীনতা পাইলেই লওয়া যায় না—তাহার মূল্য বুঝিতে পারা, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারার জন্য আগে শিক্ষা দরকার। এবং সে শিক্ষার জন্য সময় দরকার। তবে সামাজিক মন বলিয়া যদি কোনো পদার্থ থাকে, তাহা অজ্ঞাতসারেও শ্রেয়ঃপথে চালবে, ইহাই আমাদের আশা ও প্রার্থনা। আমরা চাই—যতই অন্ধ ও দুর্বল-

ভাবে হউক-না কেন, তবুও আমরা চাই যে, যাহা সত্য তাহাই করি, যাহা ভালো তাহাই করি, যাহা সুন্দর তাহাই গড়ি। 'সেকাল গেছে বইয়া,' আর ফিরিবে না। এখন একালে কঃপন্থা-তাহাই জিজ্ঞাস্য।"… ('নারীর উক্তি' হইতে)

সংগীত পরিচয়—"ওস্তাদী গানের প্রতি সাধারণ অভক্তির আর এক কারণ, ওস্তাদদের কায়দাকানুন। তাঁদের অনাবশ্যক মুখভঙ্গী, হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী এক কথায় মুদ্রাদোষ, এবং পরস্পরের কূটতর্কে—যা প্রশস্ত সুন্দর রাজপথ হওয়া উচিত, তাকে এমনি কণ্টকিত জটিলারণ্যে পরিণত করেছেন যে, পথ-চলতি লোকের পাশ কাটিয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। বিদ্যামাত্রেরই একটা মজুরি ও শিক্ষানবিশি আছে, তা অর্থকরীই হোক আর শৌখিনই হোক। কিন্তু শিক্ষার চরম ফলের মধ্যে তার প্রথম শুষ্ক ও কঠিন অংশের সমস্ত চিহ্ন লোপ পাওয়া উচিত, যেমন চাষের ফলে নগ্ন রুক্ষ ভূমি স্বর্ণশস্যের মসৃণ রঙিন আস্তরণতলে অন্তর্হিত হয়। য়ুরোপীয়গণ একথা খুব বোঝেন এবং প্রথম থেকেই ছাত্রদের সংযত শোভন ভাব রক্ষা করবার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমাদের সংগীতাচার্যগণ কেন যে এদিকে লক্ষ রাখেন না বলতে পারি নে। কানে হাত না দিয়েও চড়া সুর নেওয়া যে অসম্ভব নয়, কিংবা উচ্চারণ ও মুখের ভাব যত বিকৃত হবে, সংগীত তত সংস্কৃত হতে যে বাধ্য নয়, তা তো হাতে হাতেই প্রমাণ করা যায়; বিশেষতঃ মেয়েদের সংগীতচর্চার সময় এ-সব বিষয় খুব সাবধান থাকা দরকার। সংস্কৃত কাব্যে দেখা যায় সেকালে রাজবাড়ির মেয়েদেরও গীতবাদ্য শেখাবার প্রথা ছিল, সুতরাং বোধ হয় তখন সংগীত-সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীশ্রীর একটা বিচ্ছেদ ঘটে নি। একালে আশা করি আমাদের মেয়েরা আবার সেই শুভসম্মিলন সাধন করবেন।"… ('হিন্দুসংগীত' হইতে)

রবিকাকা ও সবুজপত্র: "আমরা তখন বালীগঞ্জ রাইট ষ্ট্রীটের বাসায় থাকি।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও উনি[১৯] রবিকাকার কাছে প্রস্তাব করলেন যে একটি কাগজ বার করবেন এবং সেই পত্রিকাতে রবিকাকাকে নিয়মিত লিখতে হবে। আমাদের বাসায় তখন অনেকে আসতেন, সাহিত্যের নিয়মিত আড্ডা বসত। রবিকাকা প্রথমে কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, লিখে আর কি হবে, অনেক তো লিখেছি। এবার আমাকে ছুটি দাও। মণিলাল কিছুতেই ছাড়লেন না। মণিলালের নিজের একটি কাগজ ছিল। সেই কাগজটিকে নতুন আকারে নতুনভাবে প্রকাশ করবেন, উনি সম্পাদক থাকবেন এমন স্থির হল। অবশেষে রবিকাকা রাজী হলেন, বললেন, আচ্ছা লিখব। রবিকাকার লেখা নিয়ে কাগজ বেরুল, সবুজপত্র। বাংলা দেশে সেই কাগজ দীর্ঘদিন অবশ্য চলেনি। কিন্তু সাহিত্যিকদের কাছে তা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

দিন রাত্রি কাগজের কাজ চললো। সুরেশ চক্রবর্তী, এখন যিনি পণ্ডিচেরীতে আছেন, কাগজ চালাতে সাহায্য করলেন। মণিলাল দেখতে থাকলেন ব্যবসায়ী দিক আর উনি কাগজের সম্পাদকীয় দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেন।

রবিকাকার লেখা প্রতিবার বেরুতে লাগলো। বাংলা গদ্য এক নতুন চেহারা নিল। নানা বিতর্ক উঠল নানা পত্রিকায়—একটা ভয়ানক আলোড়ন চারদিকে। কিন্তু ওরা কেউ টললেন না। রবিকাকারও উৎসাহ বেড়ে গেল—একটা যেন জিদ চেপে গেল সবাইকার। প্রাচীনপন্থীরা একদিকে বিভিন্ন পত্রিকায় এদের গদ্য-রচনার নমুনা নিয়ে নানা আক্রমণ চালাতে সুরু করলেন। রবিকাকা অবশেষে নেতৃস্থানীয় পদ অধিকার করলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ও উৎসাহে সবুজপত্রের দল অনমনীয় মনোভাব নিয়ে পত্রিকা চালাতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে নতুন লেখকদের ভীড় জমতে লাগল, অতুল গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ,

[১৯] প্রমথ চৌধুরী

সবচেয়ে তরুণ অন্নদাশঙ্কর এরা এসে সবুজপত্রের পাতায় তারুণ্যের স্বাক্ষর রাখলেন। ..... ('উত্তরসূরি': রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮)

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী অনূদিত রবীন্দ্ররচনার তালিকা

[গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত]

রবীন্দ্রনাথের রচনা	ইন্দিরাদেবীকৃত নাম	পত্রিকায় প্রকাশ
গান		
১. কাঙালিনী : আনন্দময়ীর আগমনে	The Beggar Maid	Hindusthan Standard Annual, 1944 (H. S. A)
২. গুরুগোবিন্দ : বন্ধু তোমরা ফিরে যাও	Guru Govind	do, 1945
৩ শরৎ : আজি কি তোমার মধুর	Autumn	do, 1946
৪. হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে	On the shore of vast humanity	Viswa-Bharati Quarterly (V B Q) Jan. 1929 also H. S. A 1944
৫. জানি গো দিন যাবে	I Know my days will end.	Modern Revew Dec. 1929
৬. পঁচিশে বৈশাখ (রাত্রি হ'ল ভোর)	The Twenty fifth Vaisakh (It is the dawn)	H. S. A. ৪. 5 ; 1945 also V B Q May-July 1945
৭. ক্যান্ডীয় নাচ (সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যান্ডি-দলের নাচ)	Kandyan Dance	V B Q Nov. 1951-Jan. 1952

৮. ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ — V B Q Februa y-April 1949

৯. মোরা সত্যের পরে মন — Song of Truth V B Q Nov. 49-Jan 50

১০. এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু } Two Hymns V B Q Feb-Apr 1951

১১ বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি }

ছোটগল্প :

১. রাজপথের কথা — Tale of the High Road — V B Q May-July 1948

২. অনধিকার প্রবেশ — Trespass — H. S. PUJA Annual 1947

৩. মেঘ ও রৌদ্র — Cloud and Sun — V B Q Nov. 1950-Jan. 1951[৩০]

প্রবন্ধ[৩১] রবীন্দ্ররচনা	ইন্দিরা দেবীকৃত নাম	পত্রিকায় প্রকাশ
১ পল্লীগ্রামে	In the Village	H. S June 9. 6. 1946
২. মন	Mind	V B Q May-July 1946
৩. অখণ্ডতা	Indivisibility	V B Q August-Oct. 1946
৪. প্রাঞ্জলতা	Claril	V B Q Nov. 46-Jan. 47
৫. সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ	Complacency with regard to beauty	V B Q February-April 1947

৩০. ইহা 'Runaway and Other Stories' এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৩১. ১ হইতে ৭ সংখ্যক প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এবং ৮-সংখ্যক প্রবন্ধটি 'শিক্ষা' (১৯০৫) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই তালিকা সম্ভবতঃ পূর্ণাঙ্গ নহে। রবীন্দ্রনাথের আরও বহু রচনার অনুবাদ ইন্দিরা দেবী করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহাদের কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। যথা,—রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থের অনূদিত পাণ্ডুলিপি।

৬.	ভদ্রতার আদর্শ	The Standard of Politeness	V B Q February-April 1948
৭.	অপূর্ব রামায়ণ	The New Ramayana	V B Q Nov. 47-January 48
৮.	শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান	The place of Music in Education and Culture	V B Q May-October 1947

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

'আনন্দ-সংগীত পত্রিকা'য় প্রকাশিত
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী-কৃত
স্বরলিপির তালিকা

	রচয়িতা	প্রথম পঙক্তি
১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা	বেদগান	শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা।
২য় সংখ্যা	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	যেদিন সুনীল জলধি।[৩২]
৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	নব বরষের আজি প্রথম প্রভাত।[৩৩]
৬ষ্ঠ সংখ্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
	হিন্দী ভজন	মামক মানস।
৭ম সংখ্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে।
৮ম সংখ্যা	ঐ	প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে।

৩২. এই সংখ্যায় এই গানের অন্য স্বরলিপিটি করিয়াছেন প্রতিভা দেবী।

৩৩. এই গানের সুরকারও ইন্দিরা দেবী।

৯ম সংখ্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	তোমারি নাম বলব।
১১শ সংখ্যা	ঐ	যদি প্রেম দিলে না প্রাণে।
	ঐ	তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে।
১২শ সংখ্যা	প্রমথনাথ চৌধুরী	আজি সহসা বরষা এল বিমান-চারী।
২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মোরা সত্যের পরে মন।
২য় সংখ্যা	ঐ	আমি চিনি গো চিনি তোমারে।
৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা	ঐ	এই লভিনু সঙ্গ তব।
	ঐ	তুই কেবল থাকিস্ সরে সরে।
	ঐ	তোমার কাছে শান্তি চাব না।
৬ষ্ঠ সংখ্যা	ঐ	পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই।
৭ম সংখ্যা	ঐ	কে গো অন্তরতর সে।
৮ম সংখ্যা	ঐ	নয় এ মধুর খেলা।
	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	জীবনটা ত দেখা গেল।
৯ম সংখ্যা	ঐ	পাগল কে যে পাগল ভাবে।
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
১০ম সংখ্যা	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	করুণাময়, দীনবৎসল, দীনহীনে দাও দরশন।
২২শ সংখ্যা	হিন্দী (শিখ) আরতি	এ হরি সুন্দর এ হরি সুন্দর।
৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার।
	ঐ	অসীম ধন তো আছে তোমার।
২য় সংখ্যা	ঐ	আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে।
	ঐ	ওগো শেফালি বনের মনের কামনা।

৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ওদের সাথে মেলাও।
	ঐ	মেঘের কোলে রোদ হেসেছে।
	ঐ	রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি।
	ঐ	জানি জানি গো দিন যাবে।
	ঐ	ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু।
৫ম সংখ্যা	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	যদি এমনে সঙ্গোপনে শুনাও তব বাণী।
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই।
৬ষ্ঠ সংখ্যা	ঐ	কেন চোখের জলে ভিজিয়ে।
৭ম সংখ্যা	ঐ	আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
৮ম সংখ্যা	ঐ	তোমায় আমায় মিলন হবে বলে।
১০ম সংখ্যা	ঐ	তোমার এই মাধুরী।
১১শ সংখ্যা	ঐ	আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে।
	ঐ	কাল রাতের বেলায় গান এলো।
	ঐ	সকাল সাঁঝে ধায় যে ওরা।
১২শ সংখ্যা	ঐ	নাইরে বেলা নামল ছায়া।
৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা	ঐ	মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে।
২য় সংখ্যা	ঐ	যখন তুমি বাঁধছিলে তার।
৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা	কোন খৃষ্টানের গান	তেরা নাম হ্যায় ত্রাণকর্তা।
৫ম সংখ্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে।
	ঐ	মেঘ বলেছে যাব যাব।

৬ষ্ঠ সংখ্যা	বেদগান	য আত্মদা বলদা ।[৩৪]
৭৯-ম সংখ্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আমরা সকল কাঁটা ধন্য করে ।
	ঐ	শরৎ আলোর কমল বনে ।
	ঐ	যেতে যেতে একলা পথে ।
১০ম ও ১১শ সংখ্যা	ঐ	শুধু তোমার বাণী নয় গো ।
	সেতারের গৎ	রাগ—হাম্বীর কাওয়ালি ।
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সারাজীবন দিল আলো ।
১২শ সংখ্যা	ঐ	ভুবন জোড়া আসন খানি ।
	ঐ	শেষ নাহি যে শেষ কথা ।
১৩-১৪শ সংখ্যা	ঐ	এই যে কালো মাটির বাসা ।
	ঐ	আমার সকল রসের ধারা ।*
	ঐ	পথ দিয়ে কে যায় গো চলে ।*
	ঐ	না হয় তোমার যা হয়েছে তাই হল ।*

[৫ম বর্ষে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী কোন স্বরলিপি করেন নাই ; এই বৎসরের প্রধান স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গানের সুরের আসন খানি ।
২য় সংখ্যা	ঐ	ওগো দখিন হাওয়া ।
৫ম সংখ্যা	ঐ	ওগো নদী আপন বেগে ।

৩৪ সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

* তারকা চিহ্নিত গানগুলি ৫ম বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে ।

ভ্রমক্রমে ৫ম বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা ৪র্থ বর্ষের ১৩শ ও ১৪শ সংখ্যারূপে চিহ্নিত ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা	ঐ	ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে।
৭ম সংখ্যা	ঐ	মোদের যেমন খেলা তেমনি কাজ।
৮ম সংখ্যা	ঐ	আমাদের পাক্‌বে না চুল।
১০ম সংখ্যা	ঐ	আমরা খুঁজি খেলার সাথী।
১২শ সংখ্যা	ঐ	ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো।
৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা	ঐ	আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়।
১১শ সংখ্যা	ঐ	ভাল মানুষ নইরে মোরা।
৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা	৺ প্রতিভা দেবীর স্মৃতি উৎসবে	যে দেবীর বর-পুত্রী

[রচিত গান]

[এই গানের সুর ও স্বরলিপি করিয়াছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২য় সংখ্যা	স্বরলিপি	[প্রবন্ধ]
৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা	আমাদের গান	[প্রবন্ধ]

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র

তৃতীয় পরিশিষ্ট ওঁ **শান্তিনিকেতন**

কল্যাণীয়াসু

এইমাত্র তোর চিঠি পেলুম। জবাব প্রত্যাশা করিসনে লিখেছিস্ কিন্তু আমার গ্রহের দাবী অন্যরকমের। একটু খোলসা করে বলি।

বক্তৃতা নিয়ে মনটা কলমটা নিরন্তর যখন ব্যস্ত এবং যখন তার সহযোগে অন্যান্য দায় চারিদিকে অসম্ভব ভিড় করে দাঁড়িয়েছে এমন সময় তোদের ননী-গোপালের চিঠি এল। এই সমস্ত চিঠি রক্ষার দায়িত্ব ছিল অমিয়ের। এখন আমার অনবধানী মন নিয়ে আমি আছি অসহায়। দরকারী কাগজপত্র দৃষ্টিপথ থেকে

তিরোধান করচে ক্ষণে ক্ষণে। এমন কি স্মৃতিপথ থেকেও। আমার বয়সে সেটাতে অসামান্যতা প্রকাশ পায় না। ননীর চিঠিখানি আমার ঘরের প্রভূত উচ্ছৃংখলতার মধ্যে কোনো এক অংশে নিশ্চিত আছে, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধিগোচর নেই—অস্তীতিব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

এখন আমি তোর শরণাপন্ন। অসৌজন্য অপবাদ থেকে আমাকে উদ্ধার করিস্। ননীকে বুঝিয়ে বলিস ব্যাপারখানা,—তার চিঠিতে কী প্রশ্ন বা কী অনুরোধ ছিল তা যদি আর একবার আমাকে জানায় তাহলে তার চিঠির দ্বিতীয়-বার বিলুপ্তি ঘটবার পূর্বেই আমি তৎসম্বন্ধে আমমর কর্তব্য পালন করবই।

রথী মাঝে বেশ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আসল কারণ নিরন্তর উদ্বেগের তাড়না। সকল বিভাগেই লক্ষ্মীর অকৃপা। ওদিকে ক্ষিতির পুত্র ক্ষেমেন্দ্র আদি ব্রাহ্ম সমাজের মাসিক প্রাপ্য দাবী করে নিরন্তর পত্র লিখচে, পত্রের ভাষা উত্তরোত্তর কঠোর হয়ে আসচে। সুরেনকে কী বলব, দিতে হবে আমাকেই। কিন্তু কোন্ তহবিলে উদ্বৃত্ত আছে। জমিদারীর বাঁটে দুধ বন্ধ। অবশেষে কলম চালিয়ে জীবিকা নির্বাহে মন দিতে হয়েচে। যে বয়সে কলম সহজে চলত সে বয়সে সংসারও চলত সহজে। এখন দুইই অচল হয়ে এল। এর উপরে বেগার খাটুনি। ন বৌঠান ন বৌমা প্রভৃতির কাছ থেকে করুণ পত্র আসচে। রথী বোধ হয় শূন্য প্রায় ঝুলি থেকে নেপুকে কিছু টাকা দিয়েচে। সব পাওনাদারই জানে সুরেনকে কিছু বলা মিথ্যে। আমার এখনো হাড়ে অল্প একটু মাংস লেগে আছে। কিন্তু আর কত দিন? দুইপক্ষের দেনা যদি আমাকেই বহন করতে হয় তাহলে কোথায় দাঁড়াব? রথী মাথা ঘুরে শয্যাগত হয়ে পড়ে, আমার মাথা ক্লান্ত। তবু অন্ধ্র য়ুনিভার্সিটির জন্যে থোড়া লেখনী নিয়ে লেকচার লিখচি কিছু পাওনা আছে বলে। এক সময়ে রোগের সৃষ্টি করে ইস্কুল থেকে পালাবার চেষ্টা করতুম—আজও অসহিষ্ণু হয়ে সংসার থেকে পালাতে ইচ্ছে করি কিন্তু এমন শরীর পেয়েছি যে বজ্রাঘাত ছাড়া কিছুতেই কিছু

হবার নয়। দুঃখের কথাগুলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ননীগোপালের হারানো পত্রখানার প্রসঙ্গে। ভাগ্যে চিঠির জায়গা ফুরিয়ে এসেচে নতুবা পত্রখানা আরো শোকাবহ হয়ে উঠত। ইতি ১১সেপ্টেম্বর .৯৩৩

রবিকাকা

খামের উপর ঠিকানা :

কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

2) mayfair

Balleygunge

Calcutta.

ওঁ "UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু [পোস্টমার্ক ২০মে ১৯৩৪]

সুরেনের কথা শুনে অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে গেল। কী করব তাই ভাবচি। রথীর দেনা দিন বিশ্বভারতীর কাছে, সেই জন্যে তার পরিবর্তে জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিশ্বভারতীকে দিয়েছে—তারা শুনচি বিক্রি করবার চেষ্টায় আছে—সেই কথাবার্তাই চলচে। ওটা বিক্রি হলে আমাদের স্থায়ী বাসস্থান হবে শান্তিনিকেতনে। পুরানো বাড়িটা তেতালা ও দোতলা বিশ্বভারতী কত ভাড়ায় দিতে পারে তার সন্ধান নেব। যদি আড়াইশো টাকার কম ভাড়ায় হয় তাহলে হয়তো সুরেনের কিছু সুবিধা হতে পারে—কিন্তু এতে আমাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। বিশ্বভারতীর পক্ষের যাঁরা এই বাড়ি বিক্রি ও ভাড়ার ভার নিয়েছেন বর্তমানে তাঁদের অভিপ্রায় কী আমি ঠিক জানিনে। যাই হোক ভালো লাগচে না।

বোধ হচ্চে এই শরীরটার খবর চাস্—একটুখানি ভালো আছে। আরো কিছু দিন থাকলে আরো ভালো হবার আশা করি। কিন্তু সংসারটা একটুও

মনোরম বলে বোধ হচ্ছে না। দীর্ঘ জীবনকে বিধাতার প্রসাদ বলে গ্রহণ করতে পারিনে। ইতি ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

রবিকাকা

জোড়াসাঁকোর বাড়িটা নিয়ে কিছু করতে পারব বলে আশা নেই—অত্যন্ত বেদনা বোধ হচ্ছে।

খামের উপর ঠিকানা

কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

2/1 Bright Street

Balleygunge

Calcutta.

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর অপ্রকাশিত পত্র

চতুর্থ পরিশিষ্ট

ওঁ

কমলালয়, বালিগঞ্জ

পুষ্পোপরি অঞ্জলিবদ্ধ করের ছবি
নববর্ষের প্রণাম

বৃহস্পতিবার, ১০ই
চৈত্র শেষ, ১৩৩৬
বিবি + প্রমথ

শ্রীচরণেষু

এই সঙ্গে তোমাকে আমাদের নববর্ষের প্রণাম এবং তোমার শুভজন্মদিনের প্রণাম, একসঙ্গে করে' পাঠাই। এই সোমবার ১লা নববর্ষ, এবং তার পরে যথাক্রমে ২৫শে বৈশাখ - দুয়ের মাঝামাঝি সময়ে তুমি এ চিঠি পাবে। তোমার অক্ষয় স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু আমাদের আন্তরিক কামনা তা'ত জানই, আর বেশি বলা বাহুল্য।

এর মধ্যে তোমাকে যে কাগজ পাঠাচ্ছি, সেটা পড়লেই "সমস্ত অবগত" হবে।

কাল রবীন্দ্র পরিষদে তোমার গ্রন্থাগার "উদ্বাটন" করা হল। প্রথমে প্রিয়কে সভানেত্রী হতে বলেছিল, কিন্তু তার অসুখ হওয়ায়, অতুলবাবুর ছেলে প্রতুলের "সনির্বন্ধ" অনুরোধে আমাকেই হতে হল। যদিও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যে বলার জন্যে আমাদের মত লোকের একটু "কলিজার" তাকত আবশ্যক হয়। ওঁদের মতে ত যা 'বলেছি স্থান কাল পাত্রোপযোগী হয়েছে। তোমার বাঙ্গালা বই এবং গুটি কত ইংরিজী বই একটা টেবিলের উপর রেখেছিল, আর বেদীর উপর ফুল, ধূপধুনো দীপ, প্রবেশ পথে মঙ্গল ঘটাদি রেখেছিল। এই সঙ্গে একটা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাই। আমার লেখায় অনেক কাটাকুটি আছে, তবে তুমি বুঝে নিতে পারবে।

প্রথমে সভাপতি সুরেন্দ্রবাবু কিছু বল্লেন :—অসুখের পর ডাক্তারের নিষেধ না মেনে এই প্রথম উঠে এসেছেন, বক্তৃতা "করব না" ২ বলেও বড় মন্দ বল্লেন না। বই বাড়ী নিয়ে গেলে "অবস্থা, দুরবস্থা বা ব্যবস্থা" যাই হোক্ একটা হয় বলে' এখনেই তালাচাবির মধ্যে থাকবে ; যদিও কবি নিজে বলেছেন (?) যে মেয়েদের "আলতা-চুড়ি" প্রভৃতি স্থানই বইয়ের পক্ষে লোভনীয়, ইত্যাদি তাঁর আমন্ত্রণে আমি নেত্রীর আসনে বসে' বা দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য বল্লুম বা পড়লুম পরে ওদের নির্দিষ্ট তালিকা মতে গান ও কবিতা-পাঠ হল। গাইয়ের মধ্যে পঙ্কজ মল্লিকের গলাই বেশ ভাল লাগল' জোরালো এবং সুরেলা। আর সব পাঁচ পেঁচে, একটি মেয়ের গলা বড় মিনমিনে। "তালের বনের করতালি", "বসন্তে আজ গাঁথুলে আমার জয়ের মালা" প্রভৃতি গান একটু ফূর্তি করে' না গাইলে ভাল লাগে না। আর কথাও যেখানে সেখানে যা'-তা' বসায়, —"নীল অম্বরে নিলহরি", "মোর হৃদয়ের পথতলে, চঞ্চল আসে অলি'—দু'বার "অলি", দু'বার "চলি" বল্লে। মেয়েটাও (পুষ্প সান্যাল) "না-জানা কোন্ বীণা", "না-শোনা কোন্ রাগরাগিণী শূন্য ডালে" প্রভৃতি যা' মুখে এল তাই বল্লে। একবার ভেবে দেখে না কথাগুলোর মানে কি। মনে না থাকে ত বই আনলেই হয়,

যেমন পঙ্কজ এনেছিল। সে দু'একটা নতুন গান গাইলে,—"চৈত্র মাসের উতল হাওয়া" (আরম্ভটা ভুলে যাচ্ছি) আর একটা "বসন্তে" দিয়ে আরম্ভ। সবই বসন্তের গান। "বসন্ত" "শেষ মধু" প্রভৃতি কবিতা পাঠ, কালিদাস নাগ, সোমনাথ, আর দু'একটি ছেলে করলে। ৬॥ টা থেকে ৮॥ টা পর্যন্ত চল্‌ল। আমাদের দোষই হচ্ছে বেশি দীর্ঘ করে' ফেলি। শেষে বইগুলি নেড়ে চেড়ে দেখলুম। অনেকগুলির নতুন সাজে দেখিনি, প্রায় সবই চটি। কেবল "মহুয়ার" একটু জাঁকালো গোছের চেহারা।

এখানকার সবই অসুখ, আর কি খবর দেব, ধনে প্রাণে লোক মরছে। গগনদার হাত পা চলছে, কিন্তু এখনো কথা বন্ধ। কৃতীরও শরীর ভাল নেই। সৌম্যের সঙ্গে কি দেখা হয়েছে? আজও ত মীরাট কেসে তার চিঠির কথা বেরিয়েছে শুনছি। চারু বৌঠান যাবার জন্যে ব্যস্ত, কিন্তু অর্থাভাব, ধারও পাওয়া শক্ত। সরোজিনী বৌঠান খুব অসুস্থ। বাণীর বউভাত ও বিয়েতে গেলুম। বর কালো, কিন্তু ভালো শুনছি। মেজ দেবরটি সুপুরুষ, তার উপর অনেকের নজর আছে, রোজকারও করে শুনতে পাই। মস্ত পরিবার। সুরেন এক "নির্বাচন দ্বন্দ্ব" জড়িয়ে কতকগুলো টাকা নষ্ট করলে, কংগ্রেস পক্ষেরই জয় হল। আমরা ছোট বাড়ীতে উঠে এসে বড় বাড়ীটা দু'বছরের জন্যে ভূপতি সেনদের ভাড়া দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

তোমাদের সঙ্গে সুহৃৎ হঠাৎ ভেসে পড়ায় এখানে একটা হৈ চৈ পড়ে' গিয়েছিল, কিন্তু যদি তার কোন ক্ষতি না হয়, আর রথীর উপকার হয় ত সোনায় সোহাগা। অমিয়কে বল' তার লম্বা চিঠি সকলে মিলে উপভোগ করছি। তাদের ও রথী-প্রতিমা সকলকে নববর্ষের আশীর্বাদ জানিও। অবসরমত তোমার একআধটু খবর দিও।

স্নেহঃ, বিবি—

ওঁ

কমলালয়, বালিগঞ্জ

বুধবার, ১৮।৬।৩১

শ্রীচরণেষু

গত মেলে তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। যদিও আমরা যা' বিশেষভাবে জানতে ব্যস্ত, অর্থাৎ তোমার শারীরিক অবস্থা, সে বিষয়ে কখনো কিছু লেখ না। এ স্থলে মৌনংকে স্বাস্থ্য লক্ষণং বলে' ধরে' নিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতুম; দুঃখের বিষয় প্রমাণাভাবাৎ সেটা অসিদ্ধ। অবশ্য মানসিক অবস্থাটা ভাল বোধ হল, সেটা সুখের বিষয়। সেইটেই একমাত্র সুখের বিষয় হতে পারত, যদি শরীরের জন্য সর্বদা একটা ভয়, এবং তোমার তৎপ্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে এতটা অ-ভরসা না থাকত।

তোমার আসল পরিশ্রমের কাজ, বা বক্তৃতা দেওয়াটা হয়ে গেল, সেইটে মন্দের ভাল। আর পারিশ্রমিক যথেষ্ট মিলেছে, সেটা খুবই ভাল। আমাদের এখানে কাগজপত্রে কখনো এক আধটু করতালির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এসে পৌঁছায় মাত্র; তাতে ব্যাপারটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না, কাজেই তোমার লিখিত বা মৌখিক বর্ণনার অপেক্ষায় থাকতে হয়। বক্তৃতাগুল (দুটো?) কি কোথায়ও বেরবে না? বিশ্বভারতী পত্রিকার পক্ষে কি বেশি বড়? আজকাল বুঝি সেটা সুরেনের হাতে নেই, প্রশান্তের হাতে গেছে? শেষ একটা এসেছে দেখছি' এখনো খুলে দেখতে পারিনি, তার কারণ পত্রিকার বাহুল্য, এবং সময়ের অবাহুল্য।

ছবি সম্বন্ধে আমি কিছু বুঝিনে, তবে তোমার ছবির আদর হয়েছে শুনে খুশি হই অবশ্য। এটুকু বুঝি যে চিত্রা-বিচিত্রা এখন তোমার বৃদ্ধ বয়সের তরুণী প্রেয়সী, কাজেই কলমের চেয়ে আপাতত তোমার কাছে তুলির আদর বেশি, এবং সে সম্বন্ধে নূতনের সলজ্জ সঙ্কোচ এখনো কাটে নি। তবে তুমি কলমটাকেই তুলি বানিয়েছ, তাই পুরাতন ভৃত্যকে বরখাস্ত করেছ বলা যায় না, বরং তাকে ও সেই সঙ্গে নিজেকে পুনর্জন্ম দিয়েছ। রথী মাঝে ২ ওখান-

কার একটা ফরাসী কাগজ পাঠায়, তা'তে ওদিককার কিছু২ হালচাল বোঝা যায়। প্রথম দু'টোতে লবণ-অভিযানাদির আনুপূর্বিক বর্ণনা ছিল, যদিও এদেশে লেখার তারিখের ২।৪ দিনের মধ্যেই কি ক'রে ও-দেশে প্রকাশিত হয় বোঝা শক্ত, বিশেষতঃ ছবি সমেত। তৃতীয়টাতে তোমার ছবি সম্বন্ধে একটা প্রশংসা-পত্র আছে। তা'তে প্রথম খাতায় কাটাকুট থেকে আরম্ভ করে' ক্রমশঃ তোমার চিত্র-শিল্পের কি রকম পরিণতি হ'ল, সেটা বেশ দেখিয়েছে [।] আমি ওঁকে বল্‌ছিলুম "রূপম্"-এর জন্যে সেটা তর্জমা করে' দিতে, তবে বল্‌ছিলেন বড় শক্ত।

মণ্টু আমাদের ঘাড়ে অনেক রকম কর্তব্য চাপিয়েছে তা'ত শুনেইছ। তোমার গোটা দুই কথোপকথন আছে, তার মধ্যে একটা প্রায় সম্পূর্ণ তার, আর একটা প্রায় সম্পূর্ণ তোমার। প্রথমটা মেয়েদের সমাজে স্থান ও বিশেষত্বাদি নিয়ে; দ্বিতীয়টা আর্টের ব্যাখ্যা, ও প্রবাসীতে বেরিয়েছিল, সেটা সুরেন তর্জমা করে' দিলেন। এ দুটোতে বাদ সাদ দেবার কিছু নেই। মণ্টুর স্বলিখিত ভূমিকাটি সুরেন অনেকটা ছেঁটে সংক্ষেপ করেছেন। তারপর তোমার গোটা আণ্টেক চিঠি আছে, তার থেকে কতকাংশ বাদ দিতে হয়েছে। গান্ধী সম্বন্ধে যেটা, সেটা ত মণ্টু একেবারে বাদ দিতে বল্‌ছে, দিনকালের গতিক দেখে। আর একটায় সতীত্ব সম্বন্ধে কিছু "স্পষ্ট কথা" আছে, সেটাও বিবেচ্য। সবগুল দেখা হয়েছে, এখন টাইপ হয়ে এলে মণ্টুকে পাঠাবার আগে ওর হাতে কাটছাঁটের ভারটা শেষ দেব, তাহলে বোধ হয় বেফাঁস কিছু বেরবার আশঙ্কা থাকবে না।

আমাদের সমভাবে চল্‌ছে। অত্যন্ত গরম, তবে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের সঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে, আমরাও মেঘদূতে পড়তে সুরু করেছি। বড় বাড়ীটা ভূপতি সেনদের ভাড়া দিয়েছি, তারা বেশ ভদ্রলোক, ছোটতে একরকম গুছিয়ে বসেছি, একটু অকষ্টবদ্ধ ভাবে।

সুহৃৎ ছেড়েছে, আর দিন দশেকের মধ্যে বাড়ী পৌঁছবে আশা করছি। রথী কি বেশ সেরে উঠেছে? Torquayতে মাস দুই থাকবে শুনছি। সুধীরের

একটু খোঁজ কর', যখন লণ্ডনে যাবে। রথীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দিনুরা পাহাড় থেকে ফিরেছে।

ভাল কথা, Harrap কোং "চার ইয়ারী" ছাপতে রাজি হল না বলেই অবশ্য আমরা দুঃখিত। তবে একেবারে হতাশ না হয়ে মন্টুকে পাঠিয়েছি। তার American প্রকাশককে পাঠাবার জন্য। দেখা যাক্ এবার কি হয়। আশা-বাধিঃ কো গতঃ। এ সব সংস্কৃত বুকনি বোধ হয় মেঘদূত পড়বার ফল। প্রণাম জেনো।

স্নেহঃ বিবি

ওঁ

সত্যধাম, মোরাবাদী

১৮।১১।৩১

শ্রীচরণেষু

তোমরা ২।৪ দিন কলকাতায় আছ শুনে এই চিঠি ও কাগজপত্র সেই ঠিকানায় পাঠাচ্ছি। কিছুদিন হল মটুরীর মেয়ে রিটা (অমৃতা) এগুলি সিমলা পাহাড় থেকে আমাকে পাঠিয়েছে। তোমার দেখতে ভাল লাগবে মনে করে' তোমাকে পাঠাচ্ছি। পড়ে' ছিঁড়ে ফেল, আমি উত্তর দিয়ে দিয়েছি। কেবল সে যা' জানতে চেয়েছে তোমার কাছে জেনে তবে সঠিক জানাব বলেছি। তোমার নাটকের ইংরিজী অনুবাদ কি ২ আছে? আমার মনে পড়ছে (1) Kings Queen (2) Post-Office (3) King of the Dark Chamber (4) Red Oleanders (৫) Sacrifice—এছাড়া কি ২ আছে আমাকে একটু লিখে জানিও ত, বা কাউকে লিখে দিতে বল'। আমি তাকে বলেছি যে বিশ্বভারতী অফিসে এক লাইন লিখলেও জানতে পাবে। সে এক নাটকাভিনয় উপলক্ষ্যে সর্বজাতিধর্মসমন্বয় ও সকলকে আনন্দ দিয়ে ভালই করেছে লিখেছি। মেয়েটা চালাকচতুর উজ্জ্বল আছে, দেখতেও মন্দ না। তবে এখন জীবনরঙ্গমঞ্চে নিজে অবতীর্ণ হলেই হয়।

আমরা মাসখানেক হল এখানে এসেছি ও আসছে শনিবারে বাড়ী রওনা হব মনে করছি। প্রথম দিন পনেরো নলিনীরা সপরিবারে থাকায় গুলজার ছিল, তারপর থেকে চুপচাপ যাচ্ছে। তা'তে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কারণ কাজেকর্মে দিন কেটে যায়; তবে ওঁর একটু একলা ২ লাগে। তা ছাড়া মায়ের অসুখ নিয়ে এসেছি, সেই ভাবনাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। মাস ২।৩ থেকে একটা পেটে ব্যথা নিয়ে ভুগছেন, বদ-হজমের বলেই বোধ হয়; কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই আশানুরূপ উপকার হচ্ছে না। কলকাতায় দিনকতক অ্যালপ্যাথি করা গেল। এখানে এসে অবধি কবিরাজী, সেই সঙ্গে কিছু অ্যালপ্যাথি চলছিল। লেখক ধনগোপাল মুখুয্যের ভাই যদুগোপাল ডাক্তার এখানে একটু নাম করেছেন, তাঁকে ২।৩ বার ডাকা হয়েছিল। তিনি আবার আয়ুর্বেদীয় ওষুধের পক্ষপাতী, কবিরাজকে পরামর্শ দেন কি ওষুধ দিতে হবে। তারপর আবার হপ্তাখানেক থেকে এক বায়োকেমিষ্ট আসছেন, তাঁর ওষুধের সঙ্গে অন্য গুলও চলছে। আমি ত এতগুল মিশ্রণের পক্ষপাতী নই, তবে ব্যাথাটা যাচ্ছে না বলে' মা ব্যস্ত হয়ে এটা সেটা করেন। আসল কথা বয়স হয়ে পাকস্থলির সব শিথিল ও অসাড় হয়ে পড়েছে, তাই শীঘ্র কোন উপকার পাওয়া শক্ত।

আমাদের ত এই খবর, খুব উজ্জ্বল নয়। কিছুদিন থেকে দিন বেশ উজ্জ্বল পাচ্ছি বটে, সেটা যথালাভ, কিন্তু মনের মিল না পেলে প্রকৃতি একা কি করবে?—তোমাদের শরীর ভাল আছে আশা করি। কষ্ট হয়ত উত্তর দিও না। একদিন প্রশান্ত ও রাণী দেখা করতে এসেছিল। আমাদের প্রণাম জেন। রথী-প্রতিমাদের আশীর্বাদ।

স্নেহঃ বিবি

[একটি পোষ্টকার্ড, পোষ্টমার্ক ৩১ জানুয়ারি ৩৩]

ওঁ কমলালয়, বালিগঞ্জ, ৩ শে

শ্রীচরণেষু

তোমাকে একটা সামান্য কথা নিয়ে বিরক্ত করতে বাধ্য হলুম। পরের ধন্ধা অবশ্য।

শ্রীমতী বীণা আড্ডি কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোংয়ে তোমার চারটি গানের রেকর্ড দিতে ইচ্ছা করেন :—(১) সুন্দরী রাধে (২) ভরা বাদর (৩) গ্রাম ছাড়া (৪) মন মাঝি। কোম্পানি নিতে রাজি আছেন। যদি তাঁদের কাউকে কিছু ফী না দিতে হয়, কারণ কি রকম চলবে তাঁরা জানে না। এখন তোমার এই গান কয়টি বিনা পয়সায় ব্যবহার করতে দিতে তোমার মত আছে কি' না, তাই মিস: আড্ডি জানবার জন্য ব্যস্ত, কারণ সে [ন] সাহেব এখানে এসেছে, এবং তাকে তাগাদা করছে।

আর একবার বুঝি নলিনীকে দিয়ে এ বিষয় খোঁজ করিয়েছিল কিন্তু উত্তরটা পরিষ্কার বুঝতে পারেনি। তা'তে যেন বুঝিয়েছিল যে তোমার [২] যা পাওনা সেটা আড্ডিকে কিছুতেই দিতে পারে না, বা দেবে না। কিন্তু তা ঠিক নয়; আমি যতদূর বুঝলুম কথাটা হচ্ছে তারা কাউকে কিছু দিতে রাজি নয়; অমনি পায় ত গানগুলের রেকর্ড করবে, নয়ত নয়।

তোমার অভিপ্রায়টা অমিয়কে দিয়ে এক লাইনে আমাকে জানালেই হবে; নিজে কষ্ট করে' লেখবার দরকার নেই। যদি না মনে হয় যে লিখিত অনুমতি হলেই ভাল হয়।

তুমি অসুস্থ অবস্থায় আর বৃষ্টির মধ্যে বোলপুর গেলে শুনে খারাপ লাগুল। আশা করি এখন শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল আছে, আর তার উপর বেশি অত্যাচার করছ না। গৃহপ্রবেশ কেমন হল? এখানে এক প্রকার ভাল। প্রণাম জেন। স্নেহঃ বিঃ

ঠিকানা :—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শ্রীচরণেষু/কোণার্ক/

শান্তিনিকেতন পোঃ আঃ/Birbhum.

স্নেহ-উপহার

শ্রীমতী ইন্দিরা—

প্রাণাধিকাসু

বাবলো।

আয়রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ পানে,
হাসি-খুসি প্রাণ খানি তোর প্রভাত ডেকে আনে।
আমায় দেখে আসিস্ ছুটে, আমায় বাসিস্ ভালো,
কোথা হ'তে পড়লি প্রাণে তুই রে ঊষার আলো!
দেখ্‌রে প্রাণে, স্নেহের মত, শাদা শাদা জুঁই ফুটেছে।
দেখরে, আমার গানের সাথে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে গেছে।
গেঁথেছিরে গানের মালা, ভোরের বেলা বনে এসে
মনে বড় সাধ হয়েছে পরাব তোর এলোকেশে।
গানের সাথে ফুলের সাথে মুখখানি মানাবে ভাল,
আয়রে তবে আয়রে মেয়ে দেখ্‌রে চেয়ে রাত পোহালো!
কাঁচ মুখটি ঘিরে দেব ললিত রাগিণী দিয়ে,
বাপের কাছে মায়ের কাছে দেখিয়ে আস্‌বি ছুটে গিয়ে!
চাঁদিনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখখানি তোর মনে পড়,
তোর কথাটাই কিলিবিলি মনের মধ্যে নড়ে চড়ে!
হাসি হাসি মুখখানি তোর ভেসে ভেসে বেড়ায় কাছে,
হাসি যেন এগিয়ে এল, মুখটি যেন পিছিয়ে আছে!
কাঁচ প্রাণের আনন্দ তোর, ভাঙ্গা বুকে দে ছড়িয়ে,
ছোট দুটি হাত দিয়ে তোর, গলাটি মোর ধর্ জড়িয়ে!

বিজন প্রাণের দ্বারে ব'সে করবিরে তুই ছেলে খেলা,
চুপ করে তাই বসে বসে দেখ্‌বে আমি সন্ধেবেলা।
কোথায় আছিস্‌ সাড়া দেরে, বুকের কাছে আয়রে তবে,
তোর মুখেতে গানগুলি মোর কেমন শোনায় শুনতে হবে !
আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাব্‌লা গাছের মত,
বড় বড় কাঁটার ভয়ে তফাৎ থাকে লতা যত।
সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখী,
(আমার) কাঁটা ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থাকি !
নেইবা লতা এল কাছে, নেইবা পাখী বসল শাখে,
যদি আমার বুকের কাছে বাব্‌লা ফুলটি ফুটে থাকে !
বাতাসেতে দুলে দুলে ছাড়িয়ে দেয়রে মিষ্টি হাসি,
কাঁটা-জন্ম ভুলে গিয়ে তাই দেখে হরষে ভাসি !
দূরে কর ছাই, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি কত কি যে ?
কথাগুলো ঠেক্‌চে যেন চোখের জলে ভিজে ভিজে !

[গ্রন্থোৎসর্গ ঃ প্রভাত সংগীত] রবিকাকা

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা

মাগো আমার লক্ষ্মী

মনিষ্যি না পক্ষী !

এই ছিলেম তরীতে,

কোথায় এনু স্বরিতে।

কাল ছিলেম খুলনায়,
তাতে ত আর ভুল নাই,
কলকাতায় এসেছি সদ্য,
বসে বসে লিখ্‌চি পদ্য।
তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অম্‌নি এক্‌-রকম
খোপে ব'সে পায়রা যেন
করচি কেবল বক্‌বকম!
বৃষ্টি পড়ে টুপুর্‌ টুপুর্‌
মেঘ করেছে আকাশে;
উষার রাঙা মুখখানি গো
কেমন যেন ফ্যাকাসে!
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই
দুওরগুলো ভ্যাজানো,
ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন!
পক্ষীটি সেই ঝুপ্‌সি হয়ে
ঝিমচ্চেরে খাঁচাতে
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে!
ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য পোড়ে বিছেনা,
কাহার তরে কেঁদে মরে
সে কথাটা মিছে না।

বইগুলো সব ছড়িয়ে পোড়ে
নামু লেখা তায় কার গো !
এম্‌তি তারা রবে কিরে
খুল্‌বে না কেউ আর গো !
এটা আছে সেটা আছে
অভাব কিছু নেইত—
স্মরণ ক'রে দেয়রে যারে
থাকে নাক সেই ত !
বাগানে ঐ দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে রাশি রাশি,
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
যা'রে যা'রে ভালবাসি !
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ফুল কে আমায় দিত মেলা,
বিছেনায় কার মুখটি দেখে
সকাল হত সকাল বেলা !
জল থেকে তুই আসবি কবে
মাটির লক্ষ্মী মাটিতে
ঠাকুরবাবুর ছয় নম্বর
যোড়াসাঁকোর বাটিতে !
ইষ্টিম ঐরে ফুরিয়ে এল
নোঙর ফেলি অদ্য।
অবিদিত নেইত তোমার
রবিকাকা কুঁড়ের হদ্দ !

আজকে না কি মেঘ করেচে
ঠেকছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা,
তাই খানিকটা ফোঁস্‌ফোঁসিয়ে
বিদায় হল—

(কড়ি ও কোমল : প্রথম সংস্করণ) রবি কাকা !

সপ্তম পরিশিষ্ট

ESTD. 1908
MONOGRAPH
Phone : PARK 929

SANGEETA SAMMILANEE
ACADEMY OF INDIAN MUSIC
FOR TRAINING BOYS, GIRLS&
TEACHERS IN MUSIC
163-B Park Street
Calcutta-15th May 1941

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

ভারতভাস্কর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একাশীতম শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে সঙ্গীতসম্মিলনীর সভ্যগণ তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁহার আজীবন সাধনা এবং অপূর্ব অজস্র দান স্মরণ করিয়া, তাঁহার সহিত বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ বলিয়া নিজেদের মনে করি। সম্মিলনীর প্রোৎসাহকপদে তিনি নিজনাম দিতে স্বীকৃত হওয়ায় সেই কৃতজ্ঞতা-ঋণ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

আমাদের সঙ্গীত সম্মিলনীর সহিত বর্তমানে তাঁহার পক্ষে কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব না হইলেও, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সর্বদা অনুকূল

দৃষ্টি রাখিবেন এই আশা করি ; এবং সুস্থ শরীরে শতায়ু হইয়া তাঁহার দেশবাসীকে নব নব দানে ধন্য করিবেন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

* শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
সভানেত্রী
শ্রীপ্রমদা চৌধুরাণী
সম্পাদিকা।
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
সহযোগী সম্পাদক।

অষ্টম পরিশিষ্ট

বিশ্বভারতী-সংগীতসমিতি প্রদত্ত

সম্বর্ধনা : স্থান জোড়াসাঁকো বিচিত্রা ভবন।

[এই অনুষ্ঠানে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী অসুস্থতা সত্ত্বেও উপস্থিত ছিলেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণের পর 'বিশ্ববীণারবে' গানটি গীত হয়। বিশ্বভারতী-সঙ্গীত সমিতির সচিব নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ইন্দিরা দেবীকে পট্টবস্ত্র ও শ্বেত যূথিকা মাল্যে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। ভাষণের মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরা দেবী-রচিত সঙ্গীত গীত হয়। এই অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা হইলেন—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীরা দেবী, ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীমতী ঠাকুর, কে. কে. রায়, শ্রীমতী অতুল গুপ্ত, শ্রীমতী দেবেন্দ্রমোহন বসু, সীতা দেবী, কালিদাস নাগ প্রভৃতি। সম্বর্ধনা ভাষণটি পাঠ করার পর ইন্দিরা দেবী যে প্রতিভাষণ দেন, তাহা পাঠ করিয়া শোনান মঞ্জুশ্রী দেবী। —লেখক]

---

* সকলেই নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই অভিনন্দন পত্রটি অপ্রকাশিত।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

পূজনীয়া

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীচরণ কমলে

— —

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা, আসি—
চেয়ে দেখো আকাশের পানে—
পড়ুক বিমল বিভা পূর্ণরূপরাশি
স্বর্ণমুখী কমলনয়ানে।
আনন্দে ফুটিয়া ওঠে শুভ্র সূর্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মতো,
দাঁড়াও সায়াহ্ন-মাঝে পবিত্র হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত॥

আর্যা,

জীবনের প্রভাতবেলার বনপথে সচকিত আলোছায়া সম্পাত শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পবর্ষণ, স্নিগ্ধ হিল্লোলিত সমীরসঞ্চার, বিবিধ বিহঙ্গের কলকুজিত, সবের সঙ্গে মিলে মিশে আপনার উদ্দেশে এই আশিস্ যাঁর স্নেহপূর্ণ, প্রীতিপূর্ণ, হৃদয়ের বাণী বহন ক'রে নিখিল হৃদয়স্পর্শী কাব্যরূপে মানবমনে চিরন্তনতা লাভ করেছে, আপনাকে শ্রদ্ধা, প্রণাম ও প্রীতি নিবেদনের উপলক্ষ্যে আজ আমরা তাঁকেও স্মরণ করি।

যে কুলে আপনার জন্ম ও লালন পালন সে কুল পবিত্র; যে কালে আপনার উদ্ভব গতি ও স্থিতি সেও বাঙালির বলে নয়—ভারতেরই জাতীয় জীবনে পুণ্য পুনরুজ্জীবনের কাল; যে-কিছু আশা আদর্শ কল্পনা উদ্যম উদ্দীপনা ও কর্মানুষ্ঠানের পরিবেশে আপনার জীবনের রবিচন্দ্রতারাখচিত দিনরাত্রিগুলি অতিবাহিত—যার সঙ্গে চিরদিনই আপনার অব্যবহিত যোগ—সেও মহৎ, সুন্দর,

দূরেপরিণামী—কাজেই আজ বলে নয়, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'ও তার মঙ্গলময় প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

দুইকূলের বাঁধনে যেমন স্রোতস্বিনীর প্রবাহ ও পরিচয়, দুইকুলের বাঁধনে তেমনি নারীর। সেই উভয় কুলই আপনার বরণীয় ও স্মরণীয় : বিশেষ করে আমরা স্মরণ করি আজ এই দুই কুলের আশ্রয়ে অলক্ষ্যগামিণী মৃদু কল্লোল-ভাষিণী শুশ্রূষাবাহিনী আপনার জীবনপ্রবাহকে।

বিদ্যা আপনাকে বিনয়ে ভূষিত করেছে। ধী এবং শ্রী আপনার দেহে মনে অবিচ্ছিন্ন রূপ পেয়েছে। স্নেহ প্রীতি হিতৈষণা আপনার আচারে আচরণে চিন্তায় একটি সহজ স্বাভাবিক সৌজন্যে সুন্দর হয়েছে। সর্বত্র আপনার আত্মীয়তা-বোধের ব্যাপ্তিহেতু, আপনাকেও সকলেই আত্মীয় বলে, বন্ধু বলে, হিতৈষিণী বলে অনায়াসেই বোধ করে থাকে।

ভুবনবরেণ্য রবীন্দ্রনাথের আপনি স্নেহভাগিনী, পরিবারবিশেষে জন্ম-লাভের ঘটনাচক্রেই নয়, চারিত্রগুণেও বটে। সেই অতুল স্নেহের দান যা-কিছু পেয়েছেন, ভোগের দ্বারাই আপনি তা নিঃশেষে করেন নি, আত্মনিবেদনের দ্বারাই গ্রহণ করেছিলেন বলে স্বতঃই আবার তা সর্বজনকে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন। রসের যে অলৌকিক উৎকর্ষ, সুরকল্পনার যে অভাবনীয় ঐশ্বর্য রবীন্দ্রপ্রতিভার সার, তারই নিরলস ধারা অর্ধশতাব্দীর অধিক পথ অতিক্রম করে আজও আপনার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ; নানা দিগ্‌দেশাগত তৃষিতজন আজও সেখানে অঞ্জলি পূর্ণ করে নিয়ে তৃপ্ত হয়, ধন্য হয়। গ্রহণে আপনার যেমন অপ্রমাদী, দানেও আপনার তেমনি শ্রান্তি নেই, শেষ নেই।

আপনাকে আমরা কী সম্মান, কী অভিনন্দন দিতে পারি। আপনি যে আছেন আমাদের মধ্যে, আমরা আপনাকে জেনেছি, আপনার প্রতিমায় একটি বরণীয় ও স্মরণীয় যুগকে বিশেষ ভাবেই জেনেছি ও চিনেছি, আর আপনিও আমাদের স্নেহস্মিত দৃষ্টিপাতে স্বীকার করেছেন—তারই কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের এ কেবল একটি উপলক্ষ্য-রচনা।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এমনি আনন্দ নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে, প্রীতি নিয়ে, শতায়ু হয়ে আপনি আমাদের মধ্যে থাকুন, এই প্রার্থনা করি।

বিশ্বভারতী-সংগীতসমিতি

[এই অনুষ্ঠানে ইন্দিরা দেবীর প্রতিভাষণঃ এই প্রতিভাষণ মুদ্রিত (Cyclostyled) হইয়া বিতরিত হয়]

প্রতিভাষণ

আজকে আমার জন্য আপনারা এত বড় আয়োজন করেছেন দেখে আমি আশ্চর্য, আনন্দিত এবং কিঞ্চিৎ লজ্জিত বোধ কচ্ছি। কারণ কিসের জন্য এত সমারোহ, তা ভেবে পাওয়া শক্ত। তবে আদর যত্ন যখন যেখানে পাওয়া যায় সব সময়েই ভালো লাগে—তা অকারণেই হোক আর সকারণেই হোক। বরং অকারণে পেলে বেশী ভাল লাগে, কারণ উপরি পাওনাতে মানুষের লোভ বেশী। আমরা সকলেই যদি কেবল নিজের যোগ্যতার পরিমাপেই সমাদর পেতুম, তাহলে বড়ই দুরবস্থায় পড়তে হত।

আমি কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ আছি বলে নিজের মুখে আমার মনোভাব জানাতে পারলুম না বলে বড় দুঃখিত। নিমন্ত্রণপত্রখানা অসুখের আগে একবারমাত্র চোখ বুলিয়ে দেখেছিলুম। তার থেকে ঠিক বুঝতে পারি নি এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কে। তারপরে শুনেছি যে, বিশ্বভারতীর সংগীত-সমিতির পক্ষ থেকে এই আয়োজন। অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা করে আসছি এবং স্বরলিপিও করেছি। কিন্তু সে ঘরের মেয়ে ঘরের কাজ হিসেবে করেছি। তার জন্য যে এত ধুমধাম বা ধন্যবাদ দরকার তা কখনও মনে করিনি। তখন বিশ্বভারতীর জন্মও হয়নি। সেই কাজই বিশ্বভারতীর জন্য করলে যে পরের কাজ করা হয় তা এখনও মনে করিনে। কেন না, বিশ্বভারতীও তাঁরই স্থাপিত। বস্তুতঃ কি শান্তিনিকেতনে, কি কলকাতার ঘরে বাইরে এই যে দুটি ধারা—একদিকে পারিবারিক জীবনযাত্রা এবং আর একদিকে বিশ্বভারতীর কাজকর্ম—সমান্তরালে চলেছে বলে আমি যেটুকু কাজ করতে পারি তা বেশ সহজে ও মনের সঙ্গে করতে পারি। এখানেও এই যে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর পাশেই গ্রন্থনবিভাগ অবস্থিত, এতে করেই সব কাজ বেশ সুসমঞ্জস ও সরস বোধ হয়। নয়তো কেবলমাত্র একটানা কাজ হয়তো শুষ্ক এবং একঘেয়ে লাগত। এ সূত্রে সংগীত সমিতি, স্বরলিপি সমিতি ও গ্রন্থন বিভাগের সদস্যদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছি তাতে পরকেও আপন করবার সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের

সকলের অসাময়িক ব্যবহারে পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করিনি। মাঝে মাঝে তাঁদের উপর রাগ না করেছি তা নয়, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই সাক্ষী দেবেন যে, সে রাগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এ স্থলে তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

রবীন্দ্রসঙ্গীত এক বিরাট প্রতিভার একাংশ মাত্র হলেও নিতান্ত সামান্য অংশ নয় এবং বোধ হয় তাঁর প্রিয়তম অংশ। এই সঙ্গীতসুধা পরিবেশনের যে মহৎ ভার গ্রন্থন বিভাগ স্কন্ধে নিয়েছেন তাঁরা বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। আজকাল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের চাহিদা এবং আদর বাড়ছে দেখে আহ্লাদ হয়। এখনও তাঁর সঙ্গীতের প্রকাশ ও প্রচারঘটিত গবেষণা, কত কাজ বাকী আছে তা ভাবলে মনে হয় যেন কোনকালে শেষ হবে না। আমি অনেক সময় মজা করে বলি যে, আমার জীবনের যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাই যেন সামনে এক বিস্তীর্ণ স্বরলিপির মরুভূমি পড়ে রয়েছে, তার মাঝে মাঝে রেফ ও হসন্তের কাঁটাগাছ। অন্ততঃ আমি তো শেষ দেখে যেতে পারব না। তাই আশা ও আশীর্বাদ করি, আমার সহকারিগণ তাঁদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন এবং বৃহৎ কার্য সুসম্পন্ন করতে পারবেন।

২৫ জুন ১৯৫১ শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

কলিকাতা

নবম পরিশিষ্ট

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রণতি নিবেদন

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীচরণকমলেষু

আছে মা তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ

হৃদয়েতে ঊষার আভাস,

খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন,
চারিদিকে মর্ত্যের প্রবাস।…

পুণ্য জ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য-হাসি খানি
অন্নপূর্ণা জননীসমান,
মহাসুখে সুখদুঃখ কিছু নাহি মানি
কর সবে সুখশান্তিদান।
মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা ;
মানবেরে জ্যোতি দাও, কর আশীর্বাদ,
অকলঙ্ক মূর্তি মধুরিমা।…

সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্ররূপ কোথা যায় বাতা সে উবিয়া
দুই-চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

জীবনের শুভসূচনায় কবি আপনাকে যে স্নেহাশীর্বাদ করিয়াছিলেন; দীর্ঘ আয়ুর প্রতি পদক্ষেপে তাহা সার্থক হইয়াছে আপনার জীবনে।—'সুন্দর মুখে তোর মগ্ন আছে ঘুমে একখানি পবিত্র জীবন'—সেই শুভ্রতা অশীতিবর্ষ ধরিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে আপনার সকল কর্মে চিন্তায়, ভাবনায়; বেদনায়, তাহার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে আপনার সমগ্র পরিমণ্ডল—ধন্য হইয়াছে

আপনার জীবন, যার ধন্য হইলাম আমরা, আপনার প্রীতিসুন্দর, জীবন যাহারা প্রত্যক্ষ করিলাম ঃ আজিকার অনুষ্ঠানে তাহারই কৃতজ্ঞতা-নিবেদন।

শ্রী, ধী ও হ্রী, রমণীর শ্রেষ্ঠভূষণরূপে আপনার ঋষিকল্প পূর্বপুরুষ কর্তৃক চিহ্নিত এই গুণত্রয়ে আপনার জীবন সমলংকৃত হইয়াছে। বাংলার নারী-জাগরণের প্রত্যূষকালেই অসামান্য ধীশক্তি দ্বারা বিবিধ সুদুর্লভ বিদ্যা আপনি আয়ত্ত করিয়াছেন, নিরন্তর তাহার চর্চা করিয়াও লোকসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আপনি ব্যগ্র হন নাই; আপনার স্বাভাবিক হ্রী যে সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে তাহাতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া আপনার কল্যাণহস্ত বিভিন্ন নারীমঙ্গলকর্মে সতত নিয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীন ও নবীন দুই যুগের সন্ধিক্ষণে বঙ্গনারীর শিক্ষাদীক্ষার যে আদর্শ আপনি বাচনে ও রচনায় প্রচার করিয়াছেন, সর্বোপরি যাহা প্রতিফলিত হইয়াছে আপনার অনিন্দ্য জীবন-রচনায়, বাংলার নারী সমাজে তাহা বরণীয় হইয়া থাকিবে, সুচিরকাল ধরিয়া মংগলপ্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে।

আপনার জীবনে ঈশ্বরের যে এক শ্রেষ্ঠদান, কবিগুরুর শিক্ষায় যে সম্পদ পরিবর্ধিত, সেই গীতসুধা রসপিপাসু সমাজে, সর্বসাধারণের মধ্যে, এমন কি অভাজনদের মধ্যেও বণ্টন করিয়া দিবার, সেই গীতসম্পদ অনশ্বরভাবে রক্ষা করিবার আগ্রহ ও উদ্যম আজিও আপনার মধ্যে অক্লান্ত ও অবিচলিত। সংগীত আপনার পক্ষে তো কেবল সযত্নে আয়ত্ত কলাবিদ্যা নহে, শুধু অবসর বিনোদন বা মনোরঞ্জনের উপকরণ নহে সহস্র বিপদে ইহা আপনাকে বল দিয়াছে। শোকে অনন্ত সান্ত্বনা দিয়াছে; বাহিরের সুখ যে সুখের মরীচিকা, চিরদিবসের সুখ যে নিজের আত্মার মধ্যেই গোপন এই সংবাদ আপনার গোচর করিয়াছে; পূর্ণ হইয়াছে কবিগুরুর আকাঙ্ক্ষা আপনার জীবনে—

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের 'পরে নাম ধরে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে
চেয়ে থাকে তোর মুখে,

চির-আশীর্বাদসম কাছে কাছে থাকে।
সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্বল পরাণে,
এ গান আপন সুরে
মন তোর রাখে পূরে,
ইস্টমন্ত্রসম সদা বাজে তোর কানে।
এ গান যেন রে হয় তোর ধ্রুবতারা
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা।
তোমার মুখের পরে
জেগে থাকে স্নেহ ভরে
অকূলে নয়ন মেলি' দেখায় কিনারা।
আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরাণে।
তপ্ত শোণিতের মত
বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে।
এ গান বাঁচিয়া যেন থাকে তোর মাঝে,
আঁখি তারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান
সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে।

জীবন-গানের অবসানেও যাহার মধ্যে কবি বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন—'গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি'—তাহা কেবল আপনার ব্যক্তি-জীবনকে অনুপ্রাণিত করে নাই, গানের সেই প্রাণবন্যা সর্বত্র প্রবাহিত করিয়া দিবার উদ্যোগেও আপনি আজিও অগ্রণী, গুরুর দীন সেবক আমরা এই পুণ্য-তিথিতে আপনাকে প্রণাম করি। আপনার অনুবর্তী হইয়া এই সংগীত সুধা-পরিবেশনে আমরাও যে সামান্য আয়োজন করিয়াছি তাহার প্রতি চিরদিন

আপনার স্নেহদৃষ্টি জাগরূক আছে; আপনার অগণিত স্নেহভাজনের মত আমরাও কল্পনা করিয়াছি যে আপনার স্নেহে আমাদের এক বিশেষ অধিকার; এই শুভ উৎসবে আমরা যে অর্ঘ্য আহরণ করিয়াছি প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা তাহা স্বীকার করিয়া আমাদের উদ্যোগকে আপনি কৃতার্থ করুন, এই নিবেদন।

ইতি…

প্রণত

ছাত্র ছাত্রী, কর্মী ও সদস্যবৃন্দ

গীতবিতান

১৫৫ রসা রোড, কালকাতা-২৫

অনুষ্ঠান স্থল—শান্তিনিকেতন

২৯ ডিসেম্বর ১৯৫৩

পরম পূজনীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী*

মহদয়াসু

আজ আমরা বৈতানিক সভার এবং বঙ্গীয় গুণী শিক্ষিত সমাজের পক্ষ থেকে আপনার জীবনের পরিপূর্ণতার উচ্চশিখরাগত প্রজ্ঞাকে পরম আনন্দে অভিনন্দিত করবার জন্যে সমাগত। আপনার জীবনের সমগ্রকাল কেটেছে বহু উচ্চ সমুজ্জল দেশের প্রগতি প্রসারের কাজে। বাংলার নবযুগের জাগৃতি যজ্ঞের যাঁরা পুরোহিত তাঁদের মধ্যে আপনার উৎকৃষ্ট স্থান। আপনি আজ বাঙ্গালী নারী সমাজের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ অমরতা লাভ করেছেন। আপনি নারীদের মধ্যে যে সময়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, এবং আপনার পরমারাধ্যা বিদুষী মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যে সময়ে বাংলার মেয়েদের পর্দার অর্গল ভেঙেছিলেন সে এক নিদারুণ সাহসের দিন। এখনকার শিক্ষিত সমাজের তা বোধেরও অসাধ্য।

বাল্যকাল থেকে আপনি সঙ্গীতে বিদুষী এবং আপনার পরমারাধ্য পিতামহ পিতা এবং খুল্লতাতদের রচিত সঙ্গীত চর্চারও শিক্ষার শুভ্র কার্যে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করেছেন। এখনো আপনি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মতো সঙ্গীত শিক্ষা ও প্রচারে অক্লান্তশ্রমী। যে চারুসঙ্গীত শিক্ষিত সমাজের মেয়েদের মধ্যে

*এই মানপত্রের বানান মূল বানান অনুযায়ী অনুসৃত।

অবগুণ্ঠিত ছিল তার কলাসৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে গোড়ায় আপনারই দ্বারা। যাত্রা বা নাটক যে সময়ে শিক্ষিত সমাজ ঘৃণাভরে দেখতে চাননি তখনকার সেই দুর্দিনে আপনি সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে যোগ দিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। নবীন সমাজে সঙ্গীতে যে আজ কদর দেখা যায় তাতেও আপনার হাত আছে। প্রাচীন স্থবীর অন্ধকুসংস্কারগ্রস্ত ব্যক্তিদেরও ক্রমে ভ্রম দূর হয়েছে আপনারই জন্যে। আপনার স্বনামধন্য পিতৃদেব স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদার দৃষ্টান্ত এবং মাতার নারী সমাজের গভীর সংস্কারের কৃতকারিতা আপনার মধ্যে সফলতার আশীর্বাদ স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী সমাজে আজ তার প্রতিফলিত জ্যোতি নানা দিকে বিকিরিত।

আপনিই একদিন আপনার পতি সাহিত্যগুরু প্রমথনাথ চৌধুরীর চলিত ভাষা প্রচলিত করার উদ্যোগে সহায় হতে অগ্রণী ছিলেন এবং তার ফলে রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যে নবতম অবদান সম্ভব হয়েছিল। সবুজপত্র পত্রিকা তার জলন্ত সাক্ষি দিতে সর্বদাই থাকবে।

আমাদের মধ্যে অনেকে যাঁরা বাল্যকালে বা তারুণ্যে আপনার আশির্বাদ লাভ করতে পেরেছি তাদের সফলতায়ও আপনার আশির্বাদের রক্তোজ্জল টিকা দেখা দিয়েছে। কায়মনোবাক্যে কামনা করি কবির অবর্ত্তমানে তাঁর সঙ্গীতধারা যে ভাবে আজও প্রবহমান রেখেছেন তার শিক্ষা যেন আমাদের মধ্যে মন্দাকিনীধারার মত চিরতরুণ ও অটুট থাকে। আপনার স্বাস্থ্য নিরোগ ও সবল থাকুক, আপনি শতায়ু হোন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আপনাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দনসহ প্রণাম নিবেদন করি।

৮ নাগিন রোড বৈতানিক সভাবৃন্দ*

কলিকাতা

২৬শে জুন, ১৯৫৪

---

* বৈতানিক প্রদত্ত অভ্যর্থনার উত্তরে ইন্দিরাদেবী যে ভাষণ দেন তাহা 'সমকালীন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে 'বৈতানিক প্রকাশনী' কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মৃতিকথা' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১০৮০) গ্রন্থে 'গানের স্মৃতি' নামে গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে।

সরলাবালা সরকার

(১৮৭৫-১৯৬১)

বিদ্যার্জনের প্রচলিত নিয়মানুসারে বিদ্যাভ্যাস না করিয়াও নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় বলে শতাধিক বর্ষ পূর্বের বঙ্গসমাজে কোনো নারী যে সাহিত্যক্ষেত্রে আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারেন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সরলাবালা সরকার। সাহিত্যচর্চা, দেশহিতৈষণা এবং ধর্মপ্রাণতা এই মহীয়সী নারীকে সর্বযুগের শ্রদ্ধাযোগ্য একটি মহৎ চরিত্রে পরিণত করিয়াছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়সূত্রেই সংস্কৃতিবান পরিবারে সরলাবালা ২৫এ অগ্রহায়ণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ, ১০ ডিসেম্বর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী কাঁঠালপোতা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস অবশ্য ছিল ফরিদপুর জেলার ভড় রামদিয়া গ্রামে। পিতামহী স্বনামখ্যাতা রাসসুন্দরী দাসী—বাঙলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী 'আমার জীবন'-এর বহুশ্রুত লেখিকা। পিতামহ সীতানাথ সরকার ছিলেন রামদিয়া গ্রামের ভূস্বামী। পিতা কিশোরীলাল সরকার ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী এবং পণ্ডিত ও আইনবিদ্। দুই ভ্রাতা সরসীলাল সরকার ও বংশীলাল সরকার স্বনামে খ্যাত। কন্যা নির্ঝরিণী সরকার[১]ও বাঙলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতি জগতে নিতান্ত অপরিচিতা ছিলেন না।

মাতৃকুলের দিক হইতে সরলাবালার মাতুলেরা ছিলেন বহুশ্রুত মনীষী। অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর হেমন্তকুমার-শিশিরকুমার-মতিলাল ঘোষ ভ্রাতৃগণ ছিলেন সরলাবালার আপন মাতুল।

১. ইনি আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর শ্রী অশোককুমার সরকারের মাতা।

শিক্ষা : পাঠশালার বিধিবদ্ধ নিয়মে সরলাবালার পাঠ্যজীবন সূচিত হয় নাই। কিন্তু 'খুব ছেলেবেলাতেই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আকর্ষণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল'।[২] তাহার ফলে 'ধর্মমঙ্গল', 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'মনসার ভাসান' আর 'কবিকঙ্কন চণ্ডী'র সহিত ছয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', রমেশচন্দ্র দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ গ্রন্থরাজি, চণ্ডীচরণ সেনের 'টমকাকার কুটির' প্রভৃতি সুখ্যাত গ্রন্থাবলীর রস গভীরভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন। মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'বালক ও ভারতী', 'নবজীবন' এবং 'সখা'র (প্রমদাচরণ সেন-সম্পাদিত) সহিত গভীর সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। ফলতঃ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আজন্ম অধিকার ঘটিয়া গিয়াছিল। আপন নিষ্ঠা বলে বিদ্যার্জনের পথ তিনি নিজেই নির্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন।

বিবাহ : দ্বাদশ বর্ষ বয়সে সরলাবালার বিবাহ হয় পাবনাজেলার মালঞ্চী গ্রামের রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের সাহিত্যপ্রেমী পুত্র শরৎচন্দ্র সরকারের সহিত (১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। দাম্পত্য জীবন দীর্ঘ ছিল না। মাত্র একাদশ বৎসরের ক্ষণলগ্ন সুখের অবসানে ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়সে সরলাবালার জীবনে বৈধব্যের অভিশাপ নামিয়া আসে।

সাহিত্যানুরাগ : অতি অল্প বয়সে বালিকা সরলাবালার সাহিত্যানুরাগের যে পরিচয় 'শিক্ষা' পর্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই অনুরাগ ক্রমে বর্ধিত হইয়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চক্রবর্তী'র কাব্যজগতে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহাদের কাব্যসমূহের ভাব কিশোরী সরলাবালার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিত। সেই কারণেই সরলাবালার 'নয় দশ বৎসর বয়সেই কবিতা

---

২. 'হারানো অতীত', প্রথম সংস্করণ ১৩৬০, সরলাবালা সরকার। পৃ. ১।

লেখার হাতেখড়ি আরম্ভ হইয়াছিল।' এই বিষয়ে মাতুলপুত্র মৃণালকান্তি ঘোষ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। ফলে 'খাতা ভর্তি' গোপন রচনা ··· ভাঙ্গা টিনের বাক্সয়[৩] ক্রমাগত জমা হইতে থাকিত।

বিবাহের পর স্বামী শরৎচন্দ্র স্ত্রীর প্রবল সাহিত্যানুরাগ লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে গভীর উৎসাহ দিতেন। কবি রজনীকান্ত সেন এবং 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সহিত শরৎচন্দ্রের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। তিনি পত্নীকে উৎসাহ প্রদানেরজন্য কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রেম ও ফুল', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা', রবীন্দ্রনাথের 'শৈশব সঙ্গীত', 'ভগ্নহৃদয়', 'কবিকাহিনী,' 'রাজর্ষি" প্রভৃতি তৎকাল প্রসিদ্ধ পুস্তক সমূহ আনিয়া দিয়া স্ত্রীর আগ্রহকে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করেন। সরলাবালা তাঁহার 'হারানো অতীত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'সেই সময় হইতেই কবি হইলেন এক পরমাত্মীয়' বাঙলা দেশের তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ বিবাহোত্তর জীবনে স্ত্রীলোকের সাহিত্যচর্চা তো দূরের কথা, লেখাপড়া পর্যন্ত গর্হিত অপরাধ্ বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই সমাজে সরলাবালার সাহিত্যপ্রীতি যে অক্ষুণ্ণ রহিল, তাহা তাঁহার স্বামীরই কল্যাণে। সরলাবালার সাহিত্যচর্চা তাহা বলিয়া একেবারে যে নিষ্কণ্টক ছিল, তাহা নহে—'ইহা লইয়া নানাভাবে বিদ্রূপ ও উপদেশও সে সময় শুনিতে হইয়াছিল।' কিন্তু কবি প্রমীলা নাগ ও বিনয়কুমারী ধরের বন্ধুত্ব, কামিনী সেনের (পরে রায়) কাব্যচর্চা, দেবেন্দ্রনাথ সেনের অগৌণ স্নেহ এই সকল তিরস্কারের উর্ধ্বে সরলাবালার জীবনকে সাহিত্যমুখী করিয়া রাখে।

ইহারই প্রথম ফসল স্বরূপ ১২৯৭ বঙ্গাব্দের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় সরলাবালার প্রথম কবিতা 'লজ্জাবতী' প্রকাশিত হয়। সেবারত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বনলতা দেবী-সম্পাদিত 'অন্তঃপুর' পত্রিকাটিতেও তাঁহার

---

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪-৫।

কয়েকটি রচনা পত্রস্থ হয়। তৃতীয় মাতুল শিশিকুমার ঘোষ আপাতদৃষ্টিতে সরলাবালার রচনা লইয়া কৌতুক করিলেও কোনো পত্রিকায় ভাগিনেয়ীর 'লেখা দেখিলেই আগ্রহের সহিত পড়িতেন।' তাঁহার সাহিত্য জীবনে এই মাতুলটির প্রভাব নিতান্ত নগণ্য নহে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকাতেও সরলাবালার কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত হয় (পরে প্রদত্ত তালিকা দ্রষ্টব্য)। ঋষি রাজনারায়ণ বসু সরলাবালার সাহিত্য চর্চাকে সম্বর্ধিত করিতেন। সরলাবালা-রচিত 'ঘরের লক্ষ্মী' গল্পটি পাঠকরিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে প্রদীপ, উৎসাহ, জাহ্নবী, উদ্বোধন, সুপ্রভাত, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্র ও দৈনিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার সাহিত্যচর্চার নিদর্শন মুদ্রিত হইয়া আছে।

কাব্যগ্রন্থ :

সরলাবালার প্রথম কাব্যগ্রন্থ **'প্রবাহ'** প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। জব্বলপুর বাসকালে[৪] সদ্যবিধবা সরলাবালার প্রকৃতি-সন্নিধানে বিরহব্যাথা প্রশমনের কাব্যগুণোপেত চিহ্ন ইহার কবিতাগুলিতে বিদ্যমান। 'প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার কিয়দংশের পাঠ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—'আমি এক প্রভাতের কবি/এ জীবন শিশিরের মত/প্রভাত ফুরায়ে গেছে হায়,/তাই বড় হয়েছি বিব্রত ! /শিশির শুখায়ে গেছে বনে/প্রভাতের বিদায়ের মনে,/শুখায়েছি তবু বেঁচে আছি/দগ্ধ হয়ে তপন কিরণে।/শিশির শুখায়ে গেল বনে,/প্রভাত ফুরায়ে গেল হায়,/আমি এক প্রভাতের কবি/এ জীবন কেন না ফুরায়।'

৪. 'জব্বলপুরে গিয়া আমি অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার কতকগুলি আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই 'প্রবাহে' বাহির হইয়াছিল।' ইহার কবিতা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—'মনে যাহা ছবি হইয়া চিরজাগ্রত ভাবে রহিয়াছে ভাষায় সে ছবি প্রতিফলিত করা কত যে দুঃসাধ্য তাহা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি, তাই বার বার মনে হইতেছে, 'হয় নাই, হয় নাই, এতো ঠিক হইতেছে না।'—'হারানো অতীত', পৃ. ৬৭ ও ৭১।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি সম্পর্কে যে অনবদ্য মন্তব্যটি করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধারযোগ্য – 'তোমার মাতার 'প্রবাহ' বইখানি আমি গিরিডি থাকিতে দেখিয়াছিলাম। কবিতাগুলির মধ্যে একটি স্নিগ্ধতা আছে—তোমার মার যে স্বাভাবিক কাবত্বশক্তি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।' (নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্র, পত্ররচনার তারিখ ১১ আগস্ট ১৯১১ খ্রীঃ, দ্রঃ চিঠিপত্র সপ্তম খণ্ড পত্রসংখ্যা-১৮)। সরলাবালার এই শোক-কাব্যটি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭খ্রীঃ), মানকুমারী বসুর 'প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' ১৮৮৪ খ্রীঃ) এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর 'তারা' (১৯১৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি সুপরিচিত শোক-কাব্যসমূহের মতই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শোক-কাব্য।

কাব্যটি সম্পাদনা করিয়াছিলেন কবির অগ্রজ ডাঃ সরসীলাল সরকার।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্ঘ্য' কবির ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাও সরলাবালার ষাট বৎসরেরও বেশি কালের কাব্যচর্চার নিদর্শন বর্তমান। বিবিধপ্রকার রচনার স্রষ্টী হওয়া সত্ত্বেও প্রধানতঃ কাব্যদেবীর প্রসন্ন আশীর্বাদেই তাঁহার সাহিত্য জীবন সরস হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রন্থটি দুইটি অংশে বিন্যস্ত—অর্ঘ্য ও জাগরণী। মোট কবিতার সংখ্যা ঊনআশি।

সমাজরস, ভক্তিরস ও দেশাত্মরসে[৫] জারিত 'অর্ঘ্য' কাব্যগ্রন্থের 'আনন্দ পাথার' নামক দেশাত্মবোধক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :

ছিন্নবস্ত্র যদি পরি তবু যেন পরবস্ত্রে
না হই সজ্জিত।
পরান্নের তরে যেন কুক্কুরের সম নাহি
হই লালায়িত।

ভক্তিরসে উদ্দীপিত কবিতাগুলিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই কারণে যে, ইহাতে ভক্তের সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশিত হয় নাই। শিব-দুর্গা এবং কৃষ্ণ-

৫. দেশাত্মবোধক কবিতার প্রসঙ্গ পরে দ্রষ্টব্য।

চৈতন্য একাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সরলাবালার জীবনের পরিসমাপ্তি ভাবভক্তিতে—শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণে। এইসব বৈষ্ণবপ্রাণ কবিতাগুলিতে প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিগণের রীতি অনুসৃত হইয়াছে। 'বলাইদাসের দাসী' ভণিতায় প্রাচীন আবহাওয়াটুকু পরিমণ্ডিত—

বলাইদাসের দাসী,* চিরদিন উপবাসী
এক বিন্দু কৃপা ভিক্ষা মাগে। ('নিবেদন' কবিতা)

জীবনী গ্রন্থঃ

সরলাবালা দুইটি জীবনী গ্রন্থের রচয়িত্রী। প্রথমটি ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কিত—'নিবেদিতা' গ্রন্থ। 'নিবেদিতার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের অনুরোধে' সরলাবালা এই নাতিদীর্ঘ জীবনীটি রচনা করেন এবং ইহা হইতে লব্ধ আয় নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে অর্পণের ব্যবস্থা করেন। ১৩ই অক্টোবর ১৯১১ খ্রীঃ নিবেদিতার প্রয়াণের অব্যবহিত পরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সংখ্যায় বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করিয়া নিবেদিতার অন্তর্জীবনকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই অন্তর্জীবনের সহিত কর্মজীবনের মিলন ঘটাইয়া নিবেদিতা-প্রয়াণের পর প্রথম রচিত জীবনী-গ্রন্থ হিসাবে 'নিবেদিতা' বিশেষ মূল্যবহ। (উদ্বোধন, ১৩১৯)। লেখিকার জীবনে গ্রন্থটির তেরটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'বিদ্যাবতী' ও 'বুদ্ধিমতী' নিবেদিতার শিক্ষক-জীবন, দেশপ্রেম, সর্বধর্মে আস্থা, মিতব্যয়িতা, দৃপ্তভঙ্গিমা,

---

৬. 'বলাই' ভণিতায় সরলাবালার সেজমামা শিশিরকুমার ঘোষ বৈষ্ণব পদ রচনা করিতেন। "এই 'বলাই' বা 'বলরাম দাস' তাঁহার সাধনকালে গুরু দত্ত নাম"। হারানো অতীত, পৃ. ৯।। মাতুলের ভাবাক্রান্ত কবি-ভাগিনেয়ী সেই কারণে নিজেকে 'বলাই দাসের দাসী' বলিয়াছেন বলিয়া অনুমান করি।

আশাবাদিতা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের শেষস্তব আত্মত্যাগ—ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপলব্ধিতে অনুধাবন করিয়া আশ্চর্যভাবে রেখায়িত করিয়াছেন। বীরেশ্বর বিবেকানন্দের চরণে নিবেদিত নিবেদিতার 'মানসিক মহত্বে'র এমন নিপুণ রেখাঙ্কন সমসাময়িককালে রচিত নিবেদিতার জীবনীগ্রন্থসমূহে অপ্রাপ্য।

রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িতা এই লেখিকার শ্রদ্ধা অনেক পরে রচিত (১৯৫৭ খ্রীঃ) 'স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' গ্রন্থে মুদ্রিত রহিয়াছে।

অপর একটি জীবনী গ্রন্থ 'কুমুদনাথ'—'পাপ ও পুণ্য', 'বিল্বদল' 'সাগরের ডাক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা ধর্মপ্রাণ কুমুদনাথ লাহিড়ীর (জন্ম মাঘ১২৮৬ জীবনী। বস্তুতঃপক্ষে এটি একটি মহৎ ধর্মজীবনের কাহিনী—গতানুগতিক জীবনী নহে।

গল্পগ্রন্থ : গল্পরচনাতে সরলাবালার দক্ষতা একালের পাঠকের খুব জ্ঞাত নহে। 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম গল্প 'ঘরের লক্ষ্মী' প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'কাঁচের দোয়াত' ('চিত্রপট' গল্পগ্রন্থের সপ্তম গল্প) পড়িয়া সাহিত্যিক জলধর সেন এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লেখিকাকে পত্র দ্বারা উৎসাহিত করেন।

'কুন্তলীন পুরস্কারে' যে বৎসর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত) 'মন্দির' গল্প প্রথম পুরস্কার পায়, সেই বৎসর (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) দ্বিতীয় পুরস্কারের জন্য সরলাবালা দাসীর ('দাসী' এবং 'সরকার' উভয় পদবীতেই ইহার রচনা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে) করুণ রসাত্মক 'স্মৃতিচিহ্ন' গল্পটি নির্বাচিত হইয়া দশ টাকা পুরস্কার লাভ করে। এই গল্প বাছাই করিয়াছিলেন তৎকালীন 'বসুমতী' সম্পাদক জলধর সেন। 'কুন্তলীন পুরস্কারে' সরলাবালার আরও গল্প প্রকাশিত হয় (তালিকা দ্রষ্টব্য)।

সরলাবালার গল্পগ্রন্থ দুইটি—'চিত্রপট' 'ও গল্পসংগ্রহ'। শিশুপাঠ্য গ্রন্থ একটি 'পিনুকুর ডাইরি'। পরিণত বয়সে রচিত এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থটি বিভূতি-ভূষণের বহুখ্যাত রানুর চিঠির পার্শ্বে অক্লেশে স্থান পাইতে পারে।

সরলাবালা গল্প কবিতা প্রবন্ধাদি রচনা করিলেও কোনো উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তবে এ বিষয়ে যে তাঁহার দক্ষতা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর উদ্যোগে 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যায়) পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমন্বিত বারোয়ারী উপন্যাস 'নববর্ষের স্বপ্ন' গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ রচনার মধ্যে। এই নাতিদীর্ঘ উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদটি রচনা করিয়াছিলেন সরলাবালা [দাসী]।[৭]

প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'মনুষ্যত্বের সাধনা' এবং 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা' নামক দুইটি প্রবন্ধ-গ্রন্থের রচয়িত্রী। সরলাবালার অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ তাঁহার আত্মজীবনী 'হারানো অতীত'। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকানাইলাল সরকার এবং 'দেশ' পত্রিকার শ্রী সাগরময় ঘোষের বিশেষ উৎসাহে সরলাবালা এই স্মৃতিচিত্র রচনা করেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই স্মৃতিকথা সে যুগের অন্তঃপুর, যৌথপরিবার প্রথা নিয়ে যেমন রচিত, তেমনি ভ্রমণ কাহিনীর স্বাদরসে পরিপূর্ণ।

আত্মজীবনী রচনা সহজকর্ম নয়। ভিতরে বাইরে উলঙ্গ হইয়া আত্মকথা রচনা করিতে হয়—মিথ্যাচারের কোনো স্থান সেখানে থাকে না। ঘরের কথা লিখিতে মেয়েরাই ভাল পারেন। সহজসুরে সরলাবালা আপন পিতৃকুল, মাতৃকুলের কথা বলিতে গিয়া একটি সামাজিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ঠাকুরমা রাসসুন্দরী তাঁহার 'আমার জীবন' গ্রন্থে আপন ষাট বৎসরের জীবন অঙ্কিত করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস 'বংশের মধ্যে যিনি

৭ অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়াছিলেন 'সরলা দেবী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শশিভূষণ বসু, 'শ্রী অঃ'।

ইচ্ছা করেন' তাঁহার উপর রচনার ভাব দিয়া গিয়াছিলেন। সরলাবালার 'হারানো অতীত' সেই অলিখিত ইতিহাসের জাবন্ত আলেখ্য।

সাহিত্যে সাধিকা সরলাবালার কলম একইকালে উন্নত শ্রেণীর কবিতা এবং উচ্চশ্রেণীর গদ্যরচনায় সমর্থ ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ধর্ম ও সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। পদ্য অপেক্ষা গদ্য-রচনার পরিমাণই অধিক। শ্রী প্রমথনাথ বিশী যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন—'কী ঝরঝরে গদ্য। সুবাসিত মল্লিকা কুসুম সন্নিভ অন্নের মতো। প্রত্যেকটি দানা গুণে নেওয়া যায়।'[৮]

রবীন্দ্রনাথের সহিত সংযোগ ঃ

'অর্ঘ্য' কাব্যগ্রন্থে 'তুমি আমাদেরি লোক' শীর্ষক একটি কবিতা আছে (এই গ্রন্থের শেষভাগে দ্রষ্টব্য)। কবিজীবনের সূত্রবহ এমন সংক্ষিপ্ত সুন্দর কবিতা বস্তুতই দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের সহিত সরলাবালার সম্পর্কের ইতিহাস প্রসঙ্গে কন্যা নির্ঝরিণী লিখিয়াছেন—'আমার মা, আমার পিসিমা সর্বদাই কবির লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন। এমনভাবে কবির সম্বন্ধে তাঁরা কথাবার্তা বলতেন যে কবি তাঁদের ঘরের একজন লোক, একজন পরমাত্মীয়।'[৯] গুরুদেবের সহিত সরলাবালার যোগসূত্র স্থাপিত হয় ১৩২২ বঙ্গাব্দে। ইহার পূর্বে অগ্রজ ডাঃ সরসীলালের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিয়াছিল। স্বামী শরৎচন্দ্র সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র গ্রন্থসমূহের মধ্য দিয়া সরলাবালা কবির ভক্তে পরিণত হন। 'সবুজপত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস (বৈশাখ ১৩২২-ফাল্গুন ১৩২২) প্রকাশকালে 'গল্পের ভয়ানক পরিণতি ও বিমলার দুর্গতি আশঙ্কা' করিয়া একশ্রেণীর পাঠক সচকিত হইয়া ওঠেন। 'এই সময়ে জনৈকা পাঠিকা কবিকে কতগুলি প্রশ্ন করিয়া পাঠান। ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের

---

৮. 'যুগচরিত্র ও সরলাবালা সরকার', প্রমথনাথ বিশী,, দেশ,, ২১ পৌষ ১৩৬৮।

৯. 'কবি-পরিচিতি', নির্ঝরিণী সরকার 'দেশ' ২২ বৈশাখ ১৩৬৩।

সবুজপত্রের 'টীকা-টিপ্পনীতে কবি সেই অপরিচিতা মহিলার ঠিকানাবিহীন পত্রের দীর্ঘ উত্তর'[১০] দিয়াছেন। পত্রদাত্রী বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'এই উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য কি—ইহার শিক্ষাই বা কী—ইহার আখ্যায়িকা কবি-কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবতামূলক—বাস্তব হইলে তাহা কি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বিলাসী সম্প্রদায়ের না প্রাচীন হিন্দু পরিবারের ঘটনা ?' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ লেখিকার দীর্ঘ উত্তরদানে লেখিকাকে সম্মানিত করিয়াছেন। এই পত্রলেখিকা আর কেহ নহেন, ইনি সরলাবালা সরকার।[১১] পরবর্তীকালে কবিগুরুর সহিত সরলাবালার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনাদিও হয়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে বিশ্বভারতী নিজস্ব সংবিধান সহ রেজিষ্ট্রিভুক্ত হওয়ার পর 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় যাঁহারা বিশ্বভারতীর শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, সরলাবালা ছিলেন, তাঁহাদের একজন।[১২] সরলাবালার কবিতাবলীতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বহুক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাব্য ভাবধারার এই ত্রিবেণী সংগম ঘটেছে সরলাবালার কাব্যসমূহে।[১৩]

দেশপ্রেম :

সরলাবালা সরকারের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন হয় নাই। 'হারানো অতীতে' তিনি প্রসঙ্গক্রমে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সহিত আপন সংযোগের কথা ইতস্ততঃ বিবৃত করিয়াছেন সত্য, শ্রী সুশীল রায়ের[১৪] সহিত

১১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫৫ সং, পৃ ৪১৩।

১২. এই সম্পর্কে রচিত সরলাবালার অদ্যাবধি অপ্রকাশিত একটি পত্র পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।

১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, পৃ. ৪।

১৪ 'স্মরণীয়', (১৯৫৮), সুশীল রায় পৃ. ৭৫-৮৩

সাক্ষাৎকালেও এবিষয়ে কিছু বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে নিজের অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকেই গৌরবান্বিত করিয়াছেন। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারীদের মধ্যে সরলাবালার নাম নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

মাতৃকুল হইতে প্রত্যক্ষতঃ দেশপ্রেমের সহিত পরিচিত সরলাবালা মায়ের নিকট 'টমকাকার কুটির' পড়িয়া তাঁহার শিশুমনে স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে' ছিল তাঁহার অতিপ্রিয় কবিতা। হেমচন্দ্র তাঁহাকে একবার শৈশবে আদরও করিয়াছিলেন। লর্ড রিপণের শোভাযাত্রার উৎসবকে বালিকা সরলার অন্তঃসার-শূন্য মনে হইয়াছিল। মুরারিপুকুরের বোমার মামলার রায় শুনে এই বালিকার মন গভীর বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা দেখিয়া মাতুল শিশিরকুমার প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'গৌরীমণি তুমি কি সত্যই দেশকে ভাল বাস?' আরও বলিয়াছিলেন—'ভালবাসার অনেক মূল্য দিতে হয়। মনে রেখো, দেশের স্বাধীনতা যদি তোমার কামনা হয়, তবে কেবলমাত্র ত্রিশটি নয়, তিন লক্ষ বা তিন কোটি সন্তানকেও তার মূল্য স্বরূপ বলিদান দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, একথা ভুললে চলবে না।'[১৫] মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতুল মতিলালের শেষ উক্তি 'No fear forward, forward, oh! my beloved countrymen, Oh! my Mother Land'—[১৬] সাতচল্লিশ বৎসরের সরলাবালাকে জন্মভূমির প্রতি আরও গভীরভাবে সন্নিকৃষ্ট করিয়াছিল। বাঘা যতীন এবং মানবেন্দ্র রায় তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিলেন। স্মৃতিচারণায় সরলাবালা নিজেই বলিয়াছিলেন—'আজ মানবেন্দ্র রায় অন্যদিকে চলে গেছে। বাঘা যতীনও আজ আর নেই। কিন্তু

১৫/১৬ 'হারানো অতীত', পৃ. ১৪-৫ এবং পৃ. ৩০।

তারা আশ্রয় নিত আমার কাছে। তারা তখন বাংলার বিপ্লব। তারা আমাকে মা বলে ডাকত—কেবল ডাকা কেন, মায়েরই মত মনে করত। এই সর্বত্যাগী বিপ্লবী ছেলেরা এবাই ছিল আমার উপাস্য বাল গোপাল'[১৭] 'অর্ঘ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'দুঃখিনীর ধন', 'মাঙ্গলিক', 'মৃত্যুঞ্জয়ী' প্রভৃতি কবিতাসমূহ এইসঙ্গে পাঠতব্য।

সরলাবালার অন্তরে লালিত দেশপ্রেম কোনো একটা নিষ্ক্রিয় প্রকাশহীন বোধমাত্র ছিল না। জাতীয় আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সমসাময়িক ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয়।

গান্ধীজির দণ্ডীযাত্রার পর দিবসেই, ১৩ মার্চ ১৯৩০ তারিখে কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট কলিকাতাবাসী কতিপয় নেতৃস্থানীয়া মহিলা 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' স্থাপন করেন। ইহার সভানেত্রী ছিলেন ঊর্মিলা দেবী। কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যদের অন্যতম ছিলেন সরলাবালা সরকার। সম্পাদিকা ছিলেন শান্তি দাশ (কবীর)। ইঁহাদের প্রধান কাজ ছিল বিদেশী বস্ত্র-বর্জন দলবদ্ধভাবে ইঁহারা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করেন। বড়বাজারের সদাসুখ কাটরা, মনোহর দাস কাটরা, সুতাপটি, গ্রান্ট-স্ট্রীট, চাঁদনি, ক্রসস্ট্রীট, বোবাজার, নিউমার্কেট প্রভৃতিস্থানে বিদেশীবস্ত্রের দোকানে এই পিকেটিং পরিচালিত হয়। কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলেও এই নারী সত্যাগ্রহ সমিতির কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। 'শ্রীযুক্ত সরলাবালা সরকার প্রমুখ নারী সত্যাগ্রহ সমিতির নেতৃস্থানীয়া মহিলা মফঃস্বলে গিয়াও সত্যাগ্রহ প্রচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। মফঃস্বলে বিভিন্ন জেলায় নারীগণ লবণ-আইন ভঙ্গে লিপ্ত হইয়া পড়েন।'[১৮] এই সময়ে সরলাবালার বয়স পঞ্চাশ বৎসর

১৭ স্মরণীয়া সরলাবালা সরকার, সুশীল রায়, পৃ. ৭৭

১৮ যোগেশচন্দ্র বাগল জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী, বঙ্গ বিদ্যাসংগ্রহ, পৃ. ৩৪-

প্রসঙ্গক্রমে নিবেদন যোগ্য, কন্যা নির্ঝরিণী সরকারও (প্রফুল্লকুমার সরকারের পত্নী) ১৯৩০, ১৯৩২ সালে লবণ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন।

উপসংহার :

অসামান্যা স্মৃতিশক্তি সম্পন্না এই মহিলা যুগের সৃষ্টি দিলেন, যুগ তাঁহাকে সে কারণে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। স্বয়ংশ্রেষ্ঠা এই মহীয়সী নারী আত্মগঠনের দ্বারা নিজেকে যুগ-চরিত্ররূপে প্রতিভাত করিতে পারিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৫৭ সালের জন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার রূপে মনোনীত করেন। ইহার পূর্বে কোনো মহিলা এই সম্মানে সম্মানিত হন নাই।

মৃত্যু : ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে এই মহীয়সী নারী ছিয়াশি বৎসরের পরিণত জীবনে পরলোক গমন করেন।

সরলাবালা-রচিত গ্রন্থাবলী :

১। প্রবাহ (শোক-কাব্য) : ১৯০৪ খ্রীঃ (১৩১১ সাল), চেরী প্রেস, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত, পৃ. ২৫৩। উৎসর্গ—জননি আমার !/মমতার প্রতিমা আমার, প্রীতিময়ি, স্মৃতিময়ি, উৎস করুণার,/স্নেহময়ি জননি আমার !

২। **নিবেদিতা (জীবনী-মূলক গ্রন্থ) : ১৯১২ খ্রীঃ প্রথম সংস্করণ, উদ্বোধন** কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৯, পৃ. ৫৩। ইহার চতুর্দশ সংস্করণ (১৩৭৪ 'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি' নামে মুদ্রিত।

৩। চিত্রপট (গল্পগ্রন্থ) : ভূমিকার তারিখ ১৩ আশ্বিন ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ; রায় এম. সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৪। [গল্পসূচী : চিত্র, স্মৃতি, পথের দেখা, পুরানো ডায়েরী, নিশি, কন্যাদায়, কাচের দোয়াত, স্বয়ম্বরা, সন্ন্যাস, মধুপুরে, স্মৃতি-চিহ্ন, ঘাড়চুরি]। উৎসর্গ - শ্রীমতী নির্ঝরিণী কল্যাণীয়াসু।"

৪। **কুমুদনাথ (জীবনী)** : কলিকাতা ১৩৪৪। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক 'হেমকুম্ভ সিরিজে'র গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত। সচিত্র। উৎসর্গ পত্র : 'যাঁহার প্রেরণায় এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে সেই পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী জননী দেবীর শ্রীপাদপদ্মে ইহা উৎসর্গীকৃত হইল।' পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৩।

৫। অর্ঘ্য (**কাব্যগ্রন্থ**) : আষাঢ় ১৩৫৮। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত। উৎসর্গ — ডাক্তার সরসীলাল সরকার। দুইটি ভাগ— অর্ঘ্য ও জাগরণী। মোট কবিতার সংখ্যা ৭৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৫।

৬। **হারানো অতীত (আত্মজীবনী)** : গ্রন্থাকারে প্রকাশ মাঘী পূর্ণিমা ১৩৬০। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৪।

৭। **স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (প্রবন্ধ)** : ভাদ্র, ১৩৬৩ [১৯৫৭ খ্রীঃ]। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। সচিত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয় আনা + ২২৪। গ্রন্থ পরিচয় লিখিয়াছেন যদুনাথ সরকার। অধ্যায় সংখ্যা-২১

৮। **গল্পসংগ্রহ (গল্পগ্রন্থ)** : জুলাই ১৯৫৭ খ্রীঃ। প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৩। 'চিত্রপট', গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ২০টি গল্প ও একটি উপন্যাসের ('নববর্ষের স্বপ্ন') একটি অধ্যায় ইহাতে স্থান পাইয়াছে। সংকলক — সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। **সাহিত্য জিজ্ঞাসা (প্রবন্ধ)** : প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭। প্রকাশক— মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। প্রকাশকের নিকট হইতে গ্রন্থ প্রকাশের সঠিক তারিখ জানিতে পারিয়াছি ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা দুই আনা + ১৫২। গ্রন্থে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথের

'মানুষ' এবং গ্রন্থকর্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত গিরিশ-বক্তৃতার প্রবন্ধ, গিরিশচন্দ্রের নাটকের চরিত্র অঙ্কন—এই প্রবন্ধ চতুষ্টয় মুদ্রিত হইয়াছে।

১০। পিনুকুর ডাইরি (শিশু সাহিত্য): প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬৮। সচিত্র, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। "তাহার পরিণত বয়সের লেখা এই কিশোর-পাঠ্য স্মৃতিকথা-মূলক গল্পগুলি কিছুদিন পূর্বে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'আনন্দমেলা' বিভাগে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

পরিশিষ্ট-১

রচনার নিদর্শন:

তুমি আমাদেরি লোক
[মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরি লোক।
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।—রবীন্দ্রনাথ]

বহুবর্ষ আগে এক পঁচিশে বৈশাখ
ধরার অঞ্চলে
তোমারে অর্পিল আনি, কবি,
আজ বিদায়ের দিনে
স্মরি সেই ছবি
ধরণী ভাসিছে অশ্রুজলে।

সেই এক পঁচিশে বৈশাখ!
গত প্রায়া যামিনীর নিদ্রা দূরে করি
যে গৃহে জনম তব সেই গৃহাঙ্গনে

সরলাবালা সরকার

সেদিন বাজিয়াছিল যে মংগল শাঁখ
কে জানে তখন—
সেই শুভ শংখধ্বনি ভরিবে ভুবন।

সেদিন কে জানে—
শত শত বর্ষ ধরি ধরণী সাধনা করে
যাঁহার ধেয়ানে—
রবিরূপে তাঁহারি উদয়!
না জেনেও তাই অকারণে
বিশ্বের মানব-মনে
পরম সে ক্ষণে
বুঝি উঠেছিল এক পুলক-হিল্লোল
প্রাণে প্রাণে লেগেছিল আনন্দের দোল,
যে দোলায়
আত্মপর সকলি ভোলায়।
বিশ্বময়
অনুরাগ বাঁশরীতে প্রভাতী ললিতে
ঘোষণা করিয়াছিল আলোকের জয়
রবির উদয়!

বিশ্বকবি, তব জন্মকালে
শিশুরবি-ভালে
জয়টীকা পরালেন সবিতৃ মণ্ডল-নিবাসিনী
সাবিত্রী আপনি।
শ্যামা জন্মভূমি—

বক্ষে তোমা ধরিলেন লক্ষ লক্ষ চুমি
আনন্দ-দুলাল তুমি তাঁর

প্রকৃতির মাঝে —
কত সুধা, কত রূপ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ
গোপনে বিরাজে
জড় আবরণে
আবরিত কত প্রাণলীলা সংগোপনে,—
প্রকৃতি জননী
খুলি সেই গোপন ভাণ্ডার
আমন্ত্রণ করিলেন অন্তঃপুরে তাঁর,
বালক কবিরে,
সবুজ ধানের ক্ষেতে সন্ধ্যায় নদীর তীরে তীরে
ফিরে সে বালক আনমনে;
ক্ষণে ক্ষণে
কি অনন্ত রহস্য অপার
নব নব রূপ ধরি দোলা দিয়ে যায় চিত্তে তার ;
নেত্রে তার কি মায়া-অঞ্জন জড়-বিশ্ব রচে প্রাণময়,
গীতিময় তরুলতাফুল কর্ণে তার কত কথা কয়।
শৈলের কন্দর ত্যজি নির্ঝরের ধারা;
ছুটিয়া চলিল শত স্রোতে
অনন্তের পথে।
দিনে দিনে দলে দলে শত শত শতদল কমল বিকাশ,
রবির উজ্জ্বল ভাতি দিকে দিকে পাইল প্রকাশ,

অপূর্ব জীবন-ইতিহাস !
সে জীবনে প্রতি দণ্ড পল
নব নব উদ্ভাসনে উদ্ভাসিত রঞ্জিত উজ্জ্বল,
সৃজিয়া চলেছে এক অবিরাম প্রবাহ মধুর,
অক্ষয় সে গীতি-উৎস
উৎসারিত ঝঙ্কারিত নিত্য নব সুর,
বিশ্ব যেন লভিয়াছে গীতিময়ী অপূর্ব মূরতি,
গান, গান, গান !
গানে জড় লভিতেছে প্রাণ,
জীবনের গ্রন্থিময় সমস্যা জটিল
গানে সমাধান।

অরূপের রূপে,
সে গান ফুটিল চুপে চুপে ;
সর্ব দর্শনের যাহা সার
সুরে সুরে হ'ল ব্যাখ্যা তার—
এতই সহজ ;
এতই সরল ;
বিকাশিল রবিরাগে সহস্র হৃদয়-শতদল !

চুম্বকের প্রায়—
অপরূপ আকর্ষণ কে জানে সে কোথা ল'য়ে যায়,
কোন্ দূর দিগন্তের পানে
অসীমের সীমার সন্ধানে !
রঙে রঙে রঞ্জিত ভুবন,

গিরি নদী বন।

আপন রঞ্জনে,

হে কবি, রঞ্জিত তুমি, রঞ্জিত করিলে জনে জনে!

তাই তো তোমার এই খ্যাতি

এই তব শেষ পরিচয় —

"তুমি আমাদেরি লোক, আর কিছু নয়, কিছু নয়।"

—'দেশ', আশ্বিন ১৩৪৮

অভিসারিণী

[illegible]

চরণে শতেক বাধা,

বিপিন-মাঝারে চঞ্চল চরণে

একাকী চলিছে রাধা।

[illegible] চরণের তলে

বাধা তাহে নাহি মানে,

ভোলে ভয় লাজ কুলবালা আজ

চলেছে বাঁশীর টানে।

হেরিছে অদূরে কদম্বের বন

শিহরি উঠিছে কায়,

ঐ বুঝি ঐ শিখিপুচ্ছ চূড়া

ঐখানে দেখা যায়।

অশনি-গর্জনে পবন-শনশনে

প্রিয় হে, আকুল হিয়া,

যদি বা তোমার দেখা নাহি পাই

সঙ্কেতের স্থানে গিয়া।

দীক্ষা

জননি, আজি দীক্ষা নিতে এসেছি তোমার দ্বারে।
আমি অগ্নিমন্ত্রে লইব দীক্ষা
হোমের আগুন জ্বালি,
কুড়ায়ে আনি কর্মরাশি
তাহাতে দিব ঢালি!
যাহে, অনন্ত কাল এই হোমানল
জ্বালায়ে রাখিতে পারে,
সে মন্ত্রে আজ লইতে দীক্ষা
এসেছি তোমার দ্বারে!

তোমারি তরে মা করিব কাজ,
তুমি দাও তার ভার,
দুঃসহ যত, দুর্বহ যত,
অসাধ্য আছে আর!
আমি দুরন্ত অতি, ধৈর্য্য ধরিতে
হৃদয় নাহি তো পারে
তাই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইতে
এসেছি তোমার দ্বারে।

—'সুপ্রভাত', ১৩১৪।

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল

প্রায় শত বর্ষ পূর্বে বাংলাদেশে যে সকল কবির উদ্ভব হইয়াছিল অক্ষয়-কুমার তাঁহাদেরই একজন।

নূতন আবির্ভূত হয় পুরাতনকেই অবলম্বন করিয়া, তাই পুরাতনকে

স্মরণ না করিলে নবীন অভ্যুদয়কে আমরা সর্বাঙ্গীন ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, অক্ষয়কুমারের গীতিকাব্য আলোচনা করিতে যাইয়া সেই কথাই মনে হয়।

মানুষের রসানুভূতি—মানুষের আনন্দের যাহা উৎস স্বরূপ তাহা সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে ও বিবিধ কলাশিল্পের রচনায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মানুষ সৌন্দর্যের উপাসক, সেই সৌন্দর্যের অনুভূতির সাহায্যে সে যাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই অপরূপ ভাবরাশি সে মূর্তরূপে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে ভাষায়, তুলিকায় ও শিল্পরচনায়।

নিজের অন্তরের মাধুর্যের আস্বাদ মানুষ পরিবেশন করিতে চাহিয়াছে মানব সমাজে। নিজের মনে যাহা লাভ করিয়াছি তাহা নিজে উপভোগ করিয়া, মনের ভাণ্ডারেই তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া আমার তৃপ্তি নাই, অপরকে সে অপূর্ব আস্বাদনের অংশী করিতে না পারিলে আমার উপভোগের আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে না, তাই ভাষার সাহায্যে সেই অন্তরতম ভাবকে মূর্তি দান করিতে আমার এত আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্যের প্রেরণার ইহাই মূল কথা।

কবি ও সাহিত্যিক এইভাবে সাহিত্য-রচনার মধ্য দিয়া বিশ্ব-মানব-সমাজের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। সাহিত্যের প্রাণধর্ম ভাব-বিতরণ, কিন্তু অপাত্রে বিতরণে তৃপ্তি নাই। দাতা উপযুক্ত গ্রহীতাকে দান করিয়া যে আনন্দ পান অপাত্রে দান করিয়া সে আনন্দ সে তৃপ্তি পান না। বিশেষ করিয়া ভাব-রসের পরিবেশক এবং আস্বাদক উভয়ের ভিতর মরমী সম্বন্ধের দ্বারাই ভাবের পরিপুষ্টি হয়। কিন্তু কবির কাব্যরসগ্রাহী শ্রোতা লাভের সৌভাগ্য যখন ঘটনাক্রমে সম্ভব হয় না তখন তাঁহার যে মর্মবেদনা তাহা এক অতীত কালের কবির উক্তিতে এই ভাবে পরিস্ফুট দেখিতে পাই :

"ইতর তাপ শতানি বিতর, সহে চতুরানন,
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।"

হে চতুরানন, হে ভাগ্যবিধাতা, "অপর শত শত তাপ আমাকে দাও আমি তাহা

সহ্য করিব, কিন্তু অরসিক জনের নিকট রসের নিবেদন-রূপ দুর্ভাগ্য অদৃষ্টে লিখ না, লিখ না, লিখ না।"

তাই সাহিত্য-সাধনায় প্রতিভাবান ভাবুকের প্রতিভা যেমন সাহিত্য-বিকাশের উৎস স্বরূপ, সেই সঙ্গে অনুভূতি সম্পন্ন পাঠকেরও প্রয়োজন সেই উৎসকে অধিকতর বেগবতী করিবার জন্য। আপন ভোলা কবি, তিনি রচনা করিয়া চলিয়াছেন ভাবের আবেগে, কিন্তু নিজের রচনায় যে কত কি গূঢ় ভাব রহিয়াছে নিজেই হয়ত তাহা জানেন না, ভাবগ্রাহী পাঠক [illegible] রচনার ভিতর এমন অনেক ভাব আবিষ্কার করেন, যাহা [illegible] অজ্ঞাতে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে তাই কোন এক কবি ও সমালোচক বলিয়াছেন :

"কবিতা-রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানী ভ্রুকুটি-ভঙ্গী ভবো বেত্তি, ন ভূধরঃ"।

অর্থাৎ কবিতার-রস-মাধুর্য-অপার-মাধুর্য-আস্বাদন-রসিকজন যে ভাবে অনুভব করিতে পারেন স্বয়ং কবিকারও তেমন পারেন না ;—যেমন ভবানীর ভ্রুকুটি-ভঙ্গীর গূঢ় তাৎপর্য ভবই অনুভব করিতে পারেন, গিরিরাজ হিমালয়, [illegible] [illegible]ধীন ভবানীর জন্মদাতা, তিনও সে ভাবে অনুভব করিতে পারেন না।

তাই দানও গ্রহণে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই সমান মূল্য, সমান মূল্য লেখক ও পাঠকগণের। এই ভাবেই সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। গড়িয়া উঠে পরস্পরের গুণমুগ্ধ কাব্য-রসিক দল, যাঁহারা পরস্পরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাব-বিকাশের সাধনায় সতীর্থ হইয়াছেন।

অক্ষয়কুমারের গীতিকাব্যের আলোচনায় অতীত দিনের একটি ছবি মনের ভিতর জাগিয়া উঠে, বাংলা ১২৮৯ সাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক; 'বঙ্গদর্শন' পূর্ণ গৌরবে পরিচালিত হইতেছে। সেই সময় অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' 'বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।' ...

['সাহিত্য-জিজ্ঞাসা']

নিবেদিতা চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে চোখের জলের কালী দিয়া না লিখিলে সে লেখা সম্পূর্ণ হয় না। তিনি যে আমাদেরই ছিলেন, তিনি যে ভারতবর্ষকে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, একথা আমরা এখনই অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে পারিতেছি। ধন্য স্বামী বিবেকানন্দ—তিনি এই দুর্লভ রত্ন আনিয়া জননী ভারতবর্ষের পাদপদ্মে উপহার দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের সাহত ভগিনী নিবেদিতার জীবনের এই যে একান্ত সংযোগ ইহা অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। কোথায় ধনজনসম্পত্তিশালী সুদূর ইংলণ্ডের সুসভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন জীবন, আর কোথায় ধ্বংসদশাগ্রস্ত ভারতবর্ষের কোন এক দরিদ্র পল্লীতে নিতান্ত অজ্ঞাত অপরিচিতভাবে জীবন যাপন! কোথায় সুখ-সৌভাগ্য ও আভিজাত্যের গৌরবলাভ, আর কোথায় দুঃখ-দারিদ্র্য ও নিন্দা-অপমানকে নিরন্তর অঙ্গভূষণস্বরূপে আলিঙ্গন! কোথায় স্বজনগৃহ-পরিবারের সুখময় আশ্রয়ে বাস, আর কোথায় বহু দূরদেশে এক নিতান্ত বিভিন্ন-আচারবলম্বী ভিন্ন-ভাষাভাষী বিদেশীর সহিত ধনী-দীন-জাতি-বর্ণনির্বিশেষে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-পাশ! কোথায় উত্তুঙ্গ হিমাচল, আর কোথায় বা সাগরাভি-মুখিনী স্রোতস্বতী! কোন্ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া নিবেদিতার জীবনের গতি ঐরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল, প্রথমে তাহাই জানিতে কৌতূহল হয়। নিবেদিতা তাঁহার 'The Master as I Saw Him' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ই তাঁহার এইরূপভাবে জীবনের গতি-পরিবর্তনের প্রধান কারণ।

১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংলণ্ডে গিয়া বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের দিকে নিবেদিতার মন আকৃষ্ট হয়। স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন এবং

বক্তৃতাশেষে শ্রোতৃগণ ঐ সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রশ্ন করিতেন তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। ঐ সকল বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর শুনিয়াই নিবেদিতার মনে বর্তমানকালে প্রচলিত ইউরোপীয় দর্শন ও ধর্মানুশাসনের সহিত ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা প্রথম উদিত হয়। যদিও নিবেদিতা তখন বেদান্তদর্শনের ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তথাপি উহা হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বর্তমানকালের ইউরোপীয় সভ্যতা, ধর্মপ্রচার, পরোপকার ও সমাজ প্রভৃতির মূলে আধ্যাত্মিকতা অল্প-স্বল্প বিদ্যমান থাকিলেও, পার্থিব ভাব ও ভোগসুখলালসাই বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা একেবারে পার্থিব ভাবসম্পর্কশূন্য। পরহিতার্থ কর্মানুষ্ঠানে যদি বিন্দুমাত্র আত্মাভিমান ও স্বার্থানুসন্ধিৎসা থাকে তবে ফলহীন বৃক্ষের ন্যায় তাহা নিরর্থক হইয়া যায়। স্বামীজীর ধর্মব্যাখ্যা ও বক্তৃতাবলী শুনিয়া নিবেদিতা এই কথাটি প্রথমেই বুঝিতে পারিলেন এবং ইহা একেবারে তাঁহার মনে লাগিয়া গেল ঐরূপ বক্তৃতা শ্রবণ ও প্রতিদিন মনে মনে তাহার আলোচনায় নিবেদিতার মনের ভাব ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল এবং সেই সঙ্গে স্বামীজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল।···

সেকালের কথা

ছেলেবেলার স্মৃতি যেন নদীর ঢেউয়ের মত, কত কথা মনে উঠিয়া আবার মনের গহনে মিলাইয়া যায়। এলোমেলো টুকরো টুকরো নানা কাহিনী।

আমার ছেলেবেলার স্মৃতির পটে, কলিকাতার দুইটি বাড়ির ছবি এমন উজ্জ্বল রঙে আঁকা আছে যে, জীবনের সায়াহ্নের ছায়াও তাহাকে ঢাকিয়া দিতে পারে নাই। একটি ৯৩নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বড় রাস্তার ধারের একটি ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ির পাশে ডান দিকে এক সরু গলি, তাহার পাশেই পালিতদের একতলা বাড়ি। বাড়ির পিছন দিকে মস্ত এক তেতলা বাড়ি, বাড়ির কর্তার নাম কালাচাঁদ চক্রবর্তী। গলির ভিতর দিয়া তাহার বাড়ির রাস্তা;

কিন্তু বাড়িতে ঢুকিয়াই দেখা যাইত এক মস্ত বড় উঠান, সেই উঠানে প্রায়ই কথকতা হইত। ঢং ঢং করিয়া যেই কথকতার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, পাড়ার সমস্ত ছেলেমেয়েদের দল ছুটিত সেই বাড়ির দিকে। উঠানের চার পাশে সারি সারি চিকফেলা বারান্দা, সেখানে মেয়েদের বসিবার জায়গা। মস্ত বড় জাজিম পাতা উঠানে বসিতেন অভ্যাগতেরা; উঠানের একপাশে বেদী, বেদীর উপর টবে-করা তুলসী গাছ. আর কথক ঠাকুর বসিতেন সেই বেদীর উপর, গলায় তাঁর ফুলের মালার দুইধারে ঝুলিত দুইটি ফুলের খোপা। মাথা নাড়িয়া যখন তিনি অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন, তখন সেই ফুলের খোপা কথার তালে তালে দুলিত। সে কথকতা যে কি মনোমুগ্ধকর বলিয়া তাহা বুঝানো সম্ভব নয়। বীর রস, করুণ রস, হাস্য রস প্রভৃতি যেন সে কথকতায় একেবারে মূর্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইত।

বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোড়ায়-টানা ট্রামগাড়ি অনবরত ঘড় ঘড় করিয়া চলিতেছে। ফুটপাতে সারি সারি কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তাহার যে কি বাহারই হইত। রাস্তায় কত রকম দৃশ্য দেখা যাইত, জাঁকজমকে বিয়ের শোভাযাত্রা, ঝাসগেলাসের আলোকসজ্জা, প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা, নগর সংকীর্তন—এই রকম আরো কত কী! লর্ড রিপনের শোভাযাত্রায় রাস্তা এমন সাজানো হইয়াছিল যে, রাস্তা বলিয়াই মনে হইতেছিল না, যেন বিবাহ বাড়ী। রাস্তার দুইধারে ফুলের সজ্জা, মাঝে মাঝে নহবতে রোসন-চৌকীর বাজনা, সেই পথ দিয়া চার ঘোড়ার গাড়ীতে গেলেন লাট সাহেব। গাড়ির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া আছেন আর দুইধারের লোকের ভিড়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিমুখে কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিতেছেন। পরনে তাঁহার সাদা পোষাক, সাদা দাড়ি বাতাসে উড়িতেছে। সে কি ভীড়! আর কী সে গগন-ভেদী জয়ধ্বনি! ভারতবর্ষ যেন স্বাধীনতাই পাইয়া গিয়াছে!

এইসব দেখিতে অবশ্য ভালই লাগিত, কিন্তু মন পড়িয়া থাকিত মামার

বাড়ীতে, দুই নম্বর আনন্দ চাটুজ্যের লেন, নেবুবাগানের গলিতে।

দুই নম্বর আনন্দ চাটুজ্যের লেন, এখন যেখানে হইয়াছে যুগান্তর অফিস। এখন মনে হয়, যেন কত যুগ-যুগান্তর সে-বাড়ি, সেই ভালবাসামাখা ছেলেবেলার খেলা ঘর একেবারে হারাইয়া গিয়াছে জীবন হইতে।··· ('হারানো অতীত')।

পরিশিষ্ট – ২

বৃহস্পতিবার

শ্রীগৌরাঙ্গ

কলিকাতা

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

বাবা, এই পত্রে আমার শতকোটী প্রণাম জানিবেন। কতদিন আপনাকে একবার প্রণাম করিয়া আসিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছে, আজ পত্রযোগে সেই প্রণাম নিবেদন করিলাম।

ইতিপূর্বে "ঘরে বাইরে" বইখানির সম্বন্ধে আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, সে পত্রের কথা সম্ভবতঃ স্মরণ নাই। সে পত্রে আমার যাহা জানাইবার ছিল হয়তো ভাল করিয়া তাহা বুঝাইতে পারি নাই। এ পত্রেও যে, যাহা জানাইতে চাই তাহা বুঝাইতে পারিব সে ভরসা আমার নাই। তবুও কোন কিছু আপনার পদপ্রান্তে নিবেদন করিবার এ আগ্রহ আজ আর সংযত করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কেমন করিয়া জানাইব; আপনার "স্যর" উপাধি-ত্যাগ সংবাদ এবং উপাধি-ত্যাগের আবেদন পত্র পড়িয়া নিজেকে কত সৌভাগ্যশালী মনে হইয়াছে। মনে হইয়াছে, আমার জীবন ও জন্ম ধন্য যে আমি এই সংবাদ জানিতে পারিলাম। সংসারে অনেক বিষয়ে যদিও আমি ভাগ্যহীনা, এই একটিমাত্র বিষয়ে ভগবানের এত অপার করুণা পাইয়াছি যে সকল দুর্ভাগ্য তাহাতে ভাসিয়া গিয়াছে। কতবার আপনার কত রচনা এবং উক্তি আমাকে যে আঘাতও দিয়াছে সে কথাও আজ আপনাকে নিবেদন করিতে সঙ্কোচ করিব না। আমি অনেকবার মনকে বুঝাইয়াছি, যে আমার অনুভূতিই সম্পূর্ণ নয়, আমার

নিজের রঙ্গে রঙ্গিন চসমায় চোখ ঢাকিয়া আমি যাহা দেখিতেছি তাহাই যথার্থ নয়, তবুও আমি মনকে বুঝাইতে পারি নাই। যেদিন আপনার "নোবেল পুরস্কার" প্রাপ্তি সংবাদে ভারতাধিষ্ঠাত্রী বাণীর কণ্ঠে অম্লান শ্বেত পদ্মহার মানসনেত্রে দেখিয়া কল্পনা করিতেছিলাম, আজ জননীর পদপ্রান্তে সকল ভাইয়ের সহিত মিলিয়া মাল্য আহরণ কারী বীর কি আনন্দোৎসবেই না রহিয়াছেন; তখন যে মাত্র "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে" শুনিলাম, যে বেদনার আঘাত মনে বাজিয়াছিল অনেকদিন তাহা ভুলিতে পারি নাই। বাবা, আমার এই স্পর্ধার কথা আপনি কি মার্জনা করিতে পারিবেন? আমি অনেকবার ভাবিয়াছি এই কথাটি আমি যে ভাবে শুনিয়াছি—সে ভাবে তো বলা হয় নাই। তবু আপনাকে বুঝাইতে পারি নাই। এমন অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, যাঁহারা আপনাকে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা করেন—তাঁহাদের মধ্যে আমার এক বিশেষ আত্মীয়া, যিনি আপনাকে পিতা, গুরু ও ইষ্টদেবতার ন্যায় ভক্তি করেন তিনি বার বার ক্ষুব্ধ চিত্তে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন "তুমি তাঁর কাছে চাও কি?" আমি তাঁহাকে অনেকবার আপনার প্রসঙ্গে আঘাত দিয়াছি, যে তিনি কাঁদিয়াছেন। কিন্তু আপনার লিখিত পত্রে যখন আপনার প্রাচীনত্বের অথবা অস্বাস্থ্যের কিম্বা মৃত্যু নিকট এইভাবের কোন উল্লেখ দেখিয়াছি, তখনই আমার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মনে হইয়াছে, মৃত্যু নিকট বা দূরে তাহাতে তাঁর আসে যায় কি? ভারতবর্ষের এই দুর্দিনে তিনি কখনও রুগ্ন কি প্রাচীন হইবার অবসর পাইতেই পারেন না। বাবা, আমার নিজের এই মানসিক ভাব সমূহের আলোচনায় এত অধিক কথা বলার কোন সার্থকতা আছে কিনা জানি না, তবুও আমি তাহার কিছু আপনাকে আজিকার দিনে না জানাইয়া পারিলাম না। "ঘরে বাহিরে" সম্বন্ধেও আমার কিছু জানাইবার ছিল, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারি নাই। শুনিয়াছি, "ঘরে বাহিরে" বইখানি বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই বইখানি রূপক, উপন্যাস অথ।

স্বদেশীয় আন্দোলনের উপন্যাসাকারে লিখিত ইতিহাস, যাহাই হোক না কেন, বিদেশী সমাজে – আপনার রচিত এই পুস্তকখানি কিভাবে গৃহীত হইবে সে কথা অনেক সময় মনে হইয়াছে। তাহারা কি স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভের ইতিহাসের ভাবেই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিবে না? আর যদিও উপন্যাস হিসাবে লেখকের যথেচ্ছ লিখিবার ক্ষমতা ও অধিকার আছে কিন্তু এমন রচনায় অধিকার আছে কি, যে রচনা সমস্ত দেশকে মিথ্যা অসম্মানের অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে পারে? হইতে পারে স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর সন্দীপ ছিল এবং নির্মলও অনেক ছিল, কিন্তু আর যাহারা ছিল এবং আছে, তাহাদের কোন পরিচয়ই কি আপনি জানেন না? জানেন না; ইহা ধারণা হয় না। তবে এ অসম্পূর্ণ চিত্র কেন?

বাবা যাঁহাকে ভগবান মহৎ প্রাণ সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন জগৎ তাঁহার বর্ধিত সহায় সম্পদের উত্তরাধিকারী, সম্মান বা অসম্মানে তাঁর কি আসে যায়? কর্মশ্রান্তি অথবা অভিমান কি একতিলও সেই বীরকে অবসাদ কাতর করিতে পারে? তাহা কি সম্ভব? আমার শত কোটী প্রণাম সহ এই প্রশ্ন আজ আপনার পদ প্রান্তে নিবেদন করিলাম। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি —

শ্রীসরলাবালা দাসী।

[এই অপ্রকাশিত পত্রটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। এই পত্রে উল্লিখিত প্রাণ পত্রটির উত্তর সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সবুজপত্রে' দিয়া থাকিবেন। এই উত্তর প্রকাশিত হইবার অনেক পরে সম্ভবতঃ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই দ্বিতীয় পত্র রচিত।]